ইন্দুবালা

ড. বাঁধন সেনগুপ্ত

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১এ কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
যুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

উৎসর্গ

জননী স্বর্গতা মুকুলরাণী সেনগুপ্তা'র
স্মৃতির উদ্দেশে—

INDUBALA

By

Dr. Badhan Sengupta

(A Book on Smt. Indubala Devi, her life and her contribution on music, stage & film etc.)

সূচীপত্র

বাঙ্গালীর সার্কাস

শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু

পাবলিসিটি ষ্টুডিও
৩৬৭ নং অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা

মূল্য ১।০

শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখিত 'বাঙালীর সার্কাস' নামক
গ্রন্থের টাইটেল পেজ্‌-এর প্রতিলিপি

হিন্দী 'দেওয়ালী' ছবির একটি দৃশ্যে মতিলাল ও ইন্দুবালা

নৈহাটীতে (১৯৬১) লেখক সমরেশ বসুর বাড়িতে সমরেশ বসু,
ইন্দুবালা ও লেখকের স্ত্রী শ্রীমতী গৌরী বসু

এক সঙ্গীত সভায় ত্রয়ী সঙ্গীত প্রতিভা কমলা ঝরিয়া, আঙুরবালা ও ইন্দুবালা

'ভোলারাজা রিক্সাওয়ালা' (হিন্দী, ১৯৩৮) ছবির একটি কমিক চরিত্রে ইন্দুবালা। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে অভিনেতা চার্লি

'নল দময়ন্তী' (হিন্দী) ছবির একটি দৃশ্যে দময়ন্তীর মায়ের ভূমিকায় ইন্দুবালা।

প্রথম যৌবনে-ঘরোয়া পরিবেশে তোলা ইন্দুবালার ছবি

বাংলা 'রাতকানা' ছবিতে রাজবালা

ইন্দুবালার পিতা
প্রোফেসর মতিলাল বসু, বি. এ.

স্টার থিয়েটারে (২য় পর্যায়) 'পৃথ্বীরাজ' নাটকে 'মেঘা' চরিত্রে ইন্দুবালা

চন্দননগরে (১৯২২) একটি ঘরোয়া সম্বর্ধনা সভায় ইন্দুবালা সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। ডানদিকে বসে আছেন নজরুলের দীর্ঘকালের সঙ্গী 'কাজী নজরুল' গ্রন্থের লেখক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
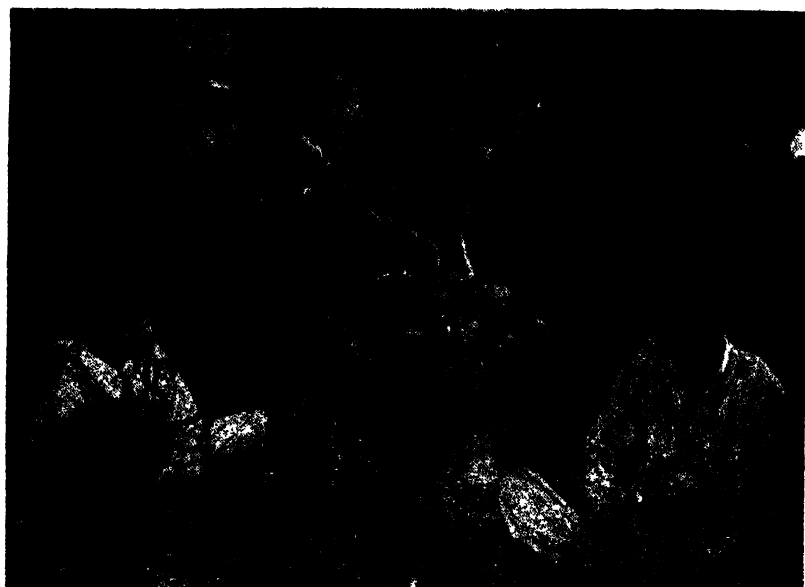
বাংলা 'শুভ ত্র্যহস্পর্শ' ছবিতে ইন্দুবালা

'শুভ ত্র্যহস্পর্শ' ছবির আর একটি দৃশ্যে জহর গাঙ্গুলী (ডাক্তার) ও ইন্দুবালা (গিন্নী)

হিন্দী 'জলজলা' ছবিতে রানীর চরিত্রে ইন্দুবালা

'রাত-আন্ধি' হিন্দী ('রাতকানা' ছবির হিন্দী ভার্সান) ছবির একটি দৃশ্যে 'কালো বৌ' এর ভূমিকায় রাজবালা (বাঁ দিকে)

ঊর্দ্ধ 'সেলিমা' ছবিতে ইন্দুবালা (দাঁড়িয়ে)

এক সম্বর্ধনা সভায় ইন্দুবালা (সামনের সারিতে ৩য়)
ও ইন্দুবালার মাতা রাজবালা (সামনের সারিতে ৫ম
স্থানে দাঁড়িয়ে)। ইন্দুবালার ডানদিকে তৎকালীন মন্ত্রী
পূরবী মুখোপাধ্যায় এবং বাঁ দিকে রাজবালার পরে
শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী

ভা·মল 'নবীনা সারঙ্গধরা' ছবিতে সন্ন্যাসিনীর চরিত্রে ইন্দুবালা

হিন্দী 'রাত আন্ধি' ছবির একটি দৃশ্যে ইন্দুবালার মা রাজবালা

(ডান দিক থেকে প্রথম)

'বাঘী সিপাহা' ছবির একটি দৃশ্যে ইন্দুবালা ও হাসান দীন

বাংলা 'ইন্দিরা' (রচনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ছবির একটি দৃশ্যে
স্ত্রীর (গিন্নী) চরিত্রে ইন্দুবালা এবং পাশে জ্যোৎস্না গুপ্তা

'রাজরানী মীরা' ছবিতে ইন্দুবালা ও দুর্গা খোটে। পেছনের সারিতে
মলিনা দেবী ও পাহাড়ী সান্যাল

'যমুনা পুলিনে' ছবির একটি দৃশ্য। দাঁড়িয়ে বাঁ দিক
থেকে—কমলা ঝরিয়া, বীণাপাণি, আঙুরবালা,
ইন্দুবালা ও প্রকাশমণি। বসে আছেন—
সবিতা দেবী ও ধীরাজ ভট্টাচার্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব-কথা

পশ্চিমের বনবিষ্টুপুর একদা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম হিসাবে সবিশেষ পরিচিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার এই গ্রামেই ছিল ইন্দুবালাদের পূর্বনিবাস। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে জনৈকা ব্রাহ্মণ মহিলা ছিলেন এই গ্রামের শেষতম বাসিন্দা। ওই শতাব্দীর শেষভাগে ভয়াবহ এক ঝড়ের রাতে (সম্ভবত : ১৮৫৫ খ্রীঃ) সেই মহিলা তাঁর কোলের শিশুকন্যাটিকে প্রায় অলৌকিক ভাবে বাঁচাতে সক্ষম হন। বসতবাড়ির বাইরে পালিয়ে এসে কোলের বাচ্চাটিকে বুকে আগলে কোনরকমে সারারাত শুয়ে থেকে সেই মহিলা নাকি শিশুসহ নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ ভোর রাতে ঝড় থামার আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন; দৈবক্রমে শুধু সেই শিশু কন্যাটি বেঁচে যায়। অন্যদিকে, ঝড়ের তাণ্ডবে ব্রাহ্মণদের বাড়িঘর উড়ে যায় এবং ঝড়ে চাপা পড়ে সেই পরিবারের অন্যান্য সকলেই প্রাণ হারান।

সকালে ঝড় থেমে যাবার পর প্রতিবেশীরা এসে মৃতা সেই মায়ের কোল থেকে জীবিতা শিশুকন্যাটিকে উদ্ধার করে তাঁদের বাড়িতে তুলে নিয়ে যান এবং নিজেরাই সেই কন্যাটিকে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আশ্রয় দান করে লালন পালনের ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিবেশীরা মূলতঃ ছিলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে সেই ব্রাহ্মণ কন্যাটি বৈষ্ণব পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে পরবর্তীকালে বৈষ্ণব হিসাবেই পরিচিতি লাভ করে। গ্রামের সকলেই তাকে 'পুঁটি বোষ্টমী' বলেই ডাকতেন। 'পুঁটি' নামটিও সেই বৈষ্ণব পরিবারেরই দেওয়া। পুঁটির বয়স যখন মাত্র এগারো বছর তখন ঐ বৈষ্ণবদের মধ্যে মুখুজ্জে বংশীয় জনৈক সুশ্রী যুবকের সঙ্গেই তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। পুঁটিরাণী ছিল অপূর্ব সুন্দরী এক কন্যা। তাঁর বৈষ্ণব স্বামী তাকে নিয়ে বিয়ের কিছুকাল পরেই কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে এসে বসবাস করতে থাকেন।

কলকাতায় বসবাস কালে মাত্র বছর তিনেক পরেই পুঁটিরাণীর স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। অসহায় পুঁটি তখন বাধ্য হয়ে আশে পাশে আশ্রয়ের অনুসন্ধান করতে থাকে। এই সময় প্রতিবেশী শ্রী মুরলী আঢ্য নামে জনৈক ধনবান ব্যক্তি বিধবা পুঁটিরাণীকে আশ্রয় দেন। ইনি পুঁটিকে মালোপাড়া অঞ্চলে দুটি বাড়িও মৃত্যুর পূর্বে দিয়ে যান। মুরলী আঢ্যের মৃত্যুর সময় পুঁটিরাণীর পনেরোটি সন্তানের মধ্যে মাত্র চারটি সন্তান জীবিত ছিল। শেষ সন্তানটি প্রসবের কিছুদিন পরেই স্বয়ং পুঁটিরানীও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

পুঁটিরাণীর জীবিত এই চারটি সন্তানের নাম যথাক্রমে হরিমতী, মতিবালা, তিনকড়ি ও রাজবালা। রাজবালার যখন মাত্র চার মাস বয়স তখনই পুঁটিরাণীর মৃত্যু হয়।

পুঁটিরাণীর মৃত্যুর ফলে তাঁর চারটি সন্তানই আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। এই সময়ে মুরলী আঢ্যের নিকট জনেরা পুঁটিরাণীর ঐ দুটি বাড়ি দখল করে এবং চারটি সন্তানকে বাস্তুচ্যুত করার হুমকি দেয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পুঁটিরাণীর মৃত্যুর পরে এইসব ঘটনাই ঘটতে থাকে। আঢ্যবাবু গোড়ার দিকে পাথুরিয়াঘাটায় খোলার ঘরে এনে রাখলেও কিছুকাল পরে পুঁটিরাণীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পরেই এই দুটি বাড়ি পুঁটিরানীকে দিয়েছিলেন। পুঁটি একটি বাড়ি ভাড়া দিয়েছিলেন এবং অন্যটিতে চারটি সন্তান নিয়ে নিজেই আমৃত্যুকাল বসবাস করেছিলেন। মাতৃহারা সেই চারটি শিশু সন্তানের প্রতি তখন ঐ পল্লীর আর এক রমণী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁর নাম ছিল খুদিরাণী। পল্লীর সকলেই তাঁকে 'ছোটবাবু' বলে ডাকতেন। ছোটবাবুর আশ্রিত হয়েই মৃতা পুঁটিরানীর সন্তানেরা এই ভাবে বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। অপরের অন্নে তারা ক্রমশঃ 'বড়ো-সড়ো' হয় এবং সারাদিন মালাপাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। খুদির স্নেহে তাদের 'দুধ-ভাতে' দিন কাটে। অন্যদিকে নাবালক এই চারটি ছেলেমেয়েকে বঞ্চিত করে মুরলী আঢ্যের জ্ঞাতিবর্গরা একসময় সেই বাড়িটি অর্থাৎ যে বাড়িতে পুঁটিরাণীর সন্তানেরা এতকাল শুধুমাত্র বাস করছিল সেটিকেও বেচে দেয়। এর ফলে চারটি সন্তানই প্রকৃতপক্ষে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে বিনাকাজে চারটি শিশুর

হেলাফেলায় রাস্তায় রাস্তায় সারাটা দিন কাটে। শুধু খুদিরানী'র কৃপায় পেটের অন্নের সংস্থানটুকু হয়। এইভাবে একদা বনবিষ্টুপুর হতে আসা 'চাটুজ্জেদের বাড়ির মেয়ে ও মুখুজ্জেদের বাড়ির বৌ' পুঁটিরাণীর ঘটনাবহুল জীবনের পরিসমাপ্তির পর পরবর্তী প্রজন্মের জীবনধারার স্রোতটি অন্য প্রবাহে বইতে থাকে।

বাস্তুচ্যুত খুদিরানীর চারটি সন্তানকে এরপর 'ছোটবাবু' তাঁর কাছেই আশ্রয় দেন। ক্রমশঃ এরা বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো মেয়ে হরিমতীর সঙ্গে রামবাগান অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির বিয়ের ব্যবস্থা করেন স্বয়ং খুদিবালা। তখনকার দিনে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রামবাগান অঞ্চলটি 'রূপোগাছি' নামেই পরিচিত ছিল। বিয়ের কয়েক বছর পরেই হরিমতীর স্বামীর মৃত্যু হয়। বিধবা হরিমতী তার কিছুদিন পরেই জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে গোপনে ঢাকায় পালিয়ে যান। বিয়ের পর রামবাগান অঞ্চলে এসে এই হরিমতীই তাঁর ছোট ভাইবোনদের অর্থাৎ মতিবালা, তিনকড়ি ও রাজবালাকে নিজের নতুন সংসারে এনে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ গোপনে ঢাকায় চলে যাবার পর এই তিনজন আবার অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়। হরিমতীর মৃত স্বামীর পরিবারের লোকেরা স্বাভাবিক কারণেই এদের ভরণপোষণের দায়-দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। বাধ্য হয়ে মতিবালা, তিনকড়ি ও রাজবালাকে পুনরায় আশ্রয়ের খোঁজে পথে বেরোতে হয়।

ঘটনাচক্রে সেই সময় The Great Bengal Circus বা বোসের সার্কাস (Bose's Circus) কলকাতায় ফিরে আসে। সারা বছর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে এই দলটি তখনকার দিনে সার্কাসের খেলা দেখাত। বাঙালীর সার্কাস দল হিসাবেই সেকালে এই সার্কাস দলটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। কলকাতায় ফিরে আসার পর সে সময় দলের পক্ষ থেকে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের দলে নেবার কথা ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন এবং হ্যাণ্ডবিল প্রচার করা হয়। তখনকার দিনে প্রায়ই এইভাবে নতুন নতুন অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের দলে নিয়ে ট্রেনিং দিয়ে নানারকম সার্কাসের খেলা এবং ক্রীড়া-শৈলী শেখানো হোতো। অভাবের তাড়নায় বাস্তুচ্যুত,

আশ্রয়হীন এই তিনটি ছেলে-মেয়ে সেই বিজ্ঞাপন অনুসারেই সার্কাস দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে অবশেষে তাতে যোগদান করে। এই সার্কাস দলের মালিক ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার ছোট জাগুলিয়া গ্রাম নিবাসী প্রফেসর মতিলাল বসু বি. এ।

তখন মতিলাল বসু কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে (ভাল্লুকপাড়া) বসবাস করতেন। মতিলালের পিতা কবি-নাট্যকার মনোমোহন বসু (১৮৩১—১৯১২ খ্রীঃ) ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য এক কৃতী পুরুষ। ১৮৩১ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই তিনি যশোহর জেলার নিশ্চিতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মনোমোহনের পিতার নাম ছিল দেবনারায়ণ বসু। মনোমোহনের জন্মের পর মাত্র তিন বছর বাদেই তাঁর পিতা দেবনারায়ণ বসুর মৃত্যু হয়। মনোমোহনের ছাত্র জীবন অতিবাহিত হয় প্রধানতঃ কলকাতার হেয়ার স্কুলে এবং পরে জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনষ্টিটিউশনে যা বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে সুপরিচিত। লেখাপড়ার জীবনে মনোমোহন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই মনোমোহনের কবিতা রচনার নেশা জন্মায়। কলকাতায় তিনি যখন এসেছিলেন তখন বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। মনোমোহন তাই কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তাঁর প্রথম জীবনের অধিকাংশ রচনাই ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে স্বয়ং মনোমোহন নিজেই দুটি পত্রিকা প্রকাশ করে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পত্রিকা দুটির নাম—'সংবাদ বিভাকর' (১৮৫২ খ্রীঃ-এ প্রথম প্রকাশিত) ও 'মধ্যস্থ' (১৮৭২ খ্রীঃ-এ প্রথম প্রকাশিত) * এছাড়া মনোমোহন সেকালের বিখ্যাত 'হিন্দু মেলা'র একজন বিশিষ্ট কর্মীও ছিলেন।

বন্ধু মাইকেলেরও তিনি ছিলেন গভীর অনুরাগী। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবার বেলা দুটোয় কবি মধুসূদন কলকাতার জেনারেল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। মৃত্যুর আগে এই হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে মধুসূদন তাঁর একান্ত প্রিয় বন্ধু মনু অর্থাৎ
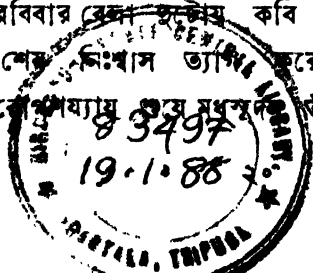
এই কবি ও নাট্যকার মনোমোহনকে অনুরোধ করে বলেছিলেন—**If you have one bread, you must divide it between yourself and my children, if you say, I will, I depart with consolation.** মাইকেলের মৃত্যুর পর মনোমোহন এককভাবে তাঁর সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় ২১শে আষাঢ় ১২৮০ বঙ্গাব্দ, (২য়ভাগ ১৩ সংখ্যা) এ নিয়ে অনেক-খানি এগিয়ে এসেছিলেন। ঐ তারিখের প্রতিবেদনে মনোমোহন লিখেছিলেন মাইকেলের পরিচয়, কীর্তি এবং মৃত্যু সংবাদ। তদুপরি ঐ প্রতিবেদনেই অবশেষে দেশবাসীর কাছে বন্ধুর জন্যে আবেদনও জানিয়েছিলেন। আবেদনে প্রচারিত হয়েছিল 'কবি মাইকেলের নিরাশ্রয় পুত্রদ্বয়ের সাহায্যার্থে চান্দা'। 'মধ্যস্থ' পত্রিকার আবেদনে সেকালে সকলেই আন্তরিক ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সিরাজগঞ্জের মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চাঁদা-প্রাপ্তি। এতে অভিভূত হয়েছিলেন অনেকেই, এমন কি স্বয়ং মনোমোহন বসুও। সিরাজগঞ্জের গোলাম রসুল খাঁ, নজাহের উল্লা, আবদুল রহমন খাঁ, মৌলবী জিনতুল্লা খাঁ, নেজারতুল্লা খাঁ, মিছিল ইলিম খাঁ প্রমুখ সদাশয় মহৎপ্রাণ ব্যক্তি চাঁদা পাঠালেন 'মধ্যস্থ' কার্যালয়ে। ১৪ ভাদ্র ১২৮০ সংখ্যার মধ্যস্থে সম্পাদক মনোমোহন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন: 'ইঁহারা মুসলমান হইয়া হিন্দুকবির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ প্রদর্শন করাতে অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইতেছেন। যদিও দানের মুদ্রা-সংখ্যা অতি সামান্য, কিন্তু তাহাতে কি আইসে যায়? এরূপ অনুষ্ঠানে যাঁহার যাহা সাধ্য তদ্দানে অগ্রসর হওয়াই মহত্ত্ব। ধন নাই, তবু মন ও মনের ভক্তি যে আছে তদভিজ্ঞান প্রদর্শন সামান্য লাভ নহে।'...

একথা স্বীকার্য যে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী মধুসূদন সমসাময়িক সাধারণ হিন্দুদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তির, সঙ্গে কটাক্ষপূর্ণ অবহেলাও পেয়েছেন। বিদ্বজ্জন সমাজের কিছু পণ্ডিত ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র সেখানে ধর্ম প্রধান ছিল না, ছিল গুণের সমাদর। মনোমোহন বসুও মধুসূদনের সকল কাজ ভালো চোখে দেখেন নি। কিন্তু তাঁর কাব্যের সমাদরে কখনো তিনি অনীহা দেখাননি। তাই তাঁর মৃত্যুতে তাঁর অনাথ সন্তানদের কীভাবে সাহায্য করা যায় তার চেষ্টা ছিল মনোমোহনের ঐকান্তিক। যে অর্থ সাহায্য পেয়েছেন

তিনি সব পাঠিয়ে দিয়েছেন ডবলিউ সি ব্যানার্জির 'সাহায্য ফাণ্ডে'। 'কেহ কেহ বলেন, তিনি অতন্ত লম্পট ও মন্তপ ছিলেন একথা সত্য হইলেও অসাধারণ গুণাবলী স্মরণে মনোমোহন কিন্তু মধুবিয়োগে হাহাকার করেছেন —হায় বাঙ্গালা সাহিত্যের আজ বড় দুর্দিন।'

(মধুসূদনের অনাথ শিশু—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, রবিবাসরীয় ২, আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬ সেপ্টেম্বর' ৮২, পৃঃ ৯)

ঠাকুর্দা মনোমোহন বসু সম্পর্কে ইন্দুবালার মনে অনেক স্মৃতি আজও ভাস্বর হয়ে আছে। যেমন তাঁর মনে পড়ে ছোটবেলায় তিনি পড়তেন মনোমোহন বসুর লেখা ছোটদের পাঠ্য কবিতাগ্রন্থ 'পদ্যমালা'র প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ। ছোটবেলায় চার-পাঁচ বছরে শোনা এবং মুখস্থ করা 'পদ্যমালা'র (প্রথম ভাগ) সেই কবিতা 'নিদ্রাভঙ্গ' (পিতাপুত্র) এখনো তাঁর স্মরণে আছে। যেমন—

রাত্রি পোহাইল উঠ প্রিয়ধন
কাক ডাকিতেছে, কর রে শ্রবন
উঠেছে প্রবোধ উঠেছে বিপিন,
চারু, চুণী, মতি উঠেছে নবীন ;
সেজে এসে অই ডাকিছে তোমায়
তুমি গেলে তা'রা বিলম্বে তোমার
তাই বলি যাদু ঘুমায়োনা আর
উঠে মুখ ধুয়ে খাবে কিছু খাও
বেশভূষা করে বেড়াইতে যাও
বেড়াইতে বেড়াইতে আলস্য ঘুচিবে···
দেখ মতি কত ফুল ফুটেছে বাগানে
দুটি ফুল দাও বাবা পরি দুট কানে
তবে আগে বল দেখি কোন ফুল ভালো
ঐ রাঙা ফুল যার রূপে গাছ আলো
ও ফুল দেখিতে ভালো গুণে ভালো নয়
ফুলের কি গুণ বাবা কিসে ভাল হয়

মিষ্ট গন্ধ থাকে যদি গুণ বলি তাকে…
তবে আমি মিষ্ট কথা কহিতে শিখিব
তাহলে তো সকলের আদর পাইব
শুধু মিষ্ট কথা বাপু কহিলে কি হয়
মিথ্যা কথা সত্য হবে সত্য মিথ্যা নয়।

আর একটি কবিতা 'দুটি ভাই' পদ্যমালা গ্রন্থের ২য় ভাগের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। কবিতাটির প্রথম দুই লাইন যথাক্রমে—

রামেদের বুধি গাই প্রসব করিল
রাম শ্যাম দুটি ভাই দেখিতে আসিল।

গ্রন্থ দুটির প্রত্যেকটি কবিতার পাশে ছবি আঁকা ছিল। যেমন বিছানায় খাটের পাশে মা ছেলেদের ঘুম ভাঙাচ্ছেন ছবিটি 'পিতাপুত্র' কবিতার এবং একটি গাভীর বাচ্চা হয়েছে জেনে দুই ভাই রাম এবং শ্যাম তা দেখতে এসেছে, এই ছবিটি আঁকা ছিল 'দুই ভাই' কবিতায়।

চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, সখারাম দেউস্কর সহ ব্যক্তিজীবনে মনোমোহন ছিলেন অনেকের সঙ্গেই সবিশেষ পরিচিত, ঘনিষ্ঠ এবং স্নেহভাজন। মনোমোহনের কবিতাও সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং তাঁর কিছু কিছু কবিতা ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুল পাঠ্য-পুস্তকেরও অন্তর্ভুক্ত হয়।

মনোমোহনের তিন পুত্র। প্রবোধ, মতিলাল এবং প্রিয়নাথ। মনো-মোহনের দ্বিতীয় পুত্র মতিলাল বসুর 'বোসেস সার্কাস' দলে ছোট ভাই প্রিয়-নাথও যুক্ত ছিলেন। এই সার্কাসে প্রিয়নাথ ছিলেন সহযোগী এবং তিনি ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারদের খেলার Ring Master এর দায়িত্বও পালন করতেন। এই বোসের সার্কাস দলে যোগ দিয়ে মতিবালা, তিনকড়ি ও রাজবালা সেকালে খুবই সুনাম অর্জন করেন। বিশেষ করে তিনকড়ি দাস ওরফে 'তেনা' ও ছোটবোন রাজবালার নৈপুণ্য ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনকড়ি দাস প্রধানতঃ সাইকেলের ব্যালেন্স খেলায় যথেষ্ট

'পদ্যমালা' (১৮৭০)—মনোমোহন বসু, ৭৩/৩ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্রীড়াকুশলতা প্রদর্শন করতেন। বিশেষ করে তারের ওপর দিয়ে সাইকেল চালানোর খেলায় তিনকড়ির খুবই সুনাম হয়েছিল।

মনোমোহন সেকালের নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত ছিলেন। জাতীয় হিন্দুমেলার (প্রথম অধিবেশন ১৮৬৭) ও জাতীয় সভার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ব্যায়ামশালার প্রদর্শনীতে (এপ্রিল ১৮৭৩) হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভার অন্যতম পুরুষ এই কবি ও নাট্যকার রাজনারায়ন বসুর উপস্থিতিতে বক্তৃতায় বলেছিলেন—বাংলা-দেশে দৈহিক উৎকর্ষের এইরূপ উৎসাহ দেখিয়া মনে এইরূপ একটি ভাবের উদয় হইতেছে, যেন জ্ঞান নামক পুরুষ বিদ্যা নাম্নী রমনীর সহযোগে একটি অপূর্ব্ব কন্যার উৎপাদন করিলেন। সে কন্যার নাম যুক্তি। যুক্তি দিন দিন বর্দ্ধিতা ও বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠিল। তাহার পিতামাতা সুপাত্রের অভাবে মহা উদ্বিগ্ন। এমন সময় ব্যায়ামের বংশধর সাহস নামা সুপাত্রপ্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে তাহাকে ঐরূপ গুণবতী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই পবিত্র ঘটনা দৃষ্টি করিয়া আমাদের বিলক্ষণ আশা হইতেছে "স্বাধীনতা" নাম্নী সুরম মোহিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন। (সূত্র: সার্কাস ও সার্কাসে বাঙালী—রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, শারদীয় মহানগর ১৯৮২ পৃঃ ৬১)

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর সুদীর্ঘ আলোচনায় অনেক তথ্য ও ঘটনা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। · সার্কাস সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে প্রোফেসর বোসের

* সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় কবি মনোমোহন সম্পর্কে লেখা হয়েছিল,—"নাটক রচনায় পুরাতন নাটগীতির সহিত আধুনিক নাটকের যোগাযোগ ঘটাইয়া তিনি যে নূতন রীতির সৃষ্টি করিলেন, তাহা তৎকালীন শিক্ষিত মার্জিত রুচি বাঙ্গালীদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই আদর্শেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটক রচনা করেন। মনোমোহনের প্রথম রচনা "রামাভিষেক নাটক" (১৮৬৭) পৌরাণিক এবং দ্বিতীয় নাটক "প্রণয় পরীক্ষা নাটক" (১৮৬৯) সামাজিক। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পদ্যমালা (১৮৭০), সতী নাটক (১৮৭৩), হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৭৫), হিন্দুর আচার ব্যবহার (১৮৩৩), বক্তৃতামালা (১৮৭৩), দুলীন (ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৮৯১) উল্লেখযোগ্য।...তিনি কলকাতায় "মনোমোহন লাইব্রেরি" নামে একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্বাহক সভার সভ্য ছিলেন এবং ১৩০৩ বঙ্গাব্দে ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতির পদ লাভ করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারী তিনি ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।"—দ্রঃ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিত মালা, ৫১ সংখ্যা, কলিকাতা ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' সম্বন্ধেও তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু 'প্রোফেসর বোস' বলতে তিনি মনোমোহনের ছোট ছেলের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর 'বাঙালীর সার্কাস' গ্রন্থের (১৩৪৩) খবরাখবর অনুযায়ী 'প্রিয়নাথ বোসই' ছিলেন গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের মালিক। প্রসঙ্গতঃ তিনি প্রোফেসর বোসের অসম্পূর্ণ স্মৃতি কথা—'অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত' (১৩০৯) গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন যা তিনি চেষ্টা করে কোথাও খুঁজে পাননি। ফলে এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পর্কে যা কিছু তিনি এই আলোচনায় উল্লেখ করেছেন তা মূলতঃ অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর* 'বাঙালীর সার্কাস' (১৩৪৩) গ্রন্থের সূত্রানুযায়ী সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

কিন্তু শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্রে যিনি মনোমোহনের দ্বিতীয় পুত্র মতিলালের কন্যা এবং সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা হিসেবে পরিচিতা এবং এখনও বর্তমান তাঁর মতে,—

'পাথুরিয়াঘাটার মালাপাড়ায় আমার মায়ের জন্ম। মা-রা ছিলেন তিন বোন, ভাই একটি। মা সবার ছোট। ছেলেবেলাতেই মা তাঁর বাবা-মা দুজনকেই হারান। মামার বাড়ীতে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি তাঁদের দেখাশোনা করতে পারতেন। শেষে বড়মাসী এসে সকলকে তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। মাসীর দরদ ছিল বটে, তবে তাঁর শ্বশুরবাড়ীর লোকের ব্যাপারটা আদৌ বরদাস্ত হল না। অনেক গঞ্জনা সহ্য করেও মাসী কিন্তু অনাথ শিশুদের কাছ ছাড়া করেন নি।

মাসীর শ্বশুর বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে সার্কাসের মালিক ত্রিম্বক রাও দেবলের পরিচয় ছিল। উনি প্রথম আমার মেজমাসীকে নিজের দলে নিয়ে গেলেন। সে সময় আর এক নামকরা সার্কাস দল ছিল। লোকে বলত প্রফেসর বোসের 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'। মালিকের পুরোনাম মতিলাল বোস —অর্থাৎ আমার বাবা।

বাবা খুব নামকরা বংশের ছেলে ছিলেন। কবি মনোমোহন বোস আমার ঠাকুর্দা। বাবা বি. এ পাশ করেছিলেন। ইংরিজী বলায় ও লেখাতেও নাম

* মনোমোহনের পৌত্রের নাম ছিল অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

ছিল। স্বভাবে বাবা মানুষটা ছিলেন ধর্মভীরু। শুনেছি স্বামিজী বাবাকে স্নেহ করতেন। জীবনের সব ব্যাপারে তিনি কতটা ধর্ম বজায় রাখতে পেরেছিলেন জানিনা, তবে কিছু কিছু সততার কথা শুনেছি। যেমন, বাবা অফিস থেকে কোনদিন কোন কাগজ-কলম নিয়ে আসতেন না। সহকর্মীরা জিগ্যেস করলে বাবা বলতেন, "নিজের কাজের জন্য অফিসের জিনিষ নিয়ে যাওয়া তো চুরি করা।" হয়তো সারাটা জীবন চাকরীই করে যেতেন যদি না সস্তায় যোগীন বসুর সার্কাস দল কিনে নেবার সুযোগ আসতো। ঐ সার্কাসের সূত্রেই মেয়ে খুঁজতে আমার মা'র সঙ্গে বাবার পরিচয়। সার্কাসের ম্যানেজার মনসাবাবু বড়মাসীর কাছ থেকে আমার মা ও মামাকে নিয়ে গেলেন একদিন। মামার বয়স তখন আট। আর মা'র সাড়ে ছয়। অল্পদিনের মধ্যেই মা ও মামা দুজনেই ওস্তাদ খেলোয়াড় হয়ে উঠলেন। তারের ওপর সাইকেল চালানোয় মামার জুড়ি ছিলনা। আর মা'র খেলার কথা তো আগেই বলেছি। মা যখন কিশোরী তখনই তাঁর ওপর বাবার নজর পড়লো। একদিন মামাকে ডেকে বললেন, "তেনা, তোর বোন আমার কাছেই থাক।" প্রস্তাবটা কিন্তু মায়ের মনঃপূত হ'ল না। বরং অপমানিত বোধ করলেন। স্পষ্ট বলে দিলেন, "বিয়ে না করলে এক সঙ্গে থাকার প্রশ্নই ওঠে না।" বাবা বললেন, "বেশ তাই হবে।" তখন উজ্জয়িনীতে সার্কাস চলছে। বাবা মাকে নিয়ে সেখানকার এক মন্দিরে গেলেন। পুরোহিতকে সাক্ষী রেখে মালা বদল হল।...

যাই হোক, প্রথম দিকটায় বাবা-মার সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। সংসারে ও পেশায় পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি হয়েছিলেন। সার্কাসের সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে যখন তাঁরা পাঞ্জাবের অমৃতসরে এসে হাজির হলেন, তখনই আমার জন্ম। তারিখ ১৯শে কার্তিক, ১৩০৫।'

(সূত্র : অতীত দিনের স্মৃতি—ইন্দুবালা দেবী, আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৯ পৃঃ ৮৭-৮৮)

মতিলাল সার্কাসের যাতায়াতের কালে রাজবালাকেও তাঁর সঙ্গে সেলুনে নিতেন।

বোসের এই সার্কাস দলে তিনকড়ি* ও তাঁর দুই বোন যখন খেলা দেখাতেন তখন সার্কাসের ম্যানেজার ছিলেন সেকালের সার্কাস জগতের স্বনামধন্য 'মনসাবাবু' বা মনসাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আট বছরের বালক তিনকড়ি এবং সাড়ে ছয় বছরের মেয়ে রাজবালা ১৮৯৩ খ্রী: যখন এই সার্কাস দলে যোগ দিয়েছিলেন তখন সার্কাস কোম্পানীর খাতায় তাঁদের ঠিকানার জায়গায় লেখা হয়েছিল ১৫/১ নং দর্পনারায়ন ঠাকুর ষ্ট্রীট, পাথুরিয়াঘাটা।** এই ঠিকানাতেই এদের মা পুঁটিরানী মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছিলেন বলে মনে হয়।

অন্যদিকে সার্কাস দলে ঢুকে রাজবালা প্রধানতঃ ট্রাপিজ বা ব্যালেন্সের খেলাই দেখাতেন। যেমন, একটা ছোট্ট টেবিলে চারটে বোতলের ওপরে আটটি অনুরূপ মাপের টেবিল (পর পর চারটে বোতল খাড়া করে) সাজানো হোতো।

রাজবালা নীচের টেবিল থেকে খেলা দেখাতে দেখাতে ক্রমশঃ ওপরের টেবিলে শরীরের ভারসাম্য রাখতে রাখতে উঠে আসতেন। পরে আবার

---

* বোসের সার্কাস দলের তিনকড়ি দাস পরবর্তীকালে এক সময় Entally Talkies এ নির্বাক ছবি প্রদর্শনকালে ছবির বিষয় বস্তুর ওপরে ধারাভাষ্য দান করতেন। ইন্টালী টকীজের সেকালে খুব নাম ছিল। এর তখনকার মালিক দুলি চট্টোপাধ্যায় ওরফে 'দুলিবাবু' ছিলেন তিনকড়ির সবিশেষ পরিচিত। তাঁর একান্ত অনুরোধেই তিনকড়ি বহুবার এই ধারাভাষ্যের কাজে সম্মতি জানিয়েছিলেন। এছাড়া জনৈক নারায়ন বসাক নামে এক ব্যক্তি সেকালে সারা দেশে Silent Picture বা নির্বাক ছবি দেখিয়ে বেড়াতেন। তিনিও তিনকড়িকে তাঁর দলে ধারাভাষ্যের কাজে নিয়ে আসেন। ছবি দেখিয়ে তারপর নারায়ণ বসাকের প্রচুর অর্থ উপার্জন হয়। তাঁর সেই সাফল্যের মূলে অনেকখানি কৃতিত্ব এই তিনকড়ি দাসের ছিল। কেননা ছবির নির্বাক মুহূর্তগুলির বিষয় ও বক্তব্যকে তিনকড়ি বলার গুণে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলতে সক্ষম হতেন। যেমন শব্দহীন ছবিতে চলমান কোন জন্তু জানোয়ারের সেই ভঙ্গীটির বর্ণনা অথবা প্রাচীন কোনো স্মৃতিস্তম্ভ বা দেবস্থানের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় পরিচয় প্রদান ইত্যাদি।

সার্কাসের দলে থাকার সময় তিনকড়ি কখনো কখনো Clown এর খেলা বা ঘোড়ার খেলায়ও অংশগ্রহণ করতেন। ফলে দর্শককে ছবির বর্ণনাকালে মজার মজার ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি দর্শকদের খুব হাসাতেন। এই সময়ে তিনকড়িকে অস্থায়ী তাবু খাটিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দলের সঙ্গেই থাকতে হত।

** 'সার্কাসে ভূতের উপদ্রব' নামে একটি রচনা প্রোফেসর বসু লিখেছিলেন 'নাট্যমন্দির' [বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা] ফাল্গুন ১৩১৭ সংখ্যায়।

বোতলের ওপরই ভর করে সাজানো টেবিল থেকে একই পদ্ধতিতে নেমে আসতেন অথবা একেবারে ওপরের টেবিলটি থেকে নিজের দেহটিকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়ে নীচের টেবিলে রাখা একটি প্লেট থেকে চপ, কাটলেট ঠোঁট দিয়ে তুলে মুখে নিতেন বা খেতেন। এই Bone-less বা ব্যালেন্সের খেলায় রাজবালার আসাধারণ নৈপুন্য দেখে সেকালের দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। দিদি মতিবালাও সার্কাসে তারের খেলাই দেখাতেন।

একদা মতিলাল বসুর এই সার্কাস দলের সঙ্গে Classic Theatre এর ম্যানেজার ও সত্বাধিকারী শ্রীযুক্তবাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবল বিরোধ ঘটে। অমর দত্ত কলকাতার Police Court-এ মতিলাল বসুর বিরুদ্ধে অলঙ্কার গচ্ছিত রেখে তা ফেরৎ পাননি বলে অভিযোগ এনেছিলেন। এতে মতিলালের আপাতভাবে সুনামের হানি হয়। কিন্তু অবশেষে অমরেন্দ্রনাথ নিজের অন্যায়ের কথা স্বীকারপূর্বক ক্ষমা ভিক্ষা করে মতিলালের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নেন। এ উপলক্ষে সেই সময় জনসাধারণের কাছে প্রচারের উদ্দেশ্যে ক্লাসিক থিয়েটারের পক্ষ থেকে একটি হ্যাণ্ডবিল (১৯০৫) প্রচারিত হয়। তাতে লেখা ছিল—

প্রোফেসর বোসের সার্কাসে

সময় পরিবর্তন

১২ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার

হইতে

২১শে জানুয়ারী শনিবার

পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ন ৪টার সময় খেলা হইবে। কেবল

বুধ ও শনিবার রাত্রি ৯টার সময়

অতিরিক্ত খেলা হইবে। পরে

২৩শে জানুয়ারী, এই সার্কাস

ময়মনসিংহ মহারাজার বাড়ী বায়না

উপলক্ষে যাত্রা করিবে।

মহিলাগণের জন্য আরও ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

টিকিটের মূল্য পূর্ব্ববৎ

এই সার্কাসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু মহাশয়ের নামে, ক্লাসিক থিয়েটারের ম্যানেজার ও সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা পুলিশ আদালতে গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত মতি বাবুর নিকট অলঙ্কার গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন বলিয়া যে মামলার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে উক্ত অমর দত্ত মতিলাল বসুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা সূচক যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইল।

[অপর পৃষ্ঠায় ছাপা ছিল]

CLASSIC THEATRE

3-1-05

"শ্রদ্ধাস্পদ পরম পূজনীয়

"শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু

"Proprietor, GREAT BENGAL CIRCUS"

"পূজ্যপাদ মতিবাবু মহাশয়,

"এখন বেশ বুঝিয়াছি পূর্ব হইতে যে স্নেহচক্ষে আমাকে দেখিয়া আসিতেন, সেই নিঃস্বার্থ স্নেহপ্রবলতা এখনও সমভাবে বর্ত্তমান।

"আপনার উচ্চ হৃদয়ের ভ্রাতৃপ্রেমের পবিত্র আসন হইতে, আমি যে বিচ্যুত হইয়া পড়ি নাই, এ আমি সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। এ অবস্থায় পুলিশ কেশ্ চালাইয়া, শত্রুর মুখোজ্জ্বল করা, আর বিধেয় নহে।

"যে পরিমাণ দোষে আমি দোষী, অন্ততঃ পূর্বস্নেহের খাতিরে বিস্মৃত হইয়া, অন্তর হইতে পূর্ণ প্রাণে ক্ষমা করিয়া, আবার ভাই বলিয়া কোলে টানিয়া লউন, এই আমার প্রার্থনা। আপনার নিকট অলঙ্কার গচ্ছিত রাখিয়া ছিলাম বলিয়া, আমি যে মামলার সূত্রপাত করিয়াছিলাম সে সম্বন্ধে মুক্ত কণ্ঠে জগত সমক্ষে জানাইতেছি, যে আপনি তাহাতে কোনও রূপে দোষী বা সংশ্লিষ্ট নহেন। আপনার পবিত্র উজ্জ্বল নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে, আমি যে একটা ভুল বুঝিয়া, অযৌক্তিক দোষারোপ করিয়া দাগ পাড়িতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহার জন্য আমি মর্মান্তিক দুঃখিত, এবং মুক্ত প্রাণে আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

"আপনার কলঙ্ক মোচনের জন্য এই পত্র আপনি সর্বসাধারণ্যে প্রচার অথবা যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন।

"স্নেহাকাঙ্ক্ষী,

"(স্বাঃ) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

"3-1-05"

মতিলাল বসুর সামাজিক প্রতিপত্তি ও সম্মানের কিছুটা প্রত্যক্ষ পরিচয় এই হ্যাণ্ডবিলের বক্তব্যের মধ্যে সুপরিস্ফুট।

মতিলালের সার্কাসে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজবালার সম্মান ও প্রতিষ্ঠাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশাপাশি কৈশোর থেকে যৌবনে প্রবেশের সন্ধিক্ষণে তাঁর দৈহিক গড়ন এবং শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির ফলে তার উপর অনেকেরই নজর পড়ে। এই সময় অতি সহজেই তিনি সার্কাসের মালিক মতিলাল বসুর বিশেষ স্নেহ ও ভালবাসার পাত্রী হিসেবে পরিগণিত হন। রাজবালার সৌন্দর্য ও গুণে মুগ্ধ হয়ে মতিলাল বসুই অবশেষে একদা তাঁর পাণিগ্রাহী হবার বাসনা ব্যক্ত করেন। ফলে সেই সময় উজ্জয়িনীতে সার্কাস দলের সফরকালে সেইখানেই এক কালী-মন্দিরে গিয়ে এক বাঙালী পুরোহিতের উপস্থিতিতে দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে মতিলাল ও রাজবালা পরস্পর মাল্য বিনিময় করেন এবং পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সেদিন ছিল ৪ঠা এপ্রিল ১৮৯৯ সাল। রাজবালা তার পরেও স্বামী মতিলালের সঙ্গে সার্কাসের দলে ঘুরে ঘুরে কয়েক মাস খেলা দেখানোর পর এক সময় পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে আসার পরে অর্থাৎ উজ্জয়িনীতে ওই বিবাহের পর ঠিক 'ছ'মাস উনিশ দিন' পরে রাজবালার একমাত্র কন্যা ইন্দুবালার জন্ম হয়। প্রসবকালে উদ্বিগ্ন হয়ে মতিলাল কলকাতা থেকে সেকালের প্রখ্যাত সার্জেন ডাঃ বিধুমুখী বসুকে অমৃতসরে নিয়ে গিয়েছিলেন। জন্মের পর ইন্দুবালার একটি চোখ কয়েকদিন বন্ধ ছিল। একদিন ধৈর্য্যহীন হয়ে রাজবালা জোর করে চোখটি খুলে দেওয়ায়, পরিণতিতে সেই চোখটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সার্কাসের তাবুতে নবজাত কন্যাকে নিয়ে থাকার অসুবিধে হওয়ার ফলে মতিলাল সকন্যা রাজবালাকে কলকাতায় ২১নং দয়াল মিত্র লেনের বাড়িতে এনে রাখার ব্যবস্থা করেন। সার্কাসের প্রয়োজনে মতিলালকে তখন

দলের সঙ্গে প্রায়ই চলে যেতে হত। ফলে রাজবালা একাই এই শিশু-কন্যাকে কলকাতায় বাড়িতে রেখে বড়ো করতে তুলতে থাকেন। মতিলালও প্রায় নিয়মিত স্ত্রী ও কন্যার জন্য অর্থ প্রেরণ করতেন, কলকাতায় এলে এদের দেখাশোনা করতেন। এদিকে কন্যার জন্মের পর থেকে সার্কাসে আবার ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে রাজবালার আর কোন উৎসাহ রইল না।

এই সময় রাজবালার জীবনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ওই সময়ে মেদিনীপুর জেলার খেজুড়ীর জমিদার জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ২৪ নং দয়াল মিত্র লেনের জনৈকা প্রতিবেশীর বাড়িতে আসতেন। তিনি ছিলেন মতিলালের মাতুল সম্পর্কীয় ভাই। মতিলালের নির্দেশানুযায়ী কলকাতায় মতিলালের অনুপস্থিতির সময়ে জীবনকৃষ্ণ রাজবালা ও শিশুকন্যা ইন্দুবালার প্রায়ই খোঁজখবর নেওয়া বা দেখাশোনা করতেন। শিশু ইন্দু তাকে 'কাকাবাবু' বলে সম্বোধন করতেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্রমশঃ এই পরিবারের অভিভাবকের মর্যাদা লাভ করেন।

মতিলাল সার্কাসের ছুটির ফাঁকে কলকাতায় এসে তাঁর হাতিবাগানের বাড়িতেই উঠতেন। সার্কাসে উৎসাহ হারিয়ে রাজবালা একদা জীবনকৃষ্ণ ঘোষের সাহায্যে কিছুকালের জন্যে সিমলা স্ট্রীটের একটি বাড়িতে এসে ওঠেন। কন্যা ইন্দুবালার তখন মাত্র তিন বছর। তার পর অবশ্য রাজবালা কন্যাকে নিয়ে আবার রামবাগান অঞ্চলেই এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ক্রমশঃ জীবনকৃষ্ণ রাজবালার পরিবারেই অভিভাবকের ন্যায় বাস করতে থাকেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এই পরিবারের অন্যতম ঘনিষ্ঠ জন। এই জীবনকৃষ্ণ ঘোষের পিতার নাম ছিল নুটবিহারী ঘোষ। সেকালে নুটবিহারীর রামবাগানে সোনারূপার ব্যবসা ছিল। নুটবিহারীর তিনপুত্র যথাক্রমে জীবনকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রকৃষ্ণ। জীবনকৃষ্ণের ছিল দুটি বিবাহ। উভয়পক্ষেই তিনটি করে সন্তান হয়েছিল। অন্যদিকে রাজবালার বড়ো বোন বিধবা হরিমতীকে কিছুকাল আশ্রয় দিয়েছিলেন স্বয়ং নুটবিহারী ঘোষ। নুটবিহারীর মধ্যম পুত্র দেবেন্দ্রনাথেরও পাঁচ ছেলে আর দুই মেয়ে। ছেলেদের নাম রেখেছিলেন যথাক্রমে প্রণব (মানা), মানব (সোনা), সমীর (সামু), গোপাল ও গোবিন্দ (নাড়ু)। দুই

মেয়ের নাম গীতা (২য় সন্তান) ও মায়া (৪র্থ সন্তান)। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। জীবনকৃষ্ণ রাজবালার পরিবারে থাকাকালীন প্রায় বিরাশী বছর বয়সে (৬ই ফাল্গুন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ) প্রাণত্যাগ করেন।

খুব ছোটবেলা থেকেই রাজবালার গানবাজনার ব্যাপারে খুব উৎসাহ এবং ঝোঁক ছিল। ওই বয়স থেকেই তিনি খুব ভালো গাইতেও পারতেন। পরবর্তীকালে পুরাতনী এবং বিশেষ করে টপ্পাঙ্গের গানেও রাজবালার বেশ দখল ছিল। সার্কাস থেকে সরে আসার পর তাই তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্য ও মুন্সীয়ানার সঙ্গে বিভিন্ন আসরে এই সব গান পরিবেশন করতেন। বিশেষ করে সিমলা ষ্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে আসার পর থেকেই অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে রামবাগানে এসে তিনি থিয়েটার ও গান বাজনাকেই পেশাগত ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী মতিলাল ছিলেন তখনকার গ্র্যাজুয়েট এবং ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। তা সত্ত্বেও এই ইংরেজীতে কথাবার্তায় চৌকশ মতিলাল সার্কাসকেই জীবনের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন! সার্কাসই ছিল তাঁর আজীবন কালের ধ্যান ও জ্ঞান। ধর্মভীরু এই মানুষটিই প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে তাঁরই সার্কাসের এগারো বছরের রাজবালাকে পছন্দ করে বিয়ে করার পর মাত্র তিন বছর বাদেই কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ক্রমশঃ রাজবালার কাছ থেকে দূরে সরে যান। কন্যা ইন্দুর জন্যে যদিও তিনি পরবর্তীকালে রাজবালার গৃহে আসতেন ঠিকই, বা প্রয়োজনবোধে তিনকড়ির (শ্যালক তিনকড়ি দাস ওরফে তেনা) সাহায্যে ইন্দুবালাকে তাঁর হাতিবাগানের বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন; কিন্তু মানসিক দিক থেকে রাজবালাকে তিনি আর পুনরায় গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেননি। বাধ্য হয়ে তিন বছরের কন্যা ইন্দুকে নিয়ে নতুনভাবে জীবন গড়ার কাজে রাজবালাকে পা বাড়াতে হয়।

রাজবালার স্বামী মতিলাল নিজেও সঙ্গীত বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। মতিলালের কাছেই রাজবালা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রেরণা লাভ করেন। একদা মতিলাল রাজবালাকে ধ্রুপদাঙ্গের গানও শিখিয়েছিলেন। সেই শিক্ষাকে আরও পরিশীলিত করার বাসনায় পরবর্তীকালে রাজবালা বাড়িতে ওস্তাদ রেখে সঙ্গীত চর্চা ও সঙ্গীতের ভাবনায় নিজেকে গভীরভাবে

নিয়োজিত করেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গতে সহযোগিতা করতেন সেকালের শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজ শিল্পী ওস্তাদ দুলী ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে রাজবালা যখন সঙ্গীতে প্রবল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তখন তাঁর বাড়িতে প্রাত্যহিক সান্ধ্য আসরে যোগ দিতে উপস্থিত হতেন সেকালের প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পীর দল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোবিন্দপ্রসাদ মিশ্র, লছমীপ্রসাদ সিংহ, গোবিন গুরু। কেশবপ্রসাদ মিত্র, চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীবাবু, ছোটো ও বড়ো দুলী খাঁ, সাতকড়ি ওস্তাদ (অন্ধ), গিরিবালা, বিড়ালহরি ইত্যাদি। বিবাহোত্তর কালে রামবাগানে ২৪ নং দয়াল মিত্র লেনের জীবনে সঙ্গীত চর্চা ও পরিবেশন করেই রাজবালার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হ'ত।

শোনা যায়, রাজবালা ও মতিলালের মধ্যে মানসিক দূরত্ব থাকলেও পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বেশ কিছুকাল নাকি একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি। সার্কাসের অবসরে মতিলাল কলকাতায় এলেই প্রথমে কন্যা ইন্দুকে দেখতে আসতেন বা ডেকে পাঠাতেন। দূরে থাকা কালে তাঁর আদরিনী কন্যার জন্যে টাকাও পাঠাতেন প্রায়ই। প্রয়োজনে ইন্দুকে মামা তিনকড়ি মতিলালের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। অবশ্য মূলতঃ রাজবালার উপার্জিত অর্থেই তখন এঁদের সংসার চলত।

ইন্দুবালার ভাষ্যানুযায়ী, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মতিলাল কন্যা ইন্দুবালাকে মাসে মাসে কুড়ি টাকা করে মনসাবাবুর হাত দিয়ে নিয়মিত পাঠাতেন। এছাড়া রাজবালাকে রামবাগানে তিনি নাকি ভরণপোষণের জন্য ছোট একটি তিনতলা বাড়িও কিনে দিয়েছিলেন। অবশ্য রাজবালা এক বছর পরে বাড়িটি ছ' হাজার টাকায় বেচে দেন। বাড়িটি এখনো আছে এবং বাড়ির সামনে এখনো শীতলা পুজো হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজবালার কাহিনী

মতিলাল বসুর কাছ থেকে সরে আসার পর রাজবালা থিয়েটারের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন। পেশাদারী থিয়েটারে যোগ দিয়ে রাজবালা প্রথমে মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য্য' নাটকে অভিনয় করেন। প্রথম অভিনয় ২রা মাঘ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ (১৯০৯ খ্রীঃ)। এই নাটক রচনার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে 'গিরিশচন্দ্র' প্রণেতা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৯২৭ খ্রীঃ 'শঙ্করাচার্য্য' শিরোনামায় লিখেছিলেন—'শাস্তি কি শাস্তি'র অভিনয়ে অর্থাগম সম্বন্ধে আশানুরূপ ফল না হওয়ায় নূতন নাটক লিখিবার প্রয়োজন হইল: কিন্তু কি লেখা যায়? ইহাই এক সমস্যা। অসংখ্য নাটক, নভেল প্রভৃতির জনক ইউরোপীয় সমাজের মত বাঙ্গালার সমাজ নানা বৈচিত্র্যময় নহে, ইহাতে সৎকীর্ত্তির যেমন অভ্রভেদী উচ্চতা নাই, পাপেরও তেমনি অতলস্পর্শী গভীরতা নাই। আমাদিগের এই বৈচিত্র্যহীন সমাজে যে কিছু সমস্যা আছে, 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'বলিদান', প্রভৃতি নাটকে তাহা একে-একে প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; একটা বিষয় আছে—ভাই ভাই মামলা-মকদ্দমায় সংসার ছারখার—গিরিশচন্দ্র এই বিষয় লইয়া 'কোহিনুরে'র জন্য একখানি নাটক লিখিতেছিলেন, তাহার চারি অঙ্ক শেষ হইবার পর উক্ত থিয়েটারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় এবং স্বত্বাধিকারীর সহিত মামলাবশতঃ ঐ চারি অঙ্ক তখন আদালতের জিম্মায় ছিল। এখন কি লইয়া নূতন নাটক লেখা যায়—গিরিশচন্দ্র এই মহাসমস্যায় পতিত হইলেন। ঐতিহাসিক নাটক পুলিশে পাশ হইবার পক্ষে অনেক বাধা। তবে ধর্মপ্রাণ ভারতে ধর্মের কখনই অনাদর হইবে না। এখানেও এক অন্তরায়—বাঙ্গালা ভক্তি-প্রধান দেশ—ভক্তিমূলক নাটকও অনেক রচিত হইয়াছে! ঐ বিষয়ের পুনরবতারণা—চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাত্র। গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, একবার জ্ঞানমার্গ ধরিয়া নাটক রচনা করিলে হয় না? কিন্তু বিষয় বড় নীরস। যে উন্মাদনা নাটকে প্রয়োজন, তাহা ভক্তিমার্গেই আছে—অদ্বৈতমার্গে নাই।

কিন্তু তথাপি বেদান্ত বিষয় অবলম্বন পূর্বক অদ্ভুত কৌশলে তাহাতে মানবীয় সহানুভূতি মিশাইয়া তিনি 'শঙ্করাচার্য' লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নাটক রচনা শেষ হইলে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দের কথায় তাঁহার সে দ্বিধা দূর হয়। নাটকের সম্পূর্ণ শিক্ষাদানও তিনি করিতে পারেন নাই, কারণ এই সময়ে তিনি পীড়াবশতঃ কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাধামাধব কর এবং পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য শিক্ষাদান-কার্য্য সমাপ্ত করেন, কেবলমাত্র দানিবাবু কাশীধামে গিয়া শঙ্করাচার্য্যের ভূমিকা পিতৃদেবের নিকট শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন।'

রাজবালা অভিনীত ১৯০৯ খ্রীঃ 'শঙ্করাচার্য্য' নাটকের প্রথম রাত্রির ভূমিকালিপি ছিল নিম্নরূপ ঃ

শঙ্করাচার্য—	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
শিশু-শঙ্কর (প্রথম অঙ্ক)	সরোজিনী (নেড়া)।
অমরকরাজ-দেহাশ্রিত শঙ্কর ও বৃদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিক	শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ।
মহাদেব ও উগ্রভৈরব	শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ব্রহ্মা ও গণপতি	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
গোবিন্দনাথ, ব্যাস ও মণ্ডন মিশ্র	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
সনন্দন	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।
শান্তিরাম	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
রামদাস	পান্নালাল সরকার।
সখারাম ও প্রথম পণ্ডিত	শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য।
জগন্নাথ	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
ঋষি, পুরোহিত ও সুধন্বা রাজার সেনাপতি	শ্রীপ্রমথনাথ পালিত।
বৃদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিক-শিষ্য	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসাক।
চণ্ডাল বালক	শ্রীমতী ননীবালা।
২য় পণ্ডিত	শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

অমরক রাজার মন্ত্রী	শ্রীহরিদাস দত্ত।
ঐ ব্রাহ্মণ	বিজয়কৃষ্ণ বসু।
শিউলী	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
মহামায়া	শ্রীমতী রাজবালা।
বিশিষ্টা	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী।
উভয় ভারতী ও কামকলা	শ্রীমতী চারুশীলা।
রমা ও অম্বালিকা	শ্রীমতী নলিনীসুন্দরী।
গঙ্গা ও যমজ-শিশুমাতা	শ্রীমতী সরযূবালা।
সরমা	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী।
কুমারী	সুবাসিনী।
শিউলিনী	শ্রীমতী তিনকড়ি (ছোট) ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।
নৃত্য শিক্ষক	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	ধর্মদাস সুর ও কালীচরণ দাস (সহকারী)।

রাজবালা অভিনীত পেশাদার মঞ্চের দ্বিতীয় জনপ্রিয় নাটক 'তপোবল'। গিরিশচন্দ্রের নাটক 'তপোবল' কাশীধামে থাকাকালে রচিত হলেও 'মিনার্ভা'র অবস্থা পরিবর্তন এবং তাঁর কঠিন পীড়াবশতঃ প্রায় দশ মাস পরে নাটকটি মিনার্ভাতে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম রজনীর (২রা অগ্রহায়ণ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯১১ খ্রীঃ) চরিত্রলিপি ছিল নিম্নরূপ :

বিশ্বামিত্র	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
বশিষ্ট	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য।
ব্রহ্মা ও বিশ্বামিত্রের সেনাপতি	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।
ব্রহ্মণ্যদেব	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
ইন্দ্র ও কল্মষপাদ	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
ধর্মরাজ	শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ।
অগ্নি ও ১ম ব্রাহ্মণ	ননীলাল দত্ত
শক্তি ও অম্বরীষের পুরোহিত	শ্রীঅহীন্দ্রনাথ দে।

ত্রিশঙ্কু	শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ।
অম্বরীষ ও বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
সদানন্দ	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
যুবরাজ	শ্রীখগেন্দ্রনাথ দে।
শুণঃশেফ	শ্রীমতী শশীমুখী।
পরাশর	পারুলবালা।
ব্রহ্মদূত ও অম্বরীষের ১ম দূত	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল।
২য় ব্রাহ্মণ ও বিশ্বামিত্রের সভাসদ	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসাক।
নগর-রক্ষক	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে।
ঘোষণাকারী ও অম্বরীষের ২য় দূত	শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
বেদমাতা	শ্রীমতী নরীসুন্দরী।
সুনেত্রা	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
অরুন্ধতী	শ্রীমতী প্রকাশমণি।
বদরী	তিনকড়ি দাসী।
অদৃশ্যন্তী	শ্রীমতী রাজবালা।
মেনকা	শ্রীমতী সরোজিনী (নেড়া)।
রম্ভা	শ্রীমতী চারুশীলা।
উর্বশী	শ্রীমতী তিনকড়ি (ছোট)।
ঘৃতাচী	প্রফুল্লবালা। ইত্যাদি।
স্বত্বাধিকারী	মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম. এ, বি. এল।
অধ্যক্ষ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
শিক্ষক	গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্রীকালীচরণ দাস।

"শঙ্করাচার্য্যের রিহারস্যালকালীন অভিনেতা ও অভিনেত্রীগন একপ্রকার

হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল এবং বিপুল অর্থব্যয়ে সাজ-সরঞ্জাম ও ধর্ম্মদাসবাবুকে দিয়া দৃশ্য পটাদি প্রস্তুত করিয়া স্বত্বাধিকারীও বিশেষরূপে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু অভিনয় দর্শনে সম্পূর্ণ নূতন রসের আস্বাদন পাইয়া যখন দর্শকগন ঘন-ঘন উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অভিনয়ান্তে উচ্চ জয়ধ্বনি করিয়া রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিলেন—তখন তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না।

'চৈতন্যলীলা'র ন্যায় শঙ্করাচার্য্য নাটকও নাট্যজগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। বেদান্ত প্রচারক নীরস শঙ্কর চরিত্র, গিরিশচন্দ্রের অমৃতময়ী রচনায় এরূপ সরস হইয়া উঠিয়াছিল, যে বঙ্গে আবালবৃদ্ধবণিতা 'শঙ্করাচার্য্য' দেখিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিল। এই নাটকের অভিনয় দর্শনে জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "গিরিশবাবু কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বেদান্তের সূক্ষ্ম মর্ম্ম জলের ন্যায় বুঝাইয়া দিলেন, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত তাহার আর সন্দেহ নাই।'...

নাটকের সকল চরিত্রই নূতন ছাঁচে ঢালা, তন্মধ্যে মহামায়া ও জগন্নাথের চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জগন্নাথ চরিত্র সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 'মায়িক ভালবাসায় যে মুক্তির অধিকারী হইতে পারে এ চরিত্র, গিরিশবাবু, তুমি মহাগুরুর কৃপায় চিত্রিত করেছ।"

'শঙ্করাচার্য্যের অভিনয় দর্শনে 'বেঙ্গলী'তে (১৯শে মার্চ ১৯১০ খ্রী) মন্তব্য :

Our Indian Garrick Girish Chandra, when still in the full vigour of youth, brought out his *Chaitanya Lila* and represented the life and teachings of chaitanya. But it was an easy task comparatively for Sri Gouranga creed of love is an itself a fascinating subject and treated by his masterly pen, it was destined to crown him with success. The creed of Shankaracharyya is the creed of knowledge, which is proverbially dry. A student of Hindu philosophy can hardly guess how Shankar's life and doctrine can form the subject-matter of a dramatic performance,

specially in these times when levity on the stage is the order of the day. But our Girish Chandra has performed an apparently impossible task by infusing into the dry loves of the subject, balmy liveliness which has made the drama quite agreeable to every variety of taste. The play, in short, is an all-round master-piece which adds a fresh laurel to the already-over-loaded brow of the dramatist etc."

রায়সাহেব স্বর্গীয় বিহারীলাল সরকার 'বঙ্গবাসী' তে লিখিয়াছিলেন, "যিনি জ্ঞানযোগী শঙ্করাচার্য্যের চরিত্রাবলম্বনে নাট্য-রচনা করিতে পারেন, আর সেই নাট্য-রচনার অভিনয়ে যিনি বঙ্গের লক্ষ-লক্ষ লোককে মুগ্ধোন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারেন, ধন্য তাঁহার লেখনী। জ্ঞান-যোগীর জ্ঞান-কথা সাধারণের কয়জন বুঝিতে পারে? কিন্তু গিরিশবাবু সে সব জ্ঞানকথার যেরূপ সহজ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। তাই শত সহস্র রজনী অভিনয়দর্শী চিত্রাপিতের ন্যায় বসিয়া অভিনয় সৌন্দর্য্যের সুখোপভোগ করিয়া থাকেন। যিনি এমন জ্ঞানী-চরিত্র এমন করিয়া ফুটাইতে পারেন, আর যিনি অভিনয়ে সে চরিত্রের পূর্ণবিকাশ করিতে পারেন তিনি, সমগ্র বঙ্গবাসীর ধন্যবাদ-পাত্র নহেন কি? ইতিহাসে শঙ্কর চরিত্রের বৈচিত্র্য কোথায়? কিন্তু গিরিশচন্দ্র নানা চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া, প্রাসঙ্গিকক্রমে নাট্যকাব্যের যেরূপ বৈচিত্র্যসাধন করিয়াছেন, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। ······নাটকে নব রস। শঙ্করাচার্য্যের মাতা বিশিষ্ঠার করুণ চিত্র মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কিত হইয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের কৃষক ভৃত্য জগন্নাথ—মমতার সাকার সৃষ্টি। মহামায়ার মহাচিত্রে নাট্য কাব্য সৌন্দর্য্যের পূর্ণোচ্ছাস।" ইত্যাদি

'তপোবল' নাটকের ইতিহাস বলতে গিয়ে অবিনাশচন্দ্র লিখেছিলেন, কলিকাতা, বহুবাজারের সম্ভ্রান্ত মতিলাল পরিবারের বংশধর এবং গিরিশ-চন্দ্রের পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল বহু পূর্বে গিরিশচন্দ্রকে 'বিশ্বামিত্র' নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। এই লইয়াই গিরিশচন্দ্রের

সহিত মতিলালের প্রথম পরিচয়। অবসর পাইলেই মতিলালবাবু তাঁহার অনুরোধ স্মরণ করাইয়া দিতেন। কাশীধামে অবস্থানকালীন সেই অনুরোধ কার্যে পরিণত হয়। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম লাইব্রেরী হইতে রামায়ন আনাইয়া তৎ-পাঠে গিরিশচন্দ্র 'তপোবল' লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই নাটকখানি গিরিশচন্দ্র শ্রীবিবেকানন্দের শ্রীচরণাশ্রিতা—গিরিশচন্দ্রের অশেষ স্নেহভাগিনী, পরলোকগতা সিষ্টার নিবেদিতাকে উৎসর্গিত। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল,

"পবিত্রা নিবেদিতা,

বৎসে। তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আমোদ করিতে। আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? কাল দার্জ্জিলিং যাইবার সময়, আমায় পীড়িত দেখিয়া স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে, 'আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।' আমি তো জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইস না? শুনিতে পাই মৃত্যুশয্যায় আমায় স্মরণ করিয়াছিলে, যদি দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর।

শ্রী গিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

এই নাটক দুটিতে রাজবালা প্রভূত পরিমানে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ফলে বিভিন্ন নাটকে এই সূত্রে অভিনয়ের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হত। ১৯২৪ খ্রীঃ 'রৈবতক' নাটকে নিয়মিত অভিনয়ের আসরে ফিরে আসার মধ্যবর্তী পর্বে রাজবালা নাটক ছাড়াও সঙ্গীত চর্চায় মন দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে কন্যা ইন্দুবালাও সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। প্রধানতঃ কন্যার অভিভাবিকা হিসেবে রাজবালাকে এই পর্য্যায়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যেতে হয়েছিল। ফলে নিয়মিত নাটকে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ থেকে রাজবালা দীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু প্রায় তেরো বছর পরে মডার্ণ থিয়েটার নাট্য সম্প্রদায়ের নাটক 'রৈবতক' এ অভিনয় করতে এসে তিনি পুনরায় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হন। পাশাপাশি সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমেও রাজবালা 'তপোবল' নাটকের পর বেশ উপার্জন করতেন বলে জানা যায়। অবশ্য জীবনের একেবারে গোড়ায় যখন রাজবালার বয়স মাত্র আট বছর তখন রামবাগানে মেয়েদের দুটি

পালাগানের দল ছিল। এরা সেকালে পালা বা যাত্রাভিনয় করতেন। যেমন একটিকে বলা হত 'কটা গোলাপীর দল,' দ্বিতীয়টির নাম 'রাজা হরির দল'। গোলাপী নামে জনৈকা মহিলা এবং হরিদাসী নামে আর একজন অভিনেত্রী ছিলেন যথাক্রমে এই দুই পালার পরিচালিকা। হরিদাসী 'রাজার' ভূমিকায় ভালো অভিনয় করতেন বলে লোকে তাঁর দলকে বলত 'রাজা হরির দল'। এঁরই দলে ১৮৯৩ খ্রীঃ রাজবালা ছয় বছর বয়সে 'গঙ্গা আনয়ন' পালায় 'ভগীরথের' ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তিনদিন ধরে এই পালাগানটি খণ্ড খণ্ড ভাবে পরিবেশিত হত। বেশ কয়েক বার এই দলে যাত্রা করার পর বোসেস সার্কাস দলের প্রচারিত বিজ্ঞাপন দেখে রাজবালা দাদা এবং ছোট বোনটিকে নিয়ে সেই সার্কাস দলে যোগ দেন।

জীবনের শুরুতে যাত্রার দলে অভিনয় করতে আসার ফলে অভিনয় শিক্ষার পর্বটি রাজবালার অতি কৈশোরেই শুরু হয়েছিল বলা চলে।

ইন্দুবালার তথ্যানুযায়ী রাজবালা যখন এর পরে সার্কাস দলে যোগ দেন তখন তাঁর পক্ষে শোম্যানশিপ ব্যাপারটি বেশ ভালো ভাবেই রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সেই সার্কাসের জীবন ছেড়ে আসার প্রায় দুই দশক পরে তাঁকে আবার অভিনয়ের জগতেই ফিরে আসতে হয়। এই শতাব্দীর গোড়ায় দ্বিতীয় দশকের সুরুতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে যে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল তার ত্রাণকার্য্যে এগিয়ে এসেছিলেন বাংলার আপামর জনসাধারণ। সমাজের সকল স্তরের মানুষ স্বেচ্ছায় সাহায্য ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। এমন কি এই ত্রাণের কাজে সেদিন কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলের নিষিদ্ধ পল্লী বলে চিহ্নিত অঞ্চলের মেয়েরাও স্বেচ্ছায় ও সোৎসাহে এই কাজে এগিয়ে আসেন। তাঁরা দল বেঁধে প্রকাশ্যে পথে নেমে পড়ে অর্থ ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করার ব্রত গ্রহণ করেন।

এ কাজে এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ত্রাণ সমিতি গঠিত হয়। এছাড়া, অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একাধিক থিয়েটার দল গঠন করা হয়েছিল বলে জানা যায়।

প্রধানতঃ রাজবালার নেতৃত্বে রামবাগানের (রূপোগাছি) মেয়েরা যে

'রামবাগান নারী সমিতি' ১৯২০ খৃঃ গড়ে তোলেন তার পক্ষ থেকে (১৯শে অক্টোবর ১৯২২) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হাতে (বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি, সায়েন্স কলেজ, ৯২ আপার সার্কুলার রোড) যে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

19. 10. 22. (Bill no 437)　　চাউল—১৸০

কাপড় নূতন—৩০

কাপড় পুরাতন—২৬৪

অন্যান্য জামা—৯০

র‍্যাপার—২

এ ছাড়া মোট সাত কিস্তিতে প্রায় ৯৯৬ খানা শাড়ি ২৯০ জামা ও অন্যান্য দ্রব্যও বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন পি, চ্যাটার্জী।

রামবাগান নারী সমিতির সঙ্গে ত্রাণকার্যে রাজবালার যুবতী মেয়ে ইন্দুবালাও মেতে উঠেছিলেন। সেকালে শিল্পীরা সংঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান—বেঙ্গল আর্টিষ্ট এসোশিয়েশন, ২৫নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন ক্যাল ২৩ এই ঠিকানায়। সম্পাদক ছিলেন জ্ঞান ঘোষ, পঙ্কজ মল্লিক ও মন্মথ মিত্র। ইন্দুবালা এই এসো-শিয়েশনের সভ্যা হিসেবে নানাভাবে সাহায্যের কাজে এগিয়ে যান।

রাজবালার রামবাগান 'নারী সমিতি' (২৬ যোগেন দত্ত লেন কলকাতা) আরও নানাবিধ সামাজিক ও সেবামূলক কাজে এগিয়ে এসেছিল। তাঁদের এই সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি মেলে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়। ২৬শে নভেম্বর ১৯২২ খ্রীঃ 'যুগান্তর' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনে এর উল্লেখ আছে। সে সময় রামবাগান নারী সমিতি যে ত্রাণকার্যে কিভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তার প্রমাণ এই বিজ্ঞাপনটি। বিজ্ঞাপনে লেখা হয় :—

উত্তর বঙ্গের

বন্যা প্রপীড়িত সাহায্যের জন্য

রামবাগান নারী সমিতি কর্তৃক

সূত্র : বসুমতী ২১শে অক্টোবর ১৯২২

সহঃ-সম্পাদক—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কাঙ্গালিনী থিয়েটার

স্টার রঙ্গমঞ্চ

অদ্য সোমবার ৪ঠা অগ্রহায়ন ২৬শে নভেম্বর

রাত্রি ৮টায়

১। **নরমেধ যজ্ঞ**

সমস্ত চরিত্রই নারীগন কর্ত্তৃক

অভিনীত হইবে

২। ***ভিক্ষা ও দান***

৩। ***নির্ব্বাচিত নৃত্যগীত***

৪। ***রেশমী রুমাল***

প্রবেশ মূল্য—বক্স (৪ জন) ৩০ টাকা, বক্স (২ জনের) ১৬ টাকা, ড্রেস সার্কেল ৮ টাকা, অকচেষ্ট্রা ৬ টাকা, ষ্টল ৩ টাকা, পিট ১ টাকা গ্যালারী ॥০ আনা ফ্যামিলী বক্স (৪ জনের) ৩০ টাকা, জেনানা ২ টাকা, পূর্বাহ্নে ২২নং দয়াল লেনে টিকিট প্রাপ্তব্য। সাধ্যমত টি বি সি ক্রয় করিয়া বিপন্ন ভ্রাতা-ভগ্নিগণের সাহায্য করুন এই অনুরোধ।

নারী সমিতির এই কার্যের রিপোর্টও একই সঙ্গে ঐ সময় ২৭শে নভেম্বর '২২ 'যুগান্তর' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। তাতে জানা যায়—

উত্তর-বঙ্গের বন্যা

বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর রিপোর্ট

রামবাগান নারী সমিতি যে আন্তরিকতা দেখাইয়া বন্যা সাহায্য কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন তজ্জন্য কমিটি তাহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। গতকল্যও তাহারা ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় লব্ধ ১৭০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অভিনয়ের জন্য যে ৪১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী একাই স্বয়ং দান করিয়াছেন।

লক্ষনীয়, এই সময় ইন্দুবালার বয়স মাত্র তেইশ বছর। কিন্তু সঙ্গীতের

ক্ষেত্রে সেই সময় তাঁর প্রতিষ্ঠা রীতিমত ঈর্ষাযোগ্য।

নারী সমিতি দীর্ঘকাল ধরেই এই জাতীয় সেবা এবং ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করে এসেছেন। এমন কি দেশ স্বাধীন হবার পরও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারীর 'যুগান্তর' পত্রিকায় এদের যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদিক কলেজ ও হাসপাতাল, যক্ষা হাসপাতাল, পাতিপুকুর-এর জন্যে প্রেরিত সাহায্যের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তা থেকে জানা যায়,

হাসপাতালে দান

গত ২৬শে মাঘ যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ হাসপাতালের জন্য নারী সমিতির কলিকাতায় সাহায্যাভিনয় হইয়াছিল তাহা হইতে উক্ত সমিতির সেক্রেটারী শ্রীমতী ইন্দুবালা হাসপাতালের অন্যতম সদস্য ও উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত শুভকরণ জালানের মারফত দুই হাজার পাঁচশত এক টাকা পাঠাইয়াছেন। —যুগান্তর, মঙ্গলবার ৩রা চৈত্র ১৩৫৪

ইতিপূর্বে সর্বপ্রথম বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে সে সময় (১৯২০ খ্রীঃ) সোনাগাছিতেই 'ভিখারিনা থিয়েটার' খোলা হয়। সোনাগাছিতে প্রতিষ্ঠিত এই থিয়েটারে প্রথমে 'রিজিয়া' নাটকটি অভিনয় ও পরিবেশনের মাধ্যমে বন্যাত্রাণের কাজে সাহায্যের প্রথম সূচনা হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ের পর 'রিজিয়া' নাটকের নামডাক হবার ফলে নাটকটির আরও দু-তিন রজনী অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। 'রিজিয়া' নাটকে অভিনয় শুরু হবার আগে অর্থাৎ ড্রপ সিন ওঠার আগে সেকালের বিখ্যাত বাঈজী শ্বেতাঙ্গিনী ও হীরা বাঈজী নৃত্য প্রদর্শন করতেন। সেকালে এই নৃত্য দর্শকদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ফলে দর্শকদের অনুরোধে অনেক সময় বেশ কয়েকটি নৃত্যের প্রদর্শন এই সব বিখ্যাত নর্তকীদের করতে হত।

সোনাগাছির মেয়েদের এই জাতীয় সেবামূলক কাজে উৎসাহী হয়ে প্রতিবেশী রামবাগানের মেয়েরাও (সেকালে এই রামবাগানের নাম ছিল রূপোগাছি) সেবার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। সোনাগাছির অনুকরণে নারী সমিতির অধীনে এরাও 'কাঙ্গালিনী থিয়েটার' নামে একটি নতুন থিয়েটারের দল খুললেন। প্রধানতঃ বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যেই এই

থিয়েটার দলটি পাড়ায় বেশ কয়েকটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। সমাজ-সেবামূলক এই কার্যে নিযুক্ত কাঙ্গালিনী থিয়েটারের নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীমতী রাজবালা দাসী। এরই সূত্র ধরে অনতিকাল পরে 'রামবাগান নারী সমিতি' নামে সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন স্বয়ং রাজবালা। কাঙ্গালিনী থিয়েটার পরিচালনার ব্যাপারে রাজবালা প্রথম থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কাঙ্গালিনী থিয়েটারের প্রথম নাট্যো-পহার 'নরমেধ যজ্ঞ'। এই নাটকে রাজবালা 'যযাতি'র ভূমিকায় অভিনয় করতেন। সোনাগাছির মেয়েরা যেমন দল বেঁধে লাল পাড়ওয়ালা শাদা শাড়ী পরে বেরোতেন, তেমনি এই নাটকের মেয়েরাও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দল বেঁধে গেরুয়া রঙের শাড়ী (লাল পাড়যুক্ত) পরে পাড়ায় প্রদক্ষিণ করতেন।

কাঙ্গালিনী থিয়েটারের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে রাজবালা কিছুকাল পরেই রামবাগানে নিজে উদ্যোগী হয়ে 'দি রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটার নামে' আর একটি নতুন থিয়েটারের দল খোলেন। ১৯২২ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত এই 'দ্য রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটার' ইন্দুবালার ভাষায় 'দিঃ রামবাগান ফিমেল কালী থিয়াটার' এবং 'আমার প্রতিষ্ঠান'। এই থিয়েটার থেকেই রাজবালার একমাত্র কন্যা ইন্দুবালার অভিনয় জীবনের সূচনা হয়। সেকালে এই রামবাগান ফিমেল থিয়েটারটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বস্তুতঃ বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রেও এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা, এই রামবাগান থিয়েটারই একমাত্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এবং সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা অভিনীত প্রথম পাবলিক বা পেশাদারী থিয়েটার। এছাড়া এই থিয়েটারেই একমাত্র, বাংলা নাট্য জগতের মা ও মেয়ে একই সঙ্গে একাধিক নাটকে পরপর একটানা অভিনয় চালিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯২২ খ্রীঃ রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটার নিবেদিত প্রথম নাটকের নাম 'বিল্বমঙ্গল' ও 'হীরের ফুল'। প্রসঙ্গতঃ এই থিয়েটার খোলার পেছনে রাজবালাকে পরোক্ষভাবে যিনি নানাদিক থেকে সাহায্য করেছিলেন তিনি হলেন এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক দানীবাবুর প্রিয় শিষ্য যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

থিয়েটারের কাজকর্মের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের যোগাযোগ ছিল। এছাড়া পরিচালক না হলেও এই থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নামই বিজ্ঞাপিত হত। কেননা, সেকালে রামবাগান অঞ্চলের বিশেষ পেশায় নিযুক্তা মেয়েদের নাম প্রকাশ্যে পরিচালক হিসেবে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ঝুঁকি ছিল। এবং এর ফলে প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে উদ্যোক্তারা কৌশলে যোগীন্দ্র-নাথের নামটিই গোড়া থেকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এঁদের অনুরোধে যোগীন্দ্রনাথও তার নামটি এভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কখনো আপত্তি করেননি। অবশ্য প্রয়োজন বোধে যোগীন্দ্রনাথ অনেক সময় মহলা বা নির্দেশনার ব্যাপারে সাহায্যও করতেন।

'বিল্বমঙ্গল' ও 'হীরের ফুল' সর্বপ্রথম মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয়। থিয়েটারে দর্শনীর হার ছিল যথাক্রমে দশটাকা, আট টাকা, ছয় টাকা, পাঁচ টাকা, দুই টাকা ও একটাকা। একটাকার টিকিটে ব্যালকনিতে কেবলমাত্র মেয়েদেরই বসার ব্যবস্থা করা হত। ফলে একটাকার টিকিটে দোতলায় পুরুষদের বসার ক্ষেত্রে কোন প্রবেশাধিকার থাকত না।

রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটারে মোট বারোটি নাটকের অভিনয় হয়েছিল। এই বারোটি নাটকের নাম যথাক্রমে ১। বিল্বমঙ্গল ২। হীরের ফুল ৩। খাস দখল ৪। নরমেধ যজ্ঞ ৫। বরুণা ৬। পলিন ৭। হীরেমালিনী ৮। কুঞ্জদরদী ৯। আলিবাবা ১০। রেশমী রুমাল ১১। পরদেশী ১২। চন্দ্রগুপ্ত।

এই নাটকগুলির প্রত্যেকটিতেই রাজবালার কন্যা ইন্দুবালা অভিনয় ও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই থিয়েটার চালু হবার সময় তাঁর বয়স ছিল তেইশ। এই সব নাটকে যেসব চরিত্রে ইন্দুবালা তখন অভিনয় করেছিলেন সেগুলি হল—পাগলিনী (বিল্ব মঙ্গল), রতি (হীরের ফুল), গিরিবালা (খাসদখল), কাত্যায়নী (নরমেধ যজ্ঞ), বরুণা (বরুণা), পলিন (পলিন), মালিনী (হীরেমালিনী), হাকিমের স্ত্রী ও করিম (কুঞ্জদরদী), সাকিনা (আলিবাবা), রামলোচন (রেশমী রুমাল), শাকিয়া (পরদেশী), ছায়া (চন্দ্রগুপ্ত)। এর মধ্যে বিল্বমঙ্গল, নরমেধযজ্ঞ, বরুণা, পলিন, খাসদখল, এবং

আলিবাবা নাটকে ইন্দুবালা মা রাজবালার সঙ্গে একত্রে অভিনয় করেন। যেমন—বিল্বমঙ্গলে ইন্দুবালা—পাগলিনী / রাজবালা—বিল্বমঙ্গল, নরমেধ যজ্ঞে ইন্দুবালা—কাত্যায়নী / রাজবালা—রাজা যযাতি, খাসদখলে ইন্দুবালা—গিরিবালা / রাজবালা—মোহিত, বরুণায় ইন্দুবালা—বরুণা / রাজবালা—পুণ্ডরীক, পলিনে ইন্দুবালা—পলিন / রাজবালা—হাসান, আলিবাবাতে ইন্দুবালা—সাকিনা / রাজবালা—আলিবাবা।

এছাড়া 'হীরেমালিনী' নাটকেও রাজবালা অনেক সময় প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করতেন।

অন্যদিকে, ইন্দুবালাও 'খাসদখল' নাটকে গিরিবালার ভূমিকা ছাড়াও অনেক সময় মুচিরাম, নিতাই ও মনোমোহন মাইতির ভূমিকায় অবতীর্ণা হতেন।

রাজবালা প্রতিষ্ঠিত এই থিয়েটারের অর্থ যোগান দিয়েছিলেন সেকালের বিখ্যাত ব্যবসায়ী বদ্রীদাস ছেত্রী। এছাড়া জীবনকৃষ্ণ ঘোষও এই থিয়েটারকে নানাভাবে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এর ফলে প্রায় বছর দুই এই থিয়েটারটি চালু থাকে। কলকাতায় বেশ কিছুকাল এই থিয়েটারের সাফল্যের ফলে কলকাতার আশেপাশে এবং বাইরে নানা জায়গা থেকে এই থিয়েটারের আমন্ত্রণ আসতে থাকে। সুনাম বৃদ্ধি হবার ফলে এই থিয়েটারের ব্যস্ততাও রীতিমত বেড়ে যায়। কিন্তু অকস্মাৎ খড়গপুরে আমন্ত্রিত অভিনয় প্রদর্শনে গিয়ে রাজবালার ফিমেল কালী থিয়েটার বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে যায়। ফলে কর্তৃপক্ষকে বিরাট আর্থিক ক্ষতি বরণ করতে হয়। এমন কি এই লোকসানের দায় দায়িত্ব মেটাতে গিয়ে থিয়েটার প্রায় উঠে যাবার মুখে এসে পড়ে। বাধ্য হয়েই বদ্রীবাবু তখন থিয়েটারের সমস্ত লোকসানের অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এর কিছুকাল পরেই ঐতিহাসিক এই 'দি রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটার'টি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

এই থিয়েটারের আয়ুষ্কাল মাত্র দুই বছরে..। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই যে, বদ্রীদাস কেবলমাত্র যে এই থিয়েটারের ব্যবসায়িক দিকটিই দেখাশোনা করতেন তাই নয়। এই থিয়েটারের সাফল্যের মূলেও তাঁর ভূমিকা

অবশ্যই স্মরণযোগ্য। কেননা, সেকালে এই জাতীয় মেয়েদের নিয়ে সর্বপ্রথমে পেশাদারী দল খোলার পেছনে নিঃসন্দেহে নানাধরনের অনেক ঝুঁকি ছিল। বিশেষতঃ কেবলমাত্র রামবাগান অঞ্চলের বিশেষ পেশার মহিলাদের দ্বারা অভিনীত নাটকে সকল শ্রেণীর দর্শকের আনুকূল্য দীর্ঘকাল লাভ করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু অবাঙালী এই ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় আপন অর্থের বিনিময়ে কোন কিছুর প্রত্যাশা না করেই সেই ঝুঁকি নিতে এগিয়ে এসেছিলেন। বছর দুই ধরে এই থিয়েটারটি যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার মূলে এই বদ্রীদাসের অবদান নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।

এই থিয়েটার উঠে যাবার পর ১৯২৪ সনে রাজবালা মডার্ণ থিয়েটার নাট্য সম্প্রদায় পরিচালিত নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' নাটকে (প্রথম অভিনয় ২০শে আগষ্ট ১৯২৪) সুলোচনার ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট সুনামের অধিকারিনী হন। এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে অভিনীত এই নাটকের চরিত্রলিপি ছিল নিম্নরূপ:

> অর্জুন—রবীন্দ্রনাথ বসু, বাসকী—লক্ষ্মীনারায়ন মিত্র, শ্রীকৃষ্ণ—প্রভাসচন্দ্র ঘোষ, দুর্বাসা—শরবিন্দু ঘোষ, সুভদ্রা—পান্নারানী, শৈলজা—তারাসুন্দরী, সুলোচনা—রাজবালা, সত্যভামা—সত্যবালা!

এরপর ১৯৩৫ খ্রীঃ বিখ্যাত প্রযোজক বজরঙ্গলাল খেমকাজীর অনুরোধে রাজবালা প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে আসেন।

১৯৩৫ খ্রীঃ চলচ্চিত্রে খেমকাজীর একটি ছবিতে তিনি অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ছবিটির নাম 'রাতকানা'। বাংলা ও হিন্দী দুটি ভাষাতেই তোলা ছবির দু'ভার্সানেই রাজবালা একই চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন। এই ছবির মহলার কথা ঘোষণা করতে গিয়ে সেকালের 'খেয়ালী' পত্রিকার সংবাদদাতা ২৬শে আষাঢ় ১৩৪২ সংখ্যায় লিখেছিলেন—'শ্রীযতীন দাশের "রাতকানা"র মহলা জোরভাবে চলছে। চিত্রামোদীদের কাছে এই দাবি সম্পর্কে আমরা একটা মজার খবর জানাচ্ছি। খবরটি হচ্ছে শ্রীমতী ইন্দুবালার মা এই ছবিতে একটি ভূমিকায় অভিনয় করবার

জন্য মনোনীতা হ'য়েছেন। দেখা যাক, এবার মা হারে কী মেয়ে হারে!'

'রাতকানা' ছবির ভূমিকালিপি প্রকাশিত হয়েছিল সেকালের 'দীপালী' পত্রিকায়। দীপালী পত্রিকায় (৮ই আগস্ট ১৯৩৫) প্রকাশিত সংবাদ:

রাতকানা (বাংলা ও হিন্দীতে Double Version)
গল্প—রায় শ্রীনির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর
প্রযোজক—শ্রীযুক্ত বি, এল, খেমকা
আলোকচিত্র ও পরিচালনা—শ্রীযতীন দাস
উদ্বোধন—রূপবাণী, ৩রা আগষ্ট
শ্রেষ্ঠাংশে—শ্রীরঞ্জিত রায়, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়,
সুহাস সরকার, দুনিয়াবালা, ইন্দুবালার মাতা,
নগেন্দ্রবালা প্রভৃতি।

ছাবটি মুক্তিলাভের পর এই পত্রিকায় আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়—'নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়ার রাতকানা অভিনীত হ'য়েছে। প্রধান ভূমিকায় রঞ্জিত রায় সু-অভিনয় করেছেন। কিন্তু ১৩৪২ সালের পক্ষে ওর রসিকতা মোটা ও অচল এবং 'শালা' কথাটার ওতে বিরক্তিকর আধিক্য আছে। তবু, 'রাতকানা' মোটের ওপর লোকে উপভোগ ক'রবে। দুনিয়াবালা, সুহাস সরকার, নগেন্দ্রবালা, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, রাজুবালা সকলেরই অভিনয় ভালো হ'য়েছে। বিদ্রোহী আর রাতকানা এই দুটিরই শব্দগ্রহণ ভালো হয়নি, ক্ষোভের বিষয় খুব। বিরামকালে নিমন্ত্রিতদের জলযোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়েছে, এই মিষ্টি খবরটি অবশ্য প্রকাশ্য।'

পাশাপাশি, সেকালের 'আজকাল' পত্রিকা রাজবালা সম্পর্কে লিখেছিলেন—'কালো বৌ-এর ভূমিকায় ইন্দুবালার মাতা ভাল' (আজকাল, শনিবার ২৫শে শ্রাবণ ১৩৪২ সাল)।*

'স্বদেশ' পত্রিকার মতে,...'বিভিন্ন ভূমিকায় দুনিয়াবালা, ইন্দুবালার মাতা, নগেন্দ্রবালা, সুহাস সরকার সু-অভিনয় করেছেন।

জনপ্রিয় 'সোনার বাংলা' পত্রিকার মন্তব্য:...'অন্যান্য ভূমিকায় নগেন্দ্রবালা, রাজুবালা, কেষ্ট মুখার্জী সু-অভিনয় করেছেন।

* হিন্দীতে 'রাতকানা' ছবিতে কালো বৌ-এর চরিত্রে তাঁকে অত্যন্ত কালো মেকআপ করিয়ে অভিনয় করানো হয়েছিল।

ইন্দুবালার তথ্যানুযায়ী রাজবালা মূলতঃ প্রযোজক খেমকার অনুরোধেই এই ছবিতে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। খেমকাজী ছিলেন দীর্ঘকাল এই মতিলাল —রাজবালা পরিবারের সুপরিচিত হিতৈষী ও বন্ধু।

লক্ষনীয়, সেকালে রাজবালাকে অনেক পত্র-পত্রিকায় 'রাজুবালা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও রাজবালার ডাক নাম ছিল রাজু। কিন্তু ইন্দুবালার মতে, রাজুবালা বলে বিজ্ঞাপনে ও পত্র-পত্রিকায় তাঁর নাম ব্যবহার করা একান্তই অনবধনতাজনিত ত্রুটি। এমন কি যেহেতু ইন্দুবালার খ্যাতি তখনই ভারতব্যাপী সেই কারণেই অনেকে আবার রাজবালা নামটি না লিখে 'ইন্দুবালার মাতা' বলে উল্লেখ করতেন। এরা অবশ্য প্রধানতঃ ব্যবসায়িক লোভের কারণে জ্ঞাতসারেই এমনটি করেছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইন্দুবালার জীবিতাবস্থায়ই সম্প্রতি শ্রীবিদ্যুৎ বন্দ্যো-পাধ্যায় তাঁর 'ভুলি কেমনে, আজও যে মনে' শীর্ষক রচনায় (যুগান্তর সাময়িকী, রবিবার ২৭ জুন ১৯৮২) রাজবালা নামটিকে 'ছায়াবালা' বলেই উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে প্রতিবাদ পত্র পাঠানোর পরও তা সংশোধন বা এ ব্যাপারে ত্রুটি স্বীকার করা হয়নি। অথচ এটি তথ্যগত দিক থেকেও গুরুতর ত্রুটি।

যাইহোক 'রাতকানা' ছবির সাফল্য সত্ত্বেও রাজবালা কিন্তু তারপর আর কোন ছবিতে অভিনয় করেন নি।

'রাতকানা' ছবি মুক্তি পাবার পরেও শ্রীমতী রাজবালা অবশ্য প্রায় সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। নটী বিনোদিনীর মত তিনিও জীবনের শেষ পর্বে দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেই নিজের সংসারের কাজকর্ম ও পূজা-র্চনা নিয়ে সময় কাটিয়ে গেছেন। অবশ্য এই সময় প্রধানতঃ একমাত্র কন্যা ইন্দুবালার অভিভাবিকা হিসেবে তিনি মেয়ের সঙ্গে অসংখ্যবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে গানের আসরে উপস্থিত থেকেছেন। কলকাতায়ই তাঁর জন্ম, ফলে সুদীর্ঘ জীবনও তাঁর কেটেছে এই কলকাতা শহরের রামবাগান অঞ্চলে। পরিবারের শুভার্থী জীবনকৃষ্ণ ঘোষের মৃত্যুর (৬ই ফাল্গুন ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) পর অবশ্য রাজবালা মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েন। কেননা, ইন্দুবালার আদরের এই 'কাকা' দীর্ঘকাল রাজবালার পরিবারের সুখে-দুঃখে

নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। ফলে জীবনকৃষ্ণের মৃত্যুর প্রায় বছর ছয়েক পরে স্মৃতির ভারে জর্জরিতা রাজবালা বিরাশী বছর বয়সে ২৭শে ভাদ্র ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে কলকাতার রামবাগানে ২১নং যোগেন দত্ত লেনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একমাত্র কন্যা ইন্দুবালার বয়স তখন প্রায় উনসত্তর।

বলা বাহুল্য, উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে জন্মগ্রহণের পর মাত্র আট-নয় বছর বয়সে যিনি ছিলেন বাঙালীর বিখ্যাত **Great Bengal Circus** এর বিস্ময়-বালিকা এবং পরবর্তী কালে যিনি ছিলেন বাংলার ফিমেল থিয়েটারের অন্যতম প্রাণ প্রতিষ্ঠাত্রী, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই দুই শতাব্দীর নাট্যজগতের শেষ যোগসূত্রটিও যেন ছিন্ন হয়ে গেল। বস্তুতঃ রাজবালাই ছিলেন বিনোদিনী দেবীর পর দুই শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ভাবধারার মিলনের অবশিষ্ট এবং সম্ভবতঃ শেষতম সেতু।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দুবালার জীবন ও সঙ্গীত

ইন্দুবালার জন্ম তারিখ ১৯শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩০৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ। জন্মেছিলেন তিনি পাঞ্জাবের অমৃতসরে। তখন ইন্দুবালার বাবা মতিলাল বসু এবং তাঁর বারো বছরের স্ত্রী মা রাজবালা সার্কাসের দলের সঙ্গে পাঞ্জাবে গিয়েছিলেন খেলা দেখাতে।

নিজের জন্ম কাহিনী বলতে গিয়ে একবার ইন্দুবালা বলেছিলেন, 'আমার জন্মের কাহিনী একটু বিচিত্র। গর্ভবাসের মাত্র ছ'মাস উনিশ দিনের মাথায় আমি ভূমিষ্ঠ হই। আমি যখন মায়ের পেটে তখন মায়ের ভয়ানক আমাশা হয়। উত্তরোত্তর কষ্ট বাড়তে থাকে। অমৃতসরে তখন কলকাতারই এক মহিলা ডাক্তার ছিলেন। ডাঃ বিধুমুখী বসু। তাঁকেই ডেকে আনলেন। মাকে দেখে উনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এবং উনিই প্রথম আঁচ করলেন প্রসবের সময় অনেক আগেই এসে যেতে পারে। হলও তাই। সাড়ে ছ'মাস যেতে না যেতেই মার পেট থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। দুর্ভাগ্য আমার। অসময়ে জন্মে ম'ার কাছে ঠাঁই পেলাম না। ডাক্তারের কথামতো অমৃতসরের হাসপাতাল থেকে আনা এক বিশেষ ধরনের বাক্সে আমায় বন্দী করে রাখা হ'ল। ঐ বাক্সের ভেতরে শুইয়ে রেখেই আমায় একটু একটু করে ওষুধ খাওয়ানো হত। ভয়ানক দাম ছিল সেই ওষুধের। শুনেছি রোজ প্রায় দশ টাকা করে লাগত। আশ্চর্যের বিষয়, মাতৃগর্ভ ছাড়ার পর আমি নাকি একেবারে কাঁদিনি। প্রথম কাঁদলাম দেড় মাস পর। আর সেই কান্না শুনে ডাক্তার বসু আশ্বস্ত হলেন। আমায় কোলে করে মা'র কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, "এই নে রাজী, তোর মেয়ে নে।" হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, আমার মায়ের নাম ছিল রাজবালা।

না জেনে-শুনে মা কিন্তু সাংঘাতিক একটা ভুল করে বসেছিলেন, সারাটা জীবন যার খেসারত আমায় দিতে হয়েছে। আমার জন্মাবার কিছু পরেই মা জোর করে আমার বোঁজা চোখের পাতা খুলে দেন। ফলে আমার ডান

চোখের দৃষ্টি চিরকাল একটু বাঁকা থেকেই গেল। তবে কী, এ নিয়ে মা'র বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই। যদিও মা নিজেকে সর্বদাই অপরাধী মনে করতেন।'

জন্মের পর থেকেই ইন্দুবালার জীবনে কয়েকটি ঘটনা গভীর ভাবে তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করতে থাকে। প্রথমতঃ বাঁকা চোখের ফলে রাজবালা এই কন্যার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বভাবতঃই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়তঃ জন্মাবার পর বছর তিনেক বাদে অর্থাৎ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের পর রাজবালা ও মতিলালের জীবনে নিদারুণ সঙ্কট নেমে আসে। অর্থাৎ, অকস্মাৎ ইন্দুবালার মা রাজবালা ও পিতা মতিলালের পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিড় ধরে।

জীবনের প্রথম তিন বছর ইন্দুবালার সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব ও দেখাশোনার কাজ অবশ্য মতিলালই যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। মতিলাল তাঁর একমাত্র কন্যা ইন্দুবালাকে যথেষ্ট ভালও বাসতেন। কিন্তু মতিলাল প্রথমতঃ সারা বছর সার্কাসের দল নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। দ্বিতীয়তঃ কলকাতায় ফিরে গোড়ার দিকে রাজবালার কাছে এলেও ক্রমশঃ তিনি নাকি তাঁর পৈত্রিক নিবাস হাতিবাগানের কাছে ভালুক বাগানের বাড়িতেই এসে উঠতেন। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রথমে মান-অভিমান এবং বিরোধ ও অবশেষে এই সব কারণেই পরস্পরের মধ্যে পরিণতিতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে ইন্দুবালার নিজের বক্তব্য হল,—আমার যদি কিছু অভিমান থাকে তো সে আমার বাবাকে নিয়ে। আমার যখন তিন বছর বয়স তখন আমার মা'র সঙ্গে বাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কারণটা সঠিক আমার জানা নেই। তবে যতটুকু জানি, তাতে মনে হয় মা সার্কাসের খেলা দেখিয়ে দেখিয়ে আর দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে চাইছিলেন না। স্বামী, কন্যা নিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। অথচ বাবার ইচ্ছেটা ঠিক উল্টোমুখে ঘুরছিল। দুজনে যখন কিছুতেই একমত হতে পারলেন না তখন আলাদা হওয়া ভিন্ন উপায়ও ছিল না।

কিন্তু এরই ফলে শিশু ইন্দুবালার জীবনে অনিশ্চয়তা এবং দুর্যোগ ঘনিয়ে আসাই স্বাভাবিক। কেননা, রুজি-রোজগার বিহীন রাজবালা তখন নিঃস্ব,

অসহায় এবং মানসিক ভাবে রিক্ত। অথচ কন্যা ইন্দুবালাকে মানুষ করে তোলার দায়দায়িত্ব সবই রাজবালার ওপরে। ইন্দুবালার স্মৃতি অনুযায়ী,—বাবা চলে যেতে মা একেবারে অসহায় হয়ে পড়লেন। নিজেরই কেউ ছিলনা, তার ওপর আবার আমার জ্বালা। তবু সাহসে বুক বাঁধলেন। জীবনের কঠিন যুদ্ধে নিজেকে এবং আমাকে বাঁচাতে যে-পথ বেছে নিলেন সে হয়তো খুব সুখকর ছিল না, সম্মানেরও নয়। তবু সেই যুগে যখন মেয়েদের মাথা তোলার প্রায় কোন উঁচু রাস্তাই ছিলনা তখন মা'র অসহায় অবস্থার কথা কেউ যদি স্মরণ করেন, তাহলে অনায়াসেই তিনি ক্ষমা করে নিতে পারবেন। তিন বছরের শিশুকে নিয়ে মা উঠলেন কলকাতার রামবাগান অঞ্চলে। তখন তার নাম ছিল রূপোগাছি।

মনে হয়, বাবা মতিলাল যে ছোট্ট শিশকন্যা ইন্দুকে ছেড়ে থাকতে পারবেন একথা রাজবালা বিশ্বাসই করতে পারেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মতিলাল অন্ততঃ ওই পিতৃমুখী কন্যার টানেই আবার ফিরে আসবেন। রাজবালাও নিজে দেখতে শুনতে বেশ ভালোই ছিলেন। ইন্দুবালার মতে, 'মার পাশে দাঁড়াতে অবশ্য আমার লজ্জা করত। মা ছিলেন রূপসী।' ইন্দুবালার মুখের আদলে বাবা মতিলালেরই ছাপ ছিল। যাই হোক ইন্দুবালাকে বাবা যে খুবই ভালবাসতেন তাতে কোন সন্দেহই ছিলনা। বরং ইন্দুবালাকে খুব ছোট্ট বয়সে কোলে নিয়ে আদর করে তিনি গানও শোনাতেন। একটু বড় হবার পর যখন ইন্দুবালাকে মামা তিনকড়ি দাস মতিলাল বসুর কাছে নিয়ে যেতেন তখনও তাঁকে আদর করে সুর করে গান গাইতেন। বলতেন—হারানিধি ইন্দু আমার একবার আয় করি কোলে··· । সেই সময় অর্থাৎ যখন তাঁর পাঁচ-ছ বছর বয়স তখনই বাবার কাছে প্রথমে একটি গান মুখে মুখে পুরোপুরি শিখেছিলেন। সেটি ছিল ব্রহ্ম সঙ্গীত। তবে কার লেখা তা এখন আর ইন্দুবালার মনে নেই। শুধু মনে আছে বাবা বলতেন, ওটি ব্রহ্ম সঙ্গীত। মনে পড়ে জীবনে প্রথম বাবার মুখে মুখে শেখা সেই গান'—

নাদ ব্রহ্ম জীবন্ত প্রমাণ
গান রূপী হরি হরিরূপী গান ॥

গান ডোরে বাঁধা ব্রহ্মাণ্ড মহান
গান জড়-জীব উদ্ভিদ প্রাণ
মৃন্ময়ী প্রকৃতি হরির গানে
রচনায় গান ছড়ায় প্রাণে
গম্ভীর গান ওঁ মহারবে
কোটি কোটি বিশ্ব হয় নির্মাণ ॥
কোথা স্বর্গ কেহ জানিত কি তারে
যদি না আসিত গানেরই টানে
বাধা থাকিত হৃদি মাঝারে
গানে জ্ঞান পাই গানে প্রাণ পাই
গানেরই আনন্দ গানে মিশে যায়
গানেরই ভিতরে প্রাণের ভিতরে
জ্ঞানময় হরি হরির জ্ঞানে ॥

এদিকে রামবাগানে এসে রাজবালা কিন্তু গানের পুরানো অভ্যাসটি ঝালিয়ে নেবার চেষ্টায় প্রয়াসী হলেন। পেট চালানোর কাজে গানই তখন হয়ে উঠল তাঁর অন্যতম সহায়। একদা স্বয়ং মতিলাল স্ত্রী রাজবালাকে নিজে ধ্রুপদ শিখিয়েছিলেন বেশ কিছুকাল। পরবর্তীকালে অবশ্য রাজবালা নিজেই বাড়িতে ওস্তাদ রেখেই গান শিখতেন। তার সঙ্গে ধ্রুপদ গানে সঙ্গতে সেকালে সাহায্য করতেন তখনকার বিখ্যাত পাখোয়াজ শিল্পী ওস্তাদ দুলী ভট্টাচার্য। রাজবালার আমলে অন্যতম গাইয়ে ছিলেন গিরিবালা। রাজবালাও সঙ্গীতে সুনামের দিক থেকে গিরিবালার মতই সেকালে সুপরিচিত ছিলেন।

ফলে মায়ের কাছেই কন্যা ইন্দুবালার সঙ্গীতের হাতেখড়ি হয়। এছাড়া আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পিতা মতিলালও জীবনের প্রারম্ভে ইন্দুবালার সঙ্গীত জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইন্দুবালার অভিমত : বাবা যদিও মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে গেছলেন, তবু একেবারে সম্পর্ক তুলে দেননি। মাঝে মাঝে আসতেন রামবাগানের বাড়ীতে। আর আমার জন্যে নিয়মিত টাকা পাঠাতে ভুলতেন না। কলকাতায় বাবা এলে

মামা আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতেন। আমাকে দেখলেই ছড়া করে বাবা যা বলতেন তা এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। সুর করে করে তিনি বলতেনঃ 'হারানিধি ইন্দু আমার একবার আয় করি কোলে / তাপিত হৃদয় জুড়াও আমার শ্রীমুখে একবার বাবা বলে।'...আমিও গান গাইতাম বাবার কোলে উঠে। আমার প্রিয়কাকা বলতেন, "দাদা, ইন্দু, দেখো, গাইয়ে হবে।' বাবা অবশ্য বিশ্বাস করতেন না।

রাজবালা কিন্তু প্রথম থেকেই ইন্দুবালার সঙ্গীত শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্ন নিয়েছিলেন। মতিলাল রাজবালাকে ছেড়ে যাওয়ার পর এই পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন* মতিলালের মামাতো ভাই জীবনকৃষ্ণ ঘোষ, যিনি ইন্দুবালাকেও অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনিও সঙ্গীত অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁরই উৎসাহে বাড়িতে নিয়মিত সঙ্গীতের আসর বা মজলিস বসত। সেকালের খ্যাতনামা প্রায় সকল শিল্পীই সেই আসরে প্রায় তখন নিয়মিত আসতেন। ইন্দুবালার প্রারম্ভিক শিল্পী জীবনের পরিবেশটি ছিল তাই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বস্তুতঃ সে সময় ইন্দুবালার গানবাজনা সবে সুরু। ঐ সময় আসরে মা রাজবালার গান শুনে শিশু ইন্দুবালা আপন মনে গুনগুন করেই গাইতেন। ইন্দুবালার বক্তব্য ছিল, মার গান শুনতে শুনতে আমিও আপন মনে গুনগুন করতাম। কখনও বা চলে যেতাম বাড়ীর পাশের শিবমন্দিরে। অনভ্যস্ত গলায় মন্দিরের চাতালে বসে এটা-সেটা গাইতাম। লোকে কিন্তু বাহবা দিত। এমন কি, কোন কোন অতি উৎসাহী মা'র কাছে এসে আমাকে গান শেখাবার পরামর্শও দিয়ে যেতেন। তবে মা তেমন কান দিতেন না। আমায় লেখাপড়া শেখাবার দিকেই ঝোঁক ছিল তাঁর বেশি: কারণ আমার বাবার ইচ্ছে ছিল, আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে ডাক্তার করার। আমায় গান শেখাবার কথা বলতেই তাই মা বলতেন, "মতিবাবুর যা ইচ্ছে তাই হবে।"

অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাই হল। রাজবালা অতি স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর কথা ভাবলেন। ইন্দুবালার জন্যে রাজবালা বইপত্তর কিনে দিলেন। অনেক বইপত্তর নিয়ে ইন্দুবালার পড়াশুনা শুরু হল।

---

*জীবনকৃষ্ণ ঘোষের দুটি বিবাহ। প্রথম পক্ষের তিনটি সন্তান এবং দ্বিতীয় পক্ষের তিনটি ছেলেমেয়ে ছিল।

রাজবালা মেয়ের জন্যে গৃহশিক্ষকও রাখলেন। ইন্দুবালার বয়স তখন পাঁচ অর্থাৎ ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথমে বাড়িতে থেকেই লেখাপড়া আরম্ভ করলেন ইন্দুবালা।

পড়াশোনায় অবশ্য তিনি গোড়া থেকেই বেশ মনোযোগী ছিলেন। ফলে বাড়িতে লেখাপড়া কিছুটা আয়ত্ব হবার পরই রাজবালা তাঁকে স্থানীয় দর্জিপাড়ার বীণাপাণি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। স্কুলজীবনে মায়ের কথামত মন দিয়ে পড়াশোনা করার সুবাদে স্কুলের ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় ইন্দুবালা বেশ ভালো রেজাল্ট করেছিলেন। এমনকি স্কুলে ভর্তি হবার পর একবার তিনি ডবল প্রমোশনও পান। পরিবারের সবাই সেজন্যে খুব খুশী। পড়াশোনায় ভালো মেয়ে হিসেবে তখন থেকেই ইন্দুবালা সকলেরই খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

এই সময় থেকেই তাঁর নানারকম সখ বা 'হবি' জন্মাতে থাকে। যেমন, ইন্দুবালার ছবি জমানোর তখন থেকে খুব ঝোঁক ছিল। খবরের কাগজের বা অন্য পত্র-পত্রিকায় যেখানেই ভালো বা পছন্দমত ছবি পেতেন তখনই সেগুলোকে কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে সংগ্রহ করতেন। তাঁর অসংখ্য ছবির মধ্যে ছিল বিভিন্ন মন্দিরের ছবি, বিলেতের রাজা-রাণীর ছবি, নানা দেশের টাকার অসংখ্য প্রতিকৃতি*। এই সঙ্গে ছিল একটু-আধটু ছবি আঁকার নেশা। যদিও নিজের আঁকা ছবিগুলো কখনোই তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে স্থান পায়নি।

এইভাবেই বেশ কাটছিল ইন্দুবালার কৈশোরী জীবন। কিন্তু ইন্দুবালার যখন এগারো বছর বয়স তখন হঠাৎ রাজবালা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থা রাজবালার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন মান্না কোম্পানীর ডাক্তার বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়†। আর রাজবালাকে সর্বক্ষণ সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব ছিল ইন্দুবালার ওপর।

---

* ইন্দুবালার পরবর্তীকালে সখ ছিল বিভিন্ন দেশের পয়সা বা মুদ্রা সংগ্রহ, খেলনা সংগ্রহ, রূপো, তামা, পেতল, লোহা, মাটি, পাথর ও কাচের তৈরী সৌখীন জিনিষ (মোট ২২টি বড় আলমারী ভর্তি), ছবি সংগ্রহ, মদের বোতলের ছাপওয়ালা নানা ধরনের ছিপি ও টাকার Specimen সংগ্রহ করা।

† H. D. Manna'র স্থানীয় ঔষধালয়ের ডাক্তার বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় L. M. S.

ইন্দুবালার জীবনেও তখন একমাত্র আশ্রয় রাজবালা। ফলে লেখা পড়া ছেড়ে দিতেই তিনি বাধ্য হলেন।[১] এইভাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে লেখাপড়া শিক্ষারও সেইখানেই ইতি হল। কিন্তু অন্যদিকে তাঁর সেবাপরায়নতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন ডাক্তার বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়। ওষুধপত্র দেবার বিধান তিনি যেমনটি দিতেন ইন্দুবালা তা যথেষ্ট নৈপুন্যের সঙ্গে পালন করতেন দেখে তিনি নিজেই রুগী সেরে ওঠার পর স্বেচ্ছায় ইন্দুবালার মাকে পরামর্শ দিলেন —ওকে তুমি নার্সিং এর কাজে লাগিয়ে দাও, দেখবে ও একদিন তাতে খুব উন্নতি করতে পারবে এদিকে লেখাপড়া বন্ধ করতে বাধ্য হওয়ায় রাজবালাও আর এই প্রস্তাবে তেমন আর আপত্তি করতে চাইলেন না। সুতরাং বিনোদ বাবুর পরামর্শ মতই রাজবালার অনুমতি নিয়ে একদিন বিনোদবাবুর হাত ধরেই ইন্দুবালা সেকালের পটলডাঙার হাসপাতালে অর্থাৎ বর্তমান মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাসপাতালে এসে নার্সিং এর কাজে ভর্তী হতে এলেন। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেই এগারো বছরের কিশোরীকে নার্সিং এর ট্রেনিং দিতে আপত্তি জানান এবং ইন্দুবালাকে দু-বছর পরে আবার যেতে পরামর্শ দেন। ফলে বাধ্য হয়ে দু-বছর ফের অপেক্ষা করতে হল। কথামত দু-বছর পরেই আবার ইন্দুবালা মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাসপাতালে এলেন নার্সিং ট্রেনিং' এ ভর্তী হতে। সেটা ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ। এবার খবর পেয়ে পিতা স্বয়ং মতিলাল বসুও মেয়ের সমর্থনে এলেন। মেয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় নতুন জুতো, সুটকেশ, কম্বল, কাপড় চোপড় সহ অন্যান্য জিনিষ পত্র কিনে দিয়ে গেলেন পিতা স্বয়ং মতিলাল। ইন্দুবালাও নার্সিং এর ট্রেনিং নেওয়া শুরু করলেন। তখন তাঁদের থাকতে দেওয়া হত হাসপাতালের লাগোয়া একটি হস্টেলে। মাস খানেক ট্রেনিং নেবার পরই হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটল হাসপাতালে। একটি সঙ্কটাপন্ন রোগীকে রাত জেগে দেখা-শোনার ভার পড়ল ইন্দুবালা এবং তাঁর আর এক নার্স সঙ্গীর ওপর। তাঁরা রাত জেগে পাহারা ও সেবা শুশ্রূষা করা সত্ত্বেও অবশেষে সেই রোগীটি গভীর রাতে মারা যান। মরা আগলে থাকতে তখন দুজনেরই খুব ভয়। অবশেষে সঙ্গী নার্স ইন্দুবালাকেই সেই মৃতদেহের পাশে একা বসিয়ে রেখে

---

১ ইন্দুবালা ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

কর্তৃপক্ষকে খবর দিতে চলে গেলেন। নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে তের বছরের ইন্দুবালা টিম টিম করা আলোর সামনে একা সেই মৃত দেহটিকে পাহারা দিচ্ছিলেন। তাঁর বুক ভয়ে দুরু দুরু। এদিকে সঙ্গীরও আর ফেরার নাম নেই। হঠাৎ কোথাও কোনো আওয়াজ হলেই বুক যেন হিম হয়ে আসে ইন্দুবালার। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কাউকে আর না দেখতে পেয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে করেই হোক, এই পরিবেশ থেকে তাঁকে সরে যেতেই হবে। ঠিক করলেন হাসপাতাল ছেড়েই পালিয়ে যাবেন। বাইরে এসে দেখলেন দারোয়ান গেটে বসে কড়া পাহারা দিচ্ছে। তার চোখ এড়িয়ে পালানো অসম্ভব। সদর দরজাটিও তখন বন্ধ। কোনমতে অনেকবার চেষ্টা করে দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে অবশেষে গোলদিঘীর দিকের ফটকে এসে লক্ষ্য করলেন লোহার গেটের নীচে কিছুটা ফাঁক রয়েছে। রোগা চেহারাটিকে তার নীচ দিয়ে গলিয়ে ইন্দুবালা একা বড় রাস্তায় উঠে এলেন। তখন তাঁর ভূতের ভয় হতে লাগল। তবু বাধ্য হয়ে নার্সের পোষাক পরা অবস্থায়ই দৌড়তে দৌড়তে হেদুয়া পর্যন্ত এলেন তিনি। কোনক্রমে খুঁজে খুঁজে অবশেষে মাসীর বাড়িটি খুঁজে বের করে সেখানে গিয়েই কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে এই অবস্থায় তাঁকে দেখে সকলেই অবাক। ইন্দুবালা জানিয়েছেন,—অত রাত্রিরে অমন অদ্ভুত চেহারায় আমায় দেখে মাসীর তো চক্ষুস্থির। যাই হোক, ঘরে এনে বসালেন, আদ্যোপান্ত সব বললাম তাঁকে। বলে খানিকটা হালকা হলাম বটে, তবে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবার জো ছিল কি! কারণ জানতাম আমার পালিয়ে আসায় মা দারুণ ক্ষেপে যাবেন। আমার আশঙ্কা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ পেলাম পরদিনই। মাসীর মুখে খবর পেয়ে কাকাকে নিয়ে মা হাজির হলেন। আমায় এই মারেন তো সেই মারেন। কাকা বুঝিয়ে-সুজিয়ে তখনকার মত শান্ত করলেন তাঁকে। রাগে গরগর করতে করতে আমায় বাড়ি নিয়ে গেলেন মা। ঠাণ্ডা মাথায় অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। মানুষের সেবা করা যে কত কল্যাণের তা নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ দিলেন। কিন্তু বৃথা। মড়ার ভয় আমাকে এমন পেয়ে বসেছিল যে আর হাসপাতাল-মুখো হবার বিন্দুমাত্র সাধ ছিল না। আমায় নিয়ে মা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কপালে যে আমার অশেষ দুর্গতি সে-

কথা বার বার শোনাতে লাগলেন। শেষে কাকা মাকে নিরস্ত করলেন। বললেন, "ইন্দুর ব্যবস্থা আমিই করবো। তোমার অত চিন্তা করার দরকার নেই।" আমায় বললেন, "কী রে গান শিখবি?" আমার তখন নিজের ওপর ভরসা ছিল না। বললাম, "পারব কি! তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

এর পর থেকেই শুরু হল ইন্দুবালার জীবনের আশ্চর্য সমৃদ্ধ এক সঙ্গীত জীবনের ঘটনাবহুল অধ্যায়।

*   *   *

শুভার্থী কাকা জীবনকৃষ্ণের উৎসাহে রাজবালার ঘরে গানের আসরে ঢুকে প্রথম দিকে কাকার বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধেই শ্রোতাদের সামনে গান শুনিয়ে ছিলেন ইন্দুবালা। বলতে গেলে তখন ওই জীবনকৃষ্ণ ঘোষই ছিলেন রাজবালার পরিবারের একমাত্র অভিভাবক। তাঁর ঘরে যে সব আমন্ত্রিত অতিথিরা আসতেন তাঁরাও ছিলেন মূলতঃ সমাজের সেকালের অন্যতম সঙ্গীত রসিকের দল। তাঁরা কিন্তু সেদিন তরুণী ইন্দুবালার গলার গান শুনে তাঁকে উৎসাহই দিয়েছিলেন। যদিও, সেদিন ইন্দুবালা যে দু-একটি গান আসরে পরিবেশন করেছিলেন সেগুলি কারো কাছ থেকে শেখা নয়। বরং এখানে ওখানে শুনে শুনে যে ক'টি গান আপন খেয়ালে শিখেছিলেন, এগুলি ছিল সেই সংগ্রহ থেকেই আহরিত। সেদিন ঐ গানই সকলের ভাল লাগাতে কাকা জীবনকৃষ্ণ উৎসাহী হয়ে ইন্দুবালাকে সঙ্গে সঙ্গে গান শেখানোর ব্যবস্থা করলেন। সকলের পরামর্শে ইন্দুবালার পাকাপাকি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তখন থেকেই গান শেখার পালা স্নুরু হল। রাজবালার বাড়িতে

'আর একজন সকালে এসে বসেছিলেন পণ্ডিত গৌরী শংকর মিশ্র, কলকাতার ও বেনারসের প্রসিদ্ধ সারেঙ্গীবাদক। এঁরা বিখ্যাত তবলা বাদক কণ্ঠে মিশ্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; কণ্ঠে মিশ্রের পুত্র চামু মিশ্রকে গৌরীশংকর বোধহয় দত্তক নিয়েছিলেন ও সারেঙ্গীতে নিপুণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। চামু রেডিয়োতে বাজাত, কিন্তু তার অকালমৃত্যুতে এই ঘরানার উত্তরসূরী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে মনে হবে। মিশ্রজী দেখতে খুব সুপুরুষ ছিলেন, সকালে গঙ্গাস্নান সেরে, পূজা-আহ্নিক সমাপন করে সৌম্য মূর্তি শুচিস্নিগ্ধ রূপে আমাদের সামনে বসেছিলেন, তাঁর সমগ্র দেহ-পরিবেশ থেকে যেন একটা পবিত্রতার আভা ফুটে বেরোচ্ছিল। তাঁর গল্প বলবার ভঙ্গীও যেন বড় মধুর ছিল। তিনি একজন বিখ্যাত গুণীর সংস্পর্শ অল্পকালের জন্যই পেয়েছিলেন তার ইতিহাস আমাদের কাছে বিবৃত করছিলেন।' (স্মরণ-বেদনার বরণে আঁকা—সুরেশ চক্রবর্তী, দেশ বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৭ পৃঃ ৮৩-৮৭)

তখনকার গানের আসরে আসতেন ওস্তাদ লছমী মিশ্র। তাঁরই ভাই শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্করজীর কাছে প্রথম গানের চর্চা শুরু করলেন কিশোরী ইন্দুবালা। বয়স তখন মাত্র তেরো অর্থাৎ ১৯১২ খৃষ্টাব্দ।

সেকালে এই গৌরীশংকর মিশ্রজী ছিলেন সঙ্গীত জগতের অন্যতম এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। গৌরীশংকরের পারিবারিক পরিচয় ছিল নিম্নরূপ :
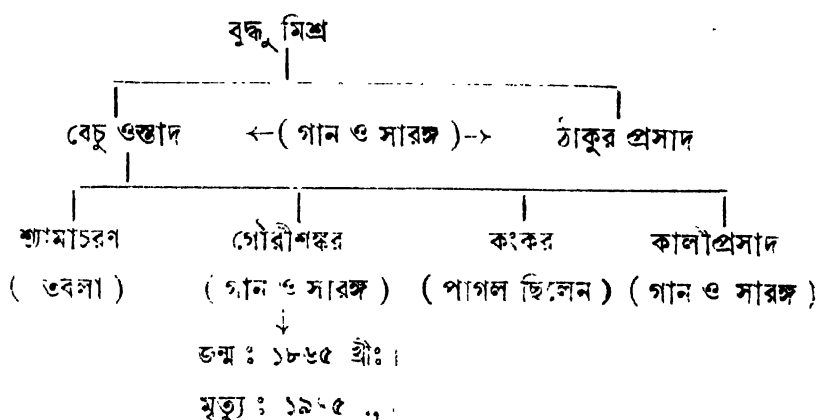
গৌরীশঙ্কর ও কালীপ্রসাদ দুই ভাই একত্রে বাস করতেন জোড়াসাঁকোর ১৫৮ বলরাম দে স্ট্রীটে। এই বাড়িতেই এঁরা প্রায় পঞ্চাশ বছর একটানা বসবাস করেছিলেন।

গৌরীশঙ্কর মিশ্রের উল্লেখযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছিলেন শ্বেতাঙ্গিনী কৃষ্ণভামিনী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, অনাথনাথ বসু ও স্বয়ং ইন্দুবালা। গৌরীশংকরের দুই প্রিয় সারেঙ্গীর নাম ছন্নুলাল মিশ্র ও চামু মিশ্র। ছন্নুলাল আসলে ছিলেন তাঁর শ্যালক-পুত্র। শিক্ষাগ্রহণের সময় ছন্নুলাল সারঙ্গ ও গান দুটোই শিখেছিলেন গৌরীশঙ্করের কাছে। মধ্যবয়স পর্যন্ত ছন্নু ছিলেন প্রধানতঃ সারঙ্গ-বাদক। কিন্তু পরিণত বয়সে গানকেই প্রধানতঃ বৃত্তি হিসেবে ছন্নুলাল গ্রহণ করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি সঙ্গীত জগতে গায়করূপেও উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ ছন্নুলাল

পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর মিশ্রের সারেঙ্গীর একটি রেকড।

Instrumental Seryangi—Pandit Gouri Sankar Misra (দাদরা) Hindusthan Record no. (HSC 250) H48.

এখনও জীবিত এবং গৌরীশংকর ঘরানার অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে বর্তমান।

অন্য দিকে, চামু মিশ্র হলেন গৌরীশঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র। গৌরীশঙ্করের কোন সন্তানাদি না থাকায় তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র চামুকে নিজের হাতে ছোটবেলা থেকে গড়ে তুলেছিলেন। ফলে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে তরুণ বয়সেই প্রতিভাবান সারঙ্গবাদক হিসেবে চামু মিশ্র অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কিন্তু মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে এই তরুণ প্রতিভার জীবনাবসান হয় (১৯৪৩ খ্রীঃ)।

গৌরীশঙ্কর ছিলেন মূলতঃ কাশীর প্রাচীন সারঙ্গ ধারার যোগ্য উত্তর-সাধক। বলতে গেলে তিনিই ছিলেন সেখানকার বিশাল কত্থক সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। একদা কবীর-চৌরা, সেনাপুরা, রামপুরা প্রভৃতি এলাকায় এই কত্থক সম্প্রদায়ের খুব পরিচিতি ছিল। এরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আত্মীয় সূত্রে সম্পর্কিত। এঁদের পদবী ছিল মিশ্র। *

---

*"যন্ত্র আর কণ্ঠ সঙ্গীতের নানা বিভাগে তাঁরা বিশেষজ্ঞ হন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে প্রভাবিত করেন নিজেদের সাধনায়। তাঁদেরই কোন কোন শাখা স্থায়ী করেন কলকাতায়। বাংলার রাগসঙ্গীত চর্চার শ্রীবৃদ্ধি করেন। যেমন, নানারীতির গান আর বীণাদি যন্ত্র-সঙ্গীতে রামকুমার, লছমী ওস্তাদ, শিউ সহায়। সহায় তেমনি বিবিধ কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে রাম সেবক, পশুপতি সেবক, শিব সেবক। তবলায় মৌলবী রাম, নান্নু সহায় প্রভৃতি। তেমনি এক সারঙ্গ-বাদক গায়ক-ধারায় কত্থক-বংশীয় গৌরী শঙ্কর মিশ্র। ...সে সময় গহরের দুদিকে দুই সারঙ্গীকে দেখা যেত। গৌরীশঙ্কর আর পাটনার এমদাদ খাঁ। তাদের মধ্যে বাইজীর ডানদিকে বসতেন গৌরীশঙ্কর আর বাঁয়ে এমদাদ খাঁ। সেকালের রেওয়াজ অনুযায়ী দক্ষিণের সারঙ্গ-বাদকের মর্যাদা ছিল বেশী। দুজনের মধ্যে তিনিই অধিকতর গুণী বলে গণ্য হতেন। তখন গহরজানের প্রধান সারঙ্গী হয়ে যেতেন গৌরী শঙ্কর। পাটনা কাশী এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ রামপুর দিল্লী পাতিয়ালা বোম্বাই ব্যাঙ্গালোর হায়দারাবাদ প্রভৃতি সর্বত্র ...

সম্রাট পঞ্চম জর্জের দরবার হোতো দিল্লীতে (১৯১১ সালে, সেখানেও গহরজানের সঙ্গে গৌরীশঙ্কর সারঙ্গ বাজালেন।

এমনি ছিলেন ওস্তাদজী। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই প্রথম সারির কলাকার। আর গহরজানের ডানদিকের সারঙ্গী এই পরিচয় যথেষ্ট ছিল সেকালে।...

গৌরীশঙ্করের সঙ্গীত জীবনে চিরদিন সহযোগী ছিলেন কালীপ্রসাদ। দুজনে অনেক সময় একই ছাত্রীকে শিখিয়েছিলেন। যেমন কৃষ্ণ ভামিনী এবং ইন্দুবালাকে। আসরে সারঙ্গ বাজিয়েছেন একই বাইজীর দুদিকে বসে। যেমন শ্বেতাঙ্গিনী, কিরণময়ী সুরমা কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে। দুই সহোদর অর্ধশতাব্দী একই বাড়িতে বাস করেছেন। জোড়াসাঁকোর ১৫৮ বলরাম দে স্ট্রীটে।...

গৌরীশঙ্করের পিতা বেচু ওস্তাদের ছাত্রী ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ গায়িকা রূপসী স্বয়ং গহরজান। ওস্তাদ গৌরীশঙ্করজী প্রথমে নেপালের রাজার দরবারে নিযুক্ত হন। কিন্তু সেখানে কিছুকাল থাকার পর তিনি আবার কলকাতায় চলে আসেন। ছোট ভাই কালীপ্রসাদ মিশ্রও ছিলেন তাঁরই শিষ্য এবং পরবর্তীকালে তিনিও কলকাতার সঙ্গীত মহলে 'কালী ওস্তাদ' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

মূলতঃ সেকালের নাম করা প্রায় সব বাইজীরাই ওস্তাদ গৌরীশঙ্করের কাছেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। প্রধানতঃ তিনি শেখাতেন খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, দাদরা, টপখেয়াল, হোরি, চৈতী, কাজরী, লাওনী ইত্যাদি।

ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর সম্পর্কে ইন্দুবালা জানিয়েছেন,—'আমাদের বাড়িতে লছমী মিশ্র আসতেন। তাঁরই উদ্যোগে তাঁর ভাই শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্করজী, শুধু যে বড় ওস্তাদ ছিলেন তাই নয়, মেজাজেও ছিলেন বড় কড়া। অসামান্যা গহরজানের সঙ্গে সারেঙ্গী বাজাতেন। সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়াতেন। অত বড় গুণী-যিনি, তিনি কি আমার মত সামান্য বালিকাকে এককথায় গান শেখাতে রাজী হন? আমার মা'র আমন্ত্রণে এলেন বটে, আমার গানও শুনলেন, শেখাতেও রাজী হলেন; কিন্তু আশ্চর্য, এক শর্তে। মাকে বলতেন, "আমি তোমার মেয়েকে শেখাতে পারি, কিন্তু তোমায় আমার পৈতে ছুঁয়ে শপথ করতে হবে যে, আমি না বলা পর্যন্ত তোমার মেয়েকে সা রে গা মা সাধতে হবে, অন্য কোন কিছু রেওয়াজ করার চেষ্টা যেন না করে।" মা শপথ করলেন।

'কাশীতে টপ্পা গানের ঐতিহ্য যেমন সমৃদ্ধ তেমনি এই মিশ্র ঘরেও। কাশীর একেক কলাবৎ টপ্পা রীতির বিশেষজ্ঞ। যেমন ছোটে রামদাস। এই ঘরেরই শিষ্য তিনি। গৌরীশঙ্করের কাকা ঠাকুরপ্রসাদের শিক্ষা পান ছোটে রামদাস।

গৌরীশঙ্করও টপ্পা প্রবীন। তাঁর শিক্ষাতেই টপ্পা, টপ খেয়ালে অমন কলাবতী গায়িকা হন কৃষ্ণভামিনী।

টপ্পার কি ঐশ্বর্য সে মিশ্রজী যন্ত্রে দেখাতেন। যেমন তাঁর গিটকারি জমজমার অলঙ্করণের উপকার, তেমনি টপ্পা অঙ্গে তাঁর রাগের পরিবেশনা। তাঁদের ঘরানাই হল টপ্পা রীতিতে বিশেষজ্ঞ। তাই তিনি টপ্পার চালে এত বিচিত্র রাগও বাজাতেন। টপ্পা গানে কটি লঘু রাগই শোনা যায় সচরাচর। কিন্তু গৌরীশঙ্করের একক আসরে এমন অনেক রাগ বাজত যা অনেকের গান বাজনায় পাওয়া যেত না। ছাত্রছাত্রীদের তিনি দিয়েছেনও সেসব। যেমন পূরিয়া, সোহিনী, ভীমপলশ্রী, নটমল্লার, মালকোষ সাহানা, মূলতান ইত্যাদি।'

...(ভারতের সঙ্গীত গুণী, দ্বিতীয় খণ্ড—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৬৪—৭৬) প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৮৩।

গুরুজীর মাইনে ধার্য হল মাসিক পঁচিশ টাকা। তারপর দিন দেখে নাড়া বাঁধা হ'ল। মিশ্রজী আমায় সা রে গা মা'র কয়েকটি রকমফের শিখিয়ে সেই যে চলে গেলেন আর পাত্তাই নেই। আমি তো অবিরত সাধতে সাধতে সা রে গা মা প্রায় জল করে ফেললাম। কিন্তু গুরুজীর ভাই শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিশ্র মাইনে নিতে আসতেন। তখন আমায় বিদ্যের পরীক্ষা দিতে হত। একঘেয়ে একই জিনিষ গাইতে গাইতে আমার প্রায় কান্না পেয়ে যেত। ঠাকুরমাকে কেঁদে কেঁদে বলতাম, "কবে আমি প্রাণখুলে গান গাইতে পারবো।" আমার পাশের বাড়ীতেই গান শিখত আমারই বন্ধু রাজলক্ষী। পরে সিনেমা থিয়েটার করে বড় রাজলক্ষী নামে তার পরিচয় হয়। সে যখন গান শিখত আমি পাশ থেকে অনায়াসেই সেটা গলায় তুলে নিতাম। লুকিয়ে চুরিয়ে সে-সব গান একটু-আধটু যে না গেয়েছি তা নয়। তবে গলা খুলে গাইবার জো ছিলনা। কারণ বাধা ছিল গুরুর কাছে মা'র প্রতিজ্ঞা। এমনিভাবে কান্নায়, দুঃখে, হতাশায়, অভিমানে মাসখানেক কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন গুরুজী এসে হাজির।

গুরুজী এসেছিলেন নিজের বাড়িতে জন্মাষ্টমীর উৎসবের আয়োজন করতে। জন্মাষ্টমীর দিন বিরাট গানের আসর বসত সেখানে। নানান জ্ঞানী-গুণীর ভিড় হতো সেখানে ....

গুরুজী এসেই সা-রে-গা-মা'র পাঠ নিলেন। যা শিখিয়ে গিয়েছিলেন সব শোনালাম। শুনে ভারী খুশী। ভাই কালীজীকে ডেকে বললেন, "ইন্দুকে এবার রাগ দাও"। 'বাংসুরী মোরী মোরা জিনা ছুঁয়ো'। ইমনের এই গান দিয়ে শুরু হল আমার প্রথম গানের তালিম। এর সঙ্গে একটা ঠুমরী ও গজলও ছিল। গলায় তখন সুর এমন বসে গেছে যে গান তিন খানা তড়িঘড়ি শিখে নিতে একটু অসুবিধে হলনা। এদিকে জন্মাষ্টমীর সেই উৎসব এসে গেল। আমিও নেমন্তন্ন পেলাম। তবে শুধুই শোনবার জন্যে। উৎসবে হাজির হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

একসঙ্গে অত জ্ঞানীগুণীর ভিড় তো আগে কখনও দেখিনি। একের পর এক গান শুনতে লাগলাম। আর মন আমার ভরে উঠতে লাগল। কিন্তু ভেতর ভেতর অভিমান হল। কারণ, বড় ওস্তাদদের পাশে পাশে অনেক সাধারণ

গাইয়ে-বাজিয়েও অল্প সল্প সুযোগ পেয়েছিল। আমি তাঁদের অনেকের থেকে ভাল গাই। তবু আমায় একবার কেউ ডাকল না। মনের ভেতরটা কান্নায় ভিজে গেল। বাড়ি ফিরে মাকে অভিমানের কথা বললাম। কথা শুনে মা-ও দুঃখ পেলেন। পরদিন ওস্তাদজীকে ডেকে সব বললেন। চুপ করে শুনলেন গুরুজী। শেষে যা বললেন তা আমার আজও মনে আছে। আর ভুলবও না কোনদিন। বলেছিলেন, "ইন্দুর রূপ নেই। অল্প শিখে সে যদি পাঁচজনের সামনে এসে দাঁড়াতে চায় তো অপমানিত হবে। রূপ অনেক অভাব ঢাকতে পারে। কিন্তু যে শুধু গুণের জোরে আদর পেতে চায় তাকে তেমন গুণী হতে হবে"। নিজের পোড়া রূপের কথা যখনই ভেবেছি, তখনই গুরুজীর সেই কঠিন সাবধান-বাণী মনে পড়েছে, তবে যতই জ্বালাকর হোক না কেন, গুরুর কথায় আমার গান শেখার উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল। কালীজীর তদারকিতে গান শেখা চলতে লাগল। আশাবরী, ভৈরবী—একটার পর একটা রাগ শিখে যেতে লাগলাম। এক বছর ধরে অনেক কিছুই শিখলাম। দেখতে দেখতে আবার সেই জন্মাষ্টমীর দিন এল। আবার সেই গানের আসর। এবারও গেলাম তবে কোন প্রত্যাশা নিয়ে নয়।

গান চলছে। বাজনা চলছে। আমি এক কোনে বসে চুপচাপ শুনে যাচ্ছি। হঠাৎ কালী ওস্তাদজী এসে আমায় চুপি চুপি জিগ্যেস করলেন, 'গাইবে?' আমি তো প্রথমটায় বুঝতেই পারিনি। পরে যখন বুঝলাম তখন মনে হল বুঝি ঠাট্টা করছেন। কিন্তু ওস্তাদজী যখন আবার জিজ্ঞাসা করলেন তখন আর ঠাট্টা বলে মনে হল না। রাজী হয়ে গেলাম। যদিও গৌরীজী মোটেই আমায় গাইতে দিতে চাইছিলেন না। যা'হোক, ভাগ্য আমার সহায় ছিল। দুই ভাই-ই শেষ পর্যন্ত একমত হলেন। গাইবার সুযোগ তো পেলাম কিন্তু গাইব কী? চারপাশে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা কেউ হেঁজিপেজি নন। বড় বড় সব ওস্তাদ। গহরজান, আগ্রাওয়ালী মালকা, চুলবুল্লেওয়ালীমালকা নূরজাহান, বেনজীর, লখনউওয়ালী বচুয়াবাঈ, মন্নুয়াবাঈ, বেনারসওয়ালী, বড়ীমৈনা, হুশোনা, জানকীবাঈ, মৈজুদ্দিন, কেরামত উল্লা খাঁ, যাদুমনি, কিরণবাঈ, সরমাবাঈ, শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণ ভামিনী কত আর নাম করব।

ভয়ে ভয়ে ইমনের খেয়াল শুরু করলাম গান শেষ হতে শুধু যে বাহবাই

তা নয়, অনেকে মিলে আরও গাইতে অনুরোধ করলেন। গাইলাম ঠুংরী। ঠুংরী শেষ করে ওঠার উদ্যোগ করছি, গহরজানের আদেশে থেকে যেতে হল। তিনি আরও গান শোনাবার ফরমায়েশ করলেন। শুনে আর সে যে কী অভাবনীয় আনন্দ, তা কথা দিয়ে বলার নয়। আমার মত অতি সামান্য মেয়ের কাছে গান শুনতে চাইছেন কে, না গহরজান, যাঁর গানের একটি কলি শোনার জন্যে সারা ভারতবর্ষ আকুল হয়ে থাকত। ভয়ে, আনন্দে আরও দুখানা গান পর পর গাইলাম। গান শেষ হতে মঞ্চ থেকে নেমে গহরজানকে প্রণাম করলাম। উনি আমায় কাছে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমার 'আওয়াজের' তারিফ করলেন। এমন কি আমাকে পরদিন তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে ওস্তাদজীকে হুকুম দিলেন। সেই রাতটা আনন্দেই কাটল। কিন্তু একটু খুঁত রয়ে গেল। মঞ্চে রসিক শ্রোতাদের সামনে যথোচিত আদপ-কায়দা জানাতে পারিনি বলে গুরুজীর কাছে ধমক খেতে হল। আমার হয়ে উনি নিজেই সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। আমি যেন মরমে মরে গেলাম। শুধু পরদিন গহরজানের কাছে যাব ভেবে এত আহ্লাদ হতে লাগল যে, সংকোচের কথা নিমেষেই ভুলে গেলাম।

এই অনুষ্ঠানেই গহরজানের (১৮৭৩—১৯২৯) সঙ্গে ইন্দুবালার পরিচয়ের ফলে তাঁর সঙ্গীত জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ নতুন খাতে প্রবাহিত হল। জীবনের প্রথম ওস্তাদ গৌরীশঙ্করজীর কাছে শিক্ষা-দানের পর্ব শেষ করার আগেই তিনি গহরজানের সান্নিধ্যে এলেন। গৌরীশঙ্কর মিশ্র যিনি ঐ গহরজানেরই প্রধান সারেঙ্গী তিনি ব্যাপারটিকে ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। তবে ওস্তাদজীর ভাই কালীপ্রসাদ মিশ্র কিন্তু এর ফলে ইন্দুবালার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ইন্দুবালা গুরুজী কালীপ্রসাদ মিশ্রের সঙ্গেই গিয়ে গহরজানের কাছে হাজির হলেন। প্রথম দিনের সেই স্মৃতিটি ইন্দুবালার মনে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'গুরুর সঙ্গে ঠিক সময় গহরজানের কাছে হাজির হলাম। যেতেই গহরজান আমায় নাড়া বেঁধে দিলেন। অত বড় গাইয়ে, কত সাধ্য-সাধনা করে, কত পয়সা খরচ করে তবে তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করা যায়। আর আমায় না বলতেই অমন করে কাছে টেনে নিলেন। অবাক

হব বই কি। এ কি কম সৌভাগ্যের কথা?

নাড়া বেঁধে দেওয়ার পর নিজের পয়সায় একশো লাড্ডু আনালেন। বাঈজীদের বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠানো হল। আচার-অনুষ্ঠান শেষ হতে আমায় গান দিলেন গহরজান। ভূপালী টপ্পা—'আ মিলা ম্যাহ্‌রাম ইয়ার।' ক্রমে ক্রমে ঠুম্‌রী, গজল, দাদরা সবই শেখালেন। কিন্তু তেমন করে শেখবার সুযোগ পেলাম না। কারণ গহরজানকে কাছে পেতাম খুবই কম। বেশীর ভাগ সময় তিনি মুজরোয় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন। তবে কলকাতায় এলে আমায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে শেখাতে কসুর করতেন না। অনেক মুজরোতেও তাঁর সঙ্গে গেছি। শুধু কি গানই শিখেছি তাঁর কাছে? উঁচুদরের গাইয়ে-বাজিয়ের যে সব আদব-কায়দা রপ্ত করা দরকার, সব কিছু তিনি হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন আমায়। বাস্তবিক রূপে, গুণে, যশে, অর্থে গহরজানের তুলনা সেকালে আর কেউ ছিলেন না।'

সেকালের শ্রেষ্ঠ গায়িকা এই গহরজানের জীবন কাহিনীটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। প্রকৃত পক্ষে তিনিই ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ গুণী এবং রূপসী বাঈজী। সুপ্রসিদ্ধ এই গায়িকার জন্ম কিন্তু খাস কলকাতায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। বাবা রবার্ট উইলিয়াম ইওয়ার্ড, মা ছিলেন এডেলাইন ভিক্টোরিয়া হেমিংস।[১] সম্প্রতি কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ অবশ্য জানিয়েছেন, ওঁর মায়ের নাম মালকাজান গোয়াওয়ালী। উনিশ শতকের নব্বই-এর দশকে উনি কলকাতায় ওঁর মায়ের সঙ্গে দুলীচাঁদবাবুর অতিথি হয়ে দমদমে আসেন। সেই সময় দুলীচাঁদবাবুর বিশেষ আমন্ত্রণে গোয়ালিয়রের গনপৎ রাও ভাইয়া সাহেবও ওখানে উপস্থিত ছিলেন। ভাইয়া সাহেব সঙ্গে এনেছিলেন কিশোর মৌজুদ্দীনকে। গওহরজান ভাইয়া সাহেবের কাছে বঠ্‌বেহু খেয়াল ও ঠুংরী শেখেন তারপর ধ্রুপদ শিক্ষা করেন শ্রীজান বাই-এর কাছে। তারপর পঞ্চকোট মহারাজার গায়ক বামাচরণ ভট্টাচার্যের কাছে বাংলা গান শেখেন। তারপর ওঁর গুরু কাশীর শিবপ্রসাদ মিশ্রজীর কাছে ঠুংরী ও খেয়াল শেখেন। ইংরেজী ভাষা রপ্ত করেন মিসেস ভি সিল্‌ভার শিক্ষায়। ইংরেজী গান শিখেছিলেন কলকাতার সুদক্ষ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গায়কদের কাছ থেকে। মারাঠী ভাষা

১। ভারতের সঙ্গীত গুণী—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ১ম খণ্ড

উনি উর্দ্দুর মতই স্বচ্ছন্দে বলতে পারতেন। কলকাতায় আসার আগেই উনি মারাঠী ভাষায় ভাবগীতি ও ভজন শেখেন এবং কলকাতায় গোয়াবাগানের শ্রীরমেশচন্দ্র দাস বাবাজীর কাছে বাংলা কীর্ত্তনের পালাও শেখেন। ইংরেজী, উর্দ্দু ও দেবনাগরী হরফে লিখতেও পারতেন। কোনো কারণে বাংলা অক্ষর পরিচয় তাঁর হয়নি, তবে অনর্গল বাংলা বলতে পারতেন। ইংলিশ নোটেশনে অতি সহজেই গান তুলতে পারতেন, ছাত্রদের শেখানোর সময় তবলায় ঠেকাও নির্ভুল দিতেন। উনি বদরুদ্দিন টোঁকওয়ালের কাছেও তালিম নিয়েছিলেন। ওঁর রচিত বহু ঠুংরী ও খেয়াল আজও জনপ্রিয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভণিতায় ওঁর নাম উল্লেখ না করেই গায়কেরা সেই সব গান জলসায় গেয়ে থাকেন।

ওঁর রচিত একটি খেয়াল গান তুলে দিলুম—

তুম হজরত খবাজা
সব রাজন কি রাজা
হুঁ আয়ী হুঁ তেরো দরওয়াজা।
গওহর প্যারী কি অরয এহি হ্যয়
জগমে রাখো মেরী লাজা॥

গানটি লছমী তোড়ি রাগে, ঝাঁপতালে নিবদ্ধ।

এখন কলকাতায় সিনেমা শিল্পীদের যে জনপ্রিয়তা সেযুগে একমাত্র গওহরজানেরই তা ছিল। এমনকি ওঁর পোষ্ট কার্ড সাইজের ছবিও বিক্রী হত। রঙীন ছবি দু আনায় সাধারণ ছবি এক আনায়। যে সব সৌখীন মানুষ গান বাজনা করতেন বা ভালবাসতেন তাঁরা ঐ পোষ্ট কার্ড ছবিগুলি কিনে গানের খাতায় লাগিয়ে রাখতেন। চিৎপুরে গওহর বিলডিং-এর সামনে যুবকদের ভীড় লেগে থাকত। ওঁর অভ্যাস ছিল বিকেলে ইডেন গার্ডেনে কিছুক্ষণ বেড়ানোর পর আউটরাম ঘাটের উপরতলায় যে রেস্তোরাঁ ছিল সেখানে বসে চা খেয়ে, আলো জ্বলার পর ইডেন গার্ডেনে আর একবার ঘুরে বাড়ি ফিরতেন কিংবা কোনো বন্ধু বা শাগির্দের বাড়ি যেতেন। হ্যারিসন রোডে শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়ি এবং সুরবাহার বাদক হরেন্দ্রনাথ শীলের

গহরের সঙ্গে একবার রাইকেলে তবলা বাজিয়েছিলেন দশ বছরের বালক রাইচাঁদ বড়াল। (ইন্দ্রকুমারীর ছেলে)

বাড়িতেই বেশী যেতেন। একটি খোলা ফিটন গাড়ি ওঁর ছিল।

আমি ইডেন গার্ডেনই ওঁকে প্রথম দেখি। ইউরোপীয়ানদের মতন গায়ের রং, ছোট কপালে ধনুকের মতন অদ্ভুত সুন্দর ভ্রূ, তার নীচে প্রকাণ্ড বড় বড় গোল কাল গগ্‌ল্‌স, সঙ্গে একটি মেয়ে, নাম লায়লা। লায়লাজান ওঁরই মেয়ে, সবাই বলত। চেহারার সাদৃশ্য ছিল। পিতৃদেবকে ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের কাছে বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখে বাঁ হাতটা ডান কনুই-এর নীচে রেখে ডান হাত আদাব করার ভঙ্গীতে তুলে বলেছিলেন "আদাব অর্জ মহারাজ।" পিতৃদেব হেসে বলেছিলেন 'তসলিম্ বাই'। বিরাট কালো চশমা মনে হয় নিজেকে লুকোনোর জন্যে পরতেন। ঘরে বা আসরে কখনো ঐ চশমা পরতে দেখিনি। শেষের দিকে লেখা বা পড়ার জন্যে সোনার রিমলেশ চশমা ব্যবহার করতেন। গওহরজান তাঁর সুন্দর ভ্রূ জোড়া দিয়ে মনের ভাব বেশ প্রকাশ করতে পারতেন। ছাত্রদের শেখাবার সময় উনি নিজেই তবলায় ঠেকা দিতেন। ছাত্র কোনো বড় তানের গান শেখার সময় ঠেকার খেই হারিয়ে ফেলতে উনি ভ্রূ দিয়েই স্পষ্ট জানিয়ে দিতেন যে গানের মুখড়া ধরার সময় অতীত হয়ে গেছে আরও এক আবর্দা ঘুরতে হবে, তাতেও ছাত্র সমর্থ না হলে ঠেকা দিতে দিতে নিজেই ঠিক জায়গায় মুখড়াটি গাইতেন।

গওহরজান তাঁর জীবনের শেষ দিকে এক পেশোয়ারীর বিশ্বাসঘাতকতায় সর্বস্বান্ত হন। চিৎপুর ও কলুটোলার সংযোগস্থলে তাঁর চারতলা বাড়ি 'গওহর বিলডিং' মামলা চালাবার খরচের জন্য বিক্রয় করতে হয়। সব হারিয়ে তিনি শেষে উঠে আসেন এখনকার মৌলানা আজাদ কলেজের একটি বাড়ির পরের পাঁচতলা বাড়ির দোতলার দুটি ঘরে। বাড়িটি ছিল ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের পশ্চিম দিকে। তাঁকে তখন গান শিখিয়ে জীবিকা অর্জন করতে হত, আগের

আগেই বলেছি এক পেশোয়ারী যুবকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য উনি সর্বস্বান্ত হন। তাঁর কিছু টাকা একটি ব্যাঙ্কে সঞ্চিত ছিল। তবে তিনি প্রায় সব টাকাই তুলে নিয়েছিলেন শেয়ার কেনার জন্য। উনি কম দামে শেয়ার কিনে বেশী দামে বিক্রী করতেন স্টক মার্কেটের দালালদের পরামর্শ অনুযায়ী। সেবারে শেয়ারের বাজারের ওঁর প্রচণ্ড লোকসান হলে দালালরা টাকার জন্য ওর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করল। গওহর বিলডিং, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের বাড়ি এবং স্থাবর যা কিছু ছিল সব বিক্রী করে ওঁকে দেউলিয়া হতে হয়। তারপর ওয়েলেসলী স্ট্রীটের ২টি ঘরে উঠে আসতে বাধ্য হয়। ওঁর ছাত্ররা ওঁকে তখন প্রতিদিন এক টাকা করে দিতেন। বাইরে বিশেষ বেরোতেন না, কোনো জলসায় আমন্ত্রিত হলে আয়োজকরাই গাড়ি করে নিয়ে

মতন গানের জলসায় ডাক পেতেন না। সেই সময় অনেকেই তাঁর ছাত্র হয়েছিলেন, যেমন, বাংলা টপ্পা গায়ক বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী ইন্দুবালা, জমীরুদ্দীন খাঁ ইত্যাদি।

অথচ মাত্র কয়েক বছর আগেও তার মুজরো ছিল পাঁচ'শ টাকা। বলতে গেলে গহরের সমকক্ষ বাঈজী সত্যি কলকাতায় তখন আর কেউ ছিলেন না। নানা ভাষায় তিনি গাইতেন টপ্পা, খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার, গজল বা ঠুংরী অথবা কীর্তন। ১৯১৩ খ্রীঃ যখন তাঁর বয়স মাত্র চল্লিশ বছর তখনই গহরজানের রেকর্ডের সংখ্যা ত্রিশ ছাড়িয়ে যায়। তিনি একাই সারা রাত গান শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতেন। আগ্রাওয়ালী মালকাজনের মত গহরজানও চমৎকার নাচতে পারতেন এবং দুই বন্ধু বাঈজী ১৯২০ সালে পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ বংশের বড় ছেলের বিয়েতে জলসায় নৃত্য ও গীত প্রদর্শন করে কলকাতার রসিক সমাজকে মুগ্ধ করেছিলেন।

কাশীর বিখ্যাত ওস্তাদ বেচু মিশ্র ছাড়া গহরজান তালিম নিয়েছিলেন গনপৎরাও ভাইয়া সাহেব এবং ওস্তাদ কালে খাঁ'র কাছে। এছাড়াও ছিলেন শ্রীজান বাঈ, বামাচরণ ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ মিশ্র, মিসেস ডি, সিলভা রমেশচন্দ্র দাস ইত্যাদি।

জীবনের প্রায় পঞ্চাশটি বছর কলকাতায় সঙ্গীতের চূড়ায় অবস্থান করার পর, তিনি শেষ জীবনে মহীশূরের রাজ দরবারে চলে যান এবং সেখানেই

যেতেন। শেষে ১৯২৮ সালে মহীশূরের মহারাজা কৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ার ওঁকে দরবারের গায়িকা নিযুক্ত করলে উনি ওখানেই চলে যান কন্যাকে নিয়ে। সেই সময় বহু বিখ্যাত গায়ক ও বাদক ওর সাহায্যের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে সংগীতানুষ্ঠান করেন। তাছাড়া গ্রামাফোন কোম্পানী থেকেও ওঁর মাসোহারার ব্যবস্থা করা হয়। স্বর্গীয় ভগবতীচরণ ভট্টাচার্যের জন্য এই ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল। মহীশূরে যাবার এক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। উনি বলতেন আমাকে যে যেমন দেখে তার কাছে আমার তেমন বয়স। কেউ কেউ বলতেন ওঁর বয়স ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে আবার অনেকে বলতেন ওর বয়স পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরের মধ্যে। আমার কাছে তাঁর পিতৃদেবকে লেখা একটি চিঠি ছিল। ওঁর তেজস্বীর এত দুরন্ত ছিল যে সেই চিঠির শেষ কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করার ইচ্ছা সংবরণ করতে পারছি না—

মুঝে ভেজো নুই জেড় শো রূপয়া মিল গয়া। হম হে আদমী ১৮ তারিখকো বৈশাদস শির চশমকে বল হাজির হো যাউঙ্গী। খিদমত মে হরওয়ক্ত মহারাজকে বাঁদী গহরজান।

[সঙ্গীত সঙ্গ ও প্রসঙ্গ—কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ, বিনোদন 'দেশ' ১৩৮৮]

অবশেষে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে করুণ অবস্থায় ছাপ্পান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইন্দুবালার জীবনে গহরজানের প্রভাব ও শিক্ষা বা ঘরানা এমনই একাকার হয়ে গিয়েছিল যে ইন্দুবালার শিক্ষায়িত্রী এই গহরজান সম্পর্কেও পাঠকের আগ্রহ সেকালের মত একালেও যথেষ্ঠ বিগুমান। ইন্দুবালা বিষয়ক আলোচনায় গহরজানের আলোচনা তাই সহজেই এসে পড়ে।

নিজের প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে তিনি আজও স্মরণ করেন গহরজানের কথা। তিনি বলতেন—উনি যে কত গুণী ছিলেন সে তো অনেকেরই জানা। মনের মধ্যে কোথাও হিংসে বা অহঙ্কার ছিল না। ছোটবড় সকলকেই তারিফ করতেন। আর রূপ? সে নিয়ে মজার এক গল্প আছে। একবার সেজে গুজে হীরে জহরতের জড়োয়া পরে খোলা ফিটনে ঘোড়ার রাশ নিজে হাতে ধরে চৌরঙ্গী দিয়ে যাচ্ছিলেন গহরজান। অমন রূপ, তার উপর গায়ে হীরে জহরত ঝলমল করছে। মাথায় ঝকমকে মুকুট, ঠিক যেন রাণী। লাট সাহেব যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে। ভুল হল লাট সাহেবের। গহরজানকে সত্যি সত্যিই তিনি রাণী ভেবে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে টুপি খুলে অভিবাদন জানালেন। পরে যখন ভুল বুঝতে পারলেন, তখন চটে-মটে নিয়ম করে দিলেন কোনও মেয়ে যেন ঘোড়ার রাশ ধরে চৌরঙ্গী দিয়ে না যায়। আর গহরজান গেলে যেতে হবে বন্ধ গাড়িতে।

রূপে-গুণে এমন মানুষের স্নেহ পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? গহর-জানের স্নেহ তো পেলাম, কিন্তু চটে গেলেন কালীজী। গহরজানের কাছে নাড়া বেঁধেছি বলে ভয়ানক অভিমান হল তাঁর। কিছুতেই আর আমাকে শেখাতে চান না। দাদা গৌরীজীর কথাতেও কোন কাজ হল না। অনেক কান্নাকাটি করলাম আমি, মা দুজনেই। হাতে-পায়ে ধরলাম। কালীজী অনড় অটল। অসহায় হয়ে মা শেষ চেষ্টা করলেন। বললেন, "কী করলে আপনার রাগ ভাঙবে বলুন, আমি তাই করব।" তখন কালীজী একটু নরম হলেন। বললেন, "বেশ তোমার মেয়েকে শেখাতে পারি, কিন্তু এক শর্তে।" শর্তটা কী, কাশী থেকে সব চৌধুরীদের (গানের বিচারক) আর গুরুজীর জাত ভাই কত্থকদের আনতে হবে। খরচ হবে হাজার টাকা। এ ছাড়া

আর একটা অসম্ভব কাজ করতে হবে। যজ্ঞ করে হোমের আগুনে গহরজানের বেঁধে দেওয়া নাড়া পুড়িয়ে দিতে হবে। উপায় না দেখে শর্ত নিতে হল। খরচের টাকাটা কাকা দিয়ে দিলেন। শুভদিন দেখে অনুষ্ঠান হল কালীজীর বাড়ীতে। যথারীতি নাড়াও জ্বালিয়ে দিলাম। এ-কথা কিন্তু গহরজানকে কোনদিনই জানাতে পারিনি।

অবশ্য এর ফলে অন্যদিকে কালীজীর রাগ কমল। তিনি অত্যন্ত যত্ন ও আগ্রহ নিয়ে ইন্দুবালাকে শেখাতে আরম্ভ করলেন। ইন্দুবালা উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত তালিম পেয়ে শিখলেন খেয়াল, ঠুমরী, চৈতী, কাজরী, লাওনী ও টপ্পা। পরবর্তীকালে এলাহী বক্সের কাছেও ইন্দুবালা শিখেছিলেন আরও উচ্চাঙ্গের টপ্পা। কিন্তু যে কারণে গহরজান তাঁর এত প্রিয় ছিলেন তা হল গহরজানের সঙ্গীত বিদ্যার পর্যাপ্ত সংগ্রহ। তাছাড়া, গান কিভাবে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করলে অধিকতর সাফল্য অর্জনে সক্ষম সেই টেকনিকগুলো ইন্দুবালার প্রধানতঃ গহরজানের কাছ থেকেই শেখা।

গহরজান সম্পর্কে পরিচয় লিপিতে লেখা হয়েছে—

গউহরজান বা গহরজানের জন্ম এই কলকাতায়। বাবার নাম রবার্ট উইলিয়ম ইওয়ার্ড। মা এডেলাইন ভিক্টোরিয়া হেমিংস। পরবর্তীকালে কেউ এদের ইহুদী বলেছেন, আবার কারও মতে এঁরা ছিলেন আর্মানী বা আর্মেনীয়। এঁদেরই একমাত্র শিশুকন্যার নাম ছিল ইলীন অ্যাঞ্জেলিনা ইওয়ার্ড। অসামান্যা রূপসী এডেলাইন ভিক্টোরিয়া বাড়ীরই 'এক হীনবৃত্তির কালা আদমির সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মালকাজান নাম নেন। মেয়ের নাম হয় গহরজান। গহরজান ছিলেন খুবই সুন্দরী। বাঈজীজনোচিত আদব-কায়দা, ঠাট-ঠমক, লীলাচপলতায় তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর যুগের নৃত্যগীতপটীয়সী তওয়ায়েফ্‌দের মধ্যে তিনি ছিলেন অনন্যা। একদিকে যেমন কথক শ্রেণীর নৃত্যে, অপর দিকে তেমন খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, দাদরা থেকে শুরু করে কাজরী, লাউনী; চৈতি, ভজন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের সঙ্গীতে গহরজানের অসাধারণ দক্ষতা কলারসিকদের বিস্ময় উদ্রেক করত। সে যুগের সবচেয়ে নামী বাঈজী হয়েও, প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন কোমল, সংবেদনশীল এবং গুণগ্রাহী। আর সেই কারণেই ঘরোয়া বৈঠকে অখ্যাত কিশোরী ইন্দুবালার গানে মুগ্ধ হয়ে অযাচিত ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁকে সঙ্গীত শিক্ষা দানের প্রস্তাব জানাতে গহরজানের দ্বিধা হয়নি।

"গহরজান তখন থাকতেন তাঁর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ঠিকানায়। ইন্দুবালা সেখানে মাঝে মাঝে যেতেন। গান শিখতেন তাঁর কাছে। গহর ব্যবহারও বড় ভাল করতেন। তখন তাঁর অত সম্মান, উপার্জন। কিন্তু অহংকার কোথায়? নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে গান শেখাতেন ইন্দুবালাকে। বিরক্তির লেশ মাত্র নেই। আবার এক-একদিন বাংলা গান শুনতে চাইতেন ছাত্রীর কাছে। বাংলা গান যে কত ভালবাসতেন তা বোঝা যেত। গহরজান বলতেন, 'গাও তো, আর কি বাংলা গান জানো।'

পরবর্তীকালে গহরজানেরই আর এক শিষ্য জমীরুদ্দীন খাঁর কাছে ইন্দুবালা যে তালিম পেয়েছিলেন তিনিও ছিলেন এই ঘরানার প্রতিভূ। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে জমীরুদ্দীন খাঁ নাকি গহরজানের শিষ্যত্বের কথা অস্বীকার করতেন। যদিও কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ (মহিষাদল) জানিয়েছেন, 'জমীরুদ্দীন খাঁ কোথাও কোথাও শিষ্যত্বের কথা অস্বীকার করতেন; জমীরুদ্দীন খাঁ যে গওহরজানের কাছে কিছু শিখেছিলেন—এ তথ্য যাঁরা জানতেন তাদের মধ্যে মনে হয় একা আমিই এখনও জীবিত। জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের পিতা মসিদ খাঁ আম্বালাওয়ালে কলকাতায় আসেন গত শতাব্দীর শেষ দিকে। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী।'

গহরজানের মৃত্যুর পর মহীশূরেই আবার তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত। এ বিষয়ে সেকালের পত্র-পত্রিকায় হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা 'খেয়ালী'তে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট ও কবিতা প্রকাশিত হয়। যেমন—

"কুটিলে, কুটিল প্রাণে চিনলি না'ক
শ্যাম যে কি রতন"—

নর্ত্তকী শ্রেষ্ঠা গহরজান দেহ রাখিয়াছেন। গহরজান গত হইবার পর সুদূর মহীশূরে সুন্দ উপসুন্দের লড়াই লাগিয়াছে সিটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উর্সের

ভাল লাগলে, সেটি আবার ছাত্রীর কাছে শিখেও নিতেন। এ ব্যাপারেও ছিল না অহমিকা।

একদিন ইন্দুবালার মুখে শুনলেন এমনি একখানি বাংলা গান। বিদ্যাসাগর পালার—

শোন রাজকুমারী হাতে ধরি,
প্রাণে দিও না আর ব্যথা।
(ধ্বনি) কথা শোন, চেয়ে দেখো,
আজকে কেমন মালা গাঁথা॥
যে জন্যে হয়েছে বেলা,
জানতে যদি সে সব জ্বালা,
খুলে দেখলে ফুলের মালা,
অমনি ঘুরে যাবে মাথা॥

ভৈরবীতে বাঁধা এই গানখানি গহরের ভারি ভাল লাগত। মাঝে মাঝেই ইন্দুবালাকে বলতেন, 'সেই ফুলকা গানটা গাও তো।' তারপর একদিন ইন্দুবালার মুখে শুনে শুনে নিজেই শিখে নিলেন—'শোন রাজকুমারী হাতে ধরি, প্রাণে দিওনা আর ব্যথা…"। (ভারতের সঙ্গীতগুণী—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়)

এজলাসে গহরজান সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণয় হইবে। কলিকাতার সাবাস্ সব্‌জুহারি—গহরজানের স্বামীত্বের দাবী করিয়াছিল। মহীশূরের মিরকুম্বরহাল স্বামীত্বের অপর দাবীদার। আব্বাসের স্বামীত্ব প্রমাণের জন্য মিঃ জে. সি. মুখার্জ্জি সাহেবের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। মুখার্জ্জি সাহেব কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এসিকিউটিভ অফিসার রূপে খ্যাত সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্যের মূল্য বড় কম নহে। আব্বাস্ সাবজুহারি দেখিতেছি কম জহুরি নহেন। গহর বিবাহের সাক্ষীরূপে তিনি একেবারে মানবশ্রেষ্ঠ নাগরিক রতন মুখার্জি সাহেবকে সাক্ষী মানিয়েছেন। মুখার্জি সাহেব সাক্ষ্য দিলেও মাজিস্ট্রেট সাহেব সাব্ জুহারীর দরখাস্ত না মঞ্জুর করিয়াছেন। মিঃ কুম্বর হালিরও দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন। ধর্ম্মবতার আদেশ দিয়াছেন যে মিঃ আব্বাস্ ও মির কুম্বরহলি ব্যতীত অন্য কেহ যদি ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে হুজুরে হাজির হইয়া গহরজানের ত্যক্ত সম্পত্তির দাবী প্রমাণ করিতে হইবে। রাজা সাহেব বহুকষ্ট করিয়া গহর বিবাহে সাক্ষ্য দিলেও আব্বাস্ মিঞার কোন সুবিধা হইল না। মহীশূরে এ হইল কি? কলিকাতা কর্পোরেশনের বড় কর্ত্তার সাক্ষ্যে কোন ফল হয় না এ কথা ভাবিতেও আমাদের কষ্ট হয়। নাগরিকগন তাঁহাদের এক্সিকিউটিভের এ অপমান কিছুতেই সহ্য করিবেন না। শুনা যাইতেছে টাউন হলে শীঘ্রই এক রাক্ষসী প্রতিবাদ সভা হইবে। তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজের নিকট ডেপুটেশনের ব্যবস্থা হইতেছে। রায় রামতারণকে সভাপতি করিবার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

[খেয়ালী, শনিবার, ১৭ জানুয়ারী ১৯ ১]

ঐ তারিখেই 'খেয়ালী' পত্রিকায় যে কবিতাটি এ বিষয়ে প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ :

"চীফ্ গহরজান-সংবাদ

গহরজানে জান্‌তো লোকে
গায়িকা ও নর্ত্তকী!
জান্‌তো কে গো এ ছাড়া সে
কোথায় কখন্ করতো কি?

কোন্ কাগজে রেস্ত খেয়ে
কচ্ছে নিম্‌কহারামী,
কোন্ কাগজে জুতোর ঘায়েও
ঘুচ্‌ছে নাকো ভাঁড়ামী।

কি দিয়ে ভাত খেত,
ক'টায় নিদ্রা যেত,
কিম্বা নিদ্রা যেতই কিনা
আছে বা এর সাক্ষী কে?
হয়নি বাহির Daily, মাসিক,
সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকে!

কোন্ কাগজের ভিস্তী,
খেলে নটীর খিস্তী,
শহরের চীফ্ হ'লেন ব'লেই
সব খোঁজ কি রাখা যায়?
যজ্ঞি-বাড়ীর বামুন বলেই
সব ব্যঞ্জন চাখা চাই?

গহর গেল বেহেস্ত শহর
তুচ্ছ ক'রে অনিত্যে,—
জহর হীরার বহর দেখে'
ছুটেছে লোক ধনীতে।
বিত্ত দেখে দামী
জুটলো জোড়া স্বামী,
মহীশূরের মীর কাম্বর,
কলিকাতার আব্বাসে।
বেহেস্ত থেকে দেখে' গহর
বলে "তোফা, আব্বাস-এ॥"

ফুলের মধু খাচ্ছে লুটে
ময়রা বাড়ীর মৌমাছি,
যূথীর পরে ভোমরা বসে
টগর বলে "বৌমা, ছিঃ!"
বাগান-ভরা শহর,
তাতে অষ্ট-পহর
হচ্ছে সে-সব কীর্ত্তিকলাপ
নিভৃতে নিত্যি আর কি।
সব খবর কি রাখা সহজ?
একি একটা ইয়ার্কী?

মুখের কথায় হয় না স্বামী
চোখে দেখার প্রমাণ চাই,
জোড়া স্বামীই গণ্‌লো প্রমাদ—
কোথায় সাক্ষী-সাবুদ পাই?
অনেক খুঁজে খুঁজে,
এবং বুঝে সুঝে,
ভাব্‌ছে ডাঙায় তুলবো শীকার
কোথায় বা পাই ছিপটে গো,—
আব্বাস্ আলির জুটলো সাক্ষী
কর্পোরেশন "—চীফ" যে গো।

আব্বাস আলি শুন্‌লো না তো,
মান্‌লো চীফে সাক্ষী গো।
সে-ই যে গহরজানের স্বামী—
ফুটবে "চীফের" বাক্যি গো!
রাজি হ'লেন চীফ,
গুছিয়ে নিয়ে ব্রীফ,
ছুটে আব্বাস স্বামী সেজে
মহীশূরের দরবারে।
"চীফের সাক্ষ্যে ভর্ত্তাগিরির
মোকদ্দমার দর বাড়ে॥

কর্পোরেশন চীফ্ সে যখন—
রাখবে সকল সংবাদই।
তাঁহার বচন স্বস্তি-বচন-
সত্য অবিসম্বাদী॥
কোন্‌টা কাহার ভার্য্যা,
অনার্য্যা বা আর্য্য,
কার বাছুরে দুধ খেয়েছে
কার বা গাই এর বাঁটটীতে,
কার বিছানায় খাটো গদী
খাপ্ খায়না খাটটিতে।

দুই স্বামীরই সাক্ষ্য প্রমাণ
হ'ল কোর্টে সঞ্চিত,
মোকদ্দমা গেল ফেঁসে,—
দোনো মিঞাই বঞ্চিত।
হাকিম দিল হুকুম—
"আত্মীয় বা কুটুম
হাজির হো যাও, যদি কেহ
থাক মধুমাক্ষিকই।"
আর কেউ কি আছে স্বামী
এবং তাহার সাক্ষী কি?

ইন্দুবালার প্রথম গুরু গৌরীশঙ্কর মিশ্রও অবশ্য পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রথম ১৯৩৮ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৪২-৪৩ সনে) বোমার ভয়ে শহর ত্যাগের সময় তিনি পুরুলিয়ায় চলে যান। সেখানে কিছুকাল পরে মৃগী রোগাক্রান্ত হবার ফলে তাঁর আত্মীয়স্বজনবৃন্দ তাঁকে পুনরায় কলকাতার ১৫৮ নং বলরাম দে স্ট্রিটের বাড়িতে নিয়ে আসেন। অবশেষে এই বাড়িতেই ইন্দুবালার জীবনের প্রথম ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর মিশ্রজী ১৯৪৫ খ্রীঃ আশী বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

কালীপ্রসাদ এবং এলাহী বক্স (ইলাহি বক্স) এবং স্বয়ং গৌরীশঙ্কর বা গহরজানের পর ইন্দুবালা বাংলা গান শেখার দিকে নজর দিয়েছিলেন। আগেই বলা হয়েছে জীবনে বাংলা গান যা শিখেছিলেন তা প্রধানতঃ তাঁর মা রাজবালা এবং অন্যান্য প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শেখা। ছোটবেলা থেকেই বাংলা গানের প্রতি ইন্দুবালার স্বাভাবিক ভাবেই একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাই মনের সুখে তখন তিনি বাংলা গানই খুব গাইতেন।

অবশ্য তিনি প্রধানতঃ পছন্দ করতেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সেই সব ভক্তিমূলক গান যার মধ্যে থাকত অজস্র দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান, শ্যামাসঙ্গীত এবং বৈঠকী শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি।

তাই জীবনে প্রথম আসরে বাংলা গান গাইবার স্মৃতিটি তাঁর মনে আজও

অমলিন হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, লোকের সামনে বাংলা গান গাইতে বসলাম যেদিন, সেদিন বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। একটা আসরে গেছি। সেখানে গান গাইছেন আমাদের আমলের এক নামকরা গাইয়ে হীরাবাঈ। হীরাবাঈ গান শিখেছিলেন মেটিয়াবুরুজের পিয়ারী সাহেবের কাছে। এই পিয়ারী সাহেব খুব গুণী লোক ছিলেন। মেয়েদের গলা নকল করে চমৎকার গাইতে পারতেন। সেদিনের আসরে ওনার ছাত্রীও কম ভাল গাইছিলেন না। লোকের অনুরোধে হীরা সুন্দর কয়েকখানা বাংলা গান শোনাল। দোষের মধ্যে হ'ল কী তার বাংলা উচ্চারণ হিন্দুস্থানীদের মত শোনাচ্ছিল। এর পর ডাক পড়ল আমার। গান ধরলাম 'হের সখা, গভীর মেঘদল গরজে' ; এক গানেই মাইফেল মাত। পর পর খানকুড়ি গান গেয়ে তবে নিস্তার পেলাম। সেই থেকে বাংলা গানের প্রতি ঝোঁকটা আরও বেড়ে গেল। গাইতেও লাগলাম, আবার এখান ওখন থেকে জোগাড় করতেও মেতে উঠলাম।

বাংলা গান শেখার প্রেরণা থেকেই ক্লাসিকাল গানের পাশাপাশি মনপ্রাণ দিয়ে ইন্দুবালা বাংলা গান সংগ্রহে নিমগ্না হন। এবং একদা এর ফলেই জীবনে প্রথম গ্রামাফোনে বাংলা গান গাইবার বা রেকর্ড করবার সুযোগ পেলেন তিনি। যদিও তাঁর মতে, আশ্চর্যের বিষয়, পরে এটা-সেটা রেকর্ড করার জন্যে বায়নাক্কা করেছি বটে, কিন্তু গোড়ায় রেকর্ড করার ব্যাপারে স্বেচ্ছায় কোন উৎসাহ প্রকাশ করিনি। কলের গান বলে একটা জিনিষ যে আছে তা জানতাম ; তবে সেই কলে আমায় গান গাইতে হবে এমন কোন স্বপ্ন ছিল না। তবে মনে হয় কিছু লোভও নিশ্চয়ই ছিল। নইলে গ্রামাফোন কোম্পানীর এক কথায় রাজীই বা হলাম কেন? একদিন দুপুরে ঘুমোচ্ছি ; হঠাৎ গ্রামাফোন কোম্পানীর ভগবতী বাবু আর মোস্তাবাবু মানে মনীন্দ্রনাথ ঘোষ, বাড়ি এসে হাজির। ঘুম থেকে তুলে তাঁরা আমায় রেকর্ড করার প্রস্তাব দিলেন। তখন কি ভাবে রেকর্ড করা হয় না হয়, কিছুই জানিনা। তাই একটু থতমত খেয়ে জিগ্যেস করলাম "পারব কি?" দুজনেই অভয় দিলেন। বিশেষ করে ভগবতীবাবু। ভগবতী বাবুর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। অমন সজ্জন মানুষকেও খেয়ালের মাথায় কত

কটূ কথাই না বলেছি। যা হোক, রেকর্ড তো হল—'ওরে মাঝি তরী হেথা' আর 'ও তুমি এসো হে,' রেকর্ড বেরোবার পর হোল আর এক জ্বালা। একখানা রেকর্ড পেলাম বটে হাতে, কিন্তু শুনি কিভাবে। নিজের যে গ্রামাফোন নেই। অভিমানে, দুঃখে নিজের রেকর্ডখানা হাতে নিয়ে মোস্তাবাবুর কাছে গিয়ে এক আছাড়ে ভেঙ্গে দিলাম। রাগের কারণ জেনে মোস্তাবাবু কোম্পানীকে বলে বিরাট স্ট্যাণ্ডওয়ালা একটা গ্রামাফোন আমায় উপহার দিলেন।

ইন্দুবালার জীবনে সর্বপ্রথম ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে (রেকর্ড নং পি ৪৩৯০) এইভাবে রেকর্ড করা শুরু হল। এই রেকর্ডটি করবার পর থেকেই শ্রোতাদের কাছে গান দুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে গান দুটি তাঁকে দিয়ে কোম্পানী রি-টেক করিয়ে নেন। তখনকার দিনে এ জাতীয় ঘটনা সচরাচর দেখা যেত না। জংলা রাগাশ্রিত এই 'ওরে মাঝি' গানটির রেকর্ডটি দীর্ঘকাল ধরে যে সব প্রিন্টে অর্থাৎ রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছিল তার নং হল P4390, P11720, FT544, N27275। তাঁর এই অত্যাশ্চর্য সাফল্যের গুণে মুগ্ধ হয়ে পুরস্কার স্বরূপ গ্রামাফোন কোম্পানী সে সময় তাঁদের নিউজ বুলেটিনে ইন্দুবালাকে ভারতবর্ষের 'সর্বপ্রথম অ্যামেচার আর্টিষ্ট' হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কেননা গোড়ার দিকে বাংলা গানের অধিকাংশ রেকর্ডেই তিনি বিনা পারিশ্রমিকে গেয়েছিলেন। নিজেই তিনি স্বীকার করেছেন, রেকর্ডে আমি বাঙলা গান আগে যা যা গেয়েছিলাম তার কোনটার জন্যেই আমি পারিশ্রমিক নিইনি। নিজেকে এ্যামেচার বলেই জাহির করতাম। সে সব পুরোনো রেকর্ড বের করলে এখনো আপনারা শুনতে পাবেন, গানের শেষে আমি নিজের নাম ঘোষণা করতাম—'মাই নেম ইজ ইন্দুবালা, এ্যামেচার।' আমার ধারণা ছিল সামান্য টাকার চেয়ে ওইভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা অনেক বেশী সম্মানের। এমন কি, আমার রেকর্ড বেচে কোম্পানীর যখন বেশ আয় হচ্ছে আর আমাকেও তাঁরা ঘন ঘন রেকর্ড করবার জন্যে ডাকছেন, তখনও আমি পয়সার কথা তুলিনি।

এ প্রসঙ্গে শ্রীদেবেন্দ্রলাল দাশ জানিয়েছিলেন,—১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইন্দুবালা

'গ্রামাফোন কোম্পানী লিমিটেডের' বাংলা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ—বড়বাবু শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য ও রেকর্ড-জগতে সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় মোন্তা বাবু (M. N. Ghosh) অর্থাৎ মনীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক রেকর্ডে গান গাইতে অনুরুদ্ধা হ'লেন। একেই বলে অযাচিত করুণা। ভয়ে-ভাবনায়, আশা ও আনন্দে বুকের মধ্যে এক অজানা আলোড়নের সাড়া পাওয়া গেলো। অনুরোধকগণকে ইনি নিরাশ ক'রলেন না এবং প্রথমবারেই তাঁর ছয়খানি উপভোগ্য ও উৎকৃষ্ট গান রেকর্ডের জন্য মনোনীত হলো। ঐ ছয়টি গীতের মধ্যে "ওরে মাঝি তরী হেথা"···এবং "তুমি এসহে···(P4390) গান দু'টিই শ্রীমতী ইন্দুবালার সর্বপ্রথম রেকর্ড। ভাবে ভাষায় ও স্বরচিত সুরের মিষ্টতায় দরদী গায়িকার "গাম্ভীর্যময় উচ্চ সুরেলা কণ্ঠের" মাধুর্যে বহু পরিচিত এই গান দুটিই রেকর্ড-রাজ্যে ইন্দুবালাকে অবিস্মরণীয় ক'রে রাখবে। ইন্দুবালার রেকর্ড নির্মাতারাই ব'লেছেন'···In 1916 She was approached by the Gramaphone Company Limited, and ***she made some very successful records, which soon increased her fame as singer.*** Since then she has been continuously in the service of "His Master's Voice" and ***she holds a high place in the estimation of gramaphone "fans". She was the first Indian Lady singer to make records as an amateur.*** She received suitable presents from the companay from time to time in recognition of her services and was eventually awarded the gold medal, which is only given by the Gramaphone Company to its most celebrated artist."······

এর পর থেকে বহু বছর ধরে একটানা একের পর এক নানাধরনের গান তাঁর রেকর্ড হতে থাকে। রেকর্ডের সূত্রেই তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত বহু সুরকারের সঙ্গে পরিচয় হয়। এঁরা সকলেই ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ সুরকার। যেমন গিরীণ চক্রবর্তী, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত জমীরুদ্দীন খাঁ, কাজী নজরুল-ইসলাম ইত্যাদি। এছাড়া সেকালের প্রখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গেও ইন্দুবালা রেকর্ডে অনেক গান গেয়েছেন। তাঁর স্মৃতি কথনে তিনি বলেছেন···'তখনকার কালে যত রকমের রেকর্ড হত সব রকমের রেকর্ডই

করেছি। এমন কি বড় বারো ইঞ্চি সাইজের রেকর্ডেও আমি, আঙুর, জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব, দুলারী বাঈ, জোহরা বাঈ ও পেয়ারু কাওয়াল মিলে গান করেছি। গান ছাড়া হিন্দী নাটকের রেকর্ড 'ওয়াজাদার বিবিতে'ও রেহেনা বিবির পার্ট করে লোককে গলা শুনিয়েছি।

এত গভীর এবং প্রায় ছাব্বিশ বছরের, ১৯১৬ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত, যোগ থাকা সত্ত্বেও গ্রামাফোন কোম্পানীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমার সম্পর্ক রইল না। গোল বাধল রয়্যালটি নিয়ে। প্রথমে কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না, কারণ আমি তো পয়সাই নিতাম না। পরে অবশ্য পারিশ্রমিক নিতাম। রেকর্ড পিছু দুশো টাকা। এর পর অবশ্য রেকর্ড বিক্রীর ওপর শতকরা পাঁচ টাকা করে রয়্যালটি পেতাম। বাংলা গানে ওই ভাবেই চলছিল। কিন্তু আমার হিন্দী গান জনপ্রিয় হওয়ায় আমি রয়্যালটির হার বাড়িয়ে শতকরা দশ টাকা করে দেবার দাবী করলাম। কোম্পানী কিছুতেই রাজী হল না। ফলে রেকর্ড করায় দিলাম ইস্তফা।' এই ইস্তফার ব্যাপারে আরও বিস্তৃতভাবে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে আলোকপাত করেছিলেন ইন্দুবালা বিষয়ক প্রথম নিবন্ধ লেখক শ্রীদেবেন্দ্রলাল দাশ। তিনি বলেছেন, প্রথমতঃ কিছুদিন এখানে গান গাইবার পর ইনি কোন কারণ বশতঃ 'গ্রামাফোন কোম্পানীর' সংস্রব ত্যাগ করেন। এঁর পরিবর্তে কোম্পানী কয়েকজন গায়ক-গায়িকাকে দলে নিলেন তবু তাদের সম্মিলিত শক্তি ইন্দুবালার প্রভাব-প্রতিপত্তির এতটুকু ক্ষতি ক'রতে পারলো না। ব্যবসায়ীকে চিন্তার আশ্রয় নিতে হ'লো। কয়েক বছর অবসরের পর আবার সেই অনুরোধের বানী দেহ-মনকে পুলকিত ক'রলো এবং এক শুভ মুহূর্তে "হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস" এর সঙ্গে হলো পুনর্মিলন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ইনি ওখানেই আছেন। এবার গ্রামাফোন কোম্পানী লিমিটেডের চিরস্থায়ী গায়িকার পদে যোগদান ক'রে ইনি একটি অনধিগম্য কার্যে মনোনিবেশ ক'রলেন। কোন বাঙালী গায়ক-গায়িকা পূর্বে "হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস" রেকর্ডে হিন্দী বা উর্দ্দু গান গাইতে পারতেন না। কর্তৃপক্ষের দৃঢ় ধারণা ছিলো যে বাংলার ছেলে-মেয়েরা অবাঙালী সঙ্গীতের অনুপযুক্ত। কর্ম-কর্তাদের এই অমূলক মনের ভাব পরিবর্তন করবার জন্য

ইন্দুবালা সাহস ও বুদ্ধি সঞ্চয় ক'রলেন। তারপর একদিন অকুতোভয়ে কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে যেমন ক'রে হোক্ তিনি হিন্দী বা উর্দ্দু রেকর্ডে নিশ্চয়ই গান গাইবেন। কথাটা প্রথমে কোম্পানী গ্রাহ্য ক'রলেন না; কিন্তু ভীষ্মের ন্যায় প্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হয় না। দুর্লভকে পাবার বাসনা, অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা তারই আছে—যে এসেছে এই ধরায় প্রতিভা ও কীর্তির মুকুট মাথায় নিয়ে। অসাধ্যকে সাধনের সীমায় আনবার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে চিরন্তন সত্য। তাই ইন্দুবালা কামনা চরিতার্থের জন্য অনশন আরম্ভ ক'রলেন—ভেল্কিতে প্রসিদ্ধি অর্জনের ইচ্ছায় নয়—ব্যর্থ মনোরথ ও অকৃতকার্যতার দুঃখে। তিন দিন অনাহারের সংবাদে সেই ভগবতীবাবু অত্যন্ত ভাবিত হ'লেন। গায়িকার একাগ্রতায় তিনি মুগ্ধ ও অনন্যোপায় হ'য়ে ইন্দুবালার অবর্তমানে কোম্পানীর ক্ষতির প্রতি কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। কলিকাতার উর্দ্দু ও হিন্দুস্থানী রেকর্ড-বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ এ. ওয়াহেদ. ওরফে "মুনসীজি" কে ভগবতীবাবু অনুরোধ ক'রলেন—ইন্দুবালার একটি কিংবা দু'টি হিন্দী গান মনোনীত ক'রতে। গান অপছন্দ হ'লে রেকর্ডখানার জন্য যদিও কিছু অর্থ অপব্যয় হয় তবু ভবিষ্যতে অত বড় একজন গায়িকা আর হাত-ছাড়া হবে না কর্তৃপক্ষের এইরূপ ভরসায় তাঁর "জগ ঝুটা সারা সাঁইয়া" ও "বিষয় বাত মম" (রেকর্ডে ছাপা "বিশবে" কথা ভুল) গান দু'টি "হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস (P9836) রেকর্ডে স্থান পেলো। শ্রোতৃ সমাজে উক্ত গানের প্রচুর জনপ্রিয়তা দেখে কোম্পানীর কর্মচারীরা বিস্মিত হ'লেন। বাণীর স্পষ্টতায়, নিখুঁত উচ্চারণে, অবাঙালী শ্রোতারা মুগ্ধ হ'য়ে গায়িকার কৃতিত্বকে প্রশংসা করলেন। এর পর কোম্পানীর পূর্ব নিয়ম চিরদিনের জন্য রহিত হ'লো এবং তখন থেকেই যোগ্যতা অনুযায়ী বাঙালীরাও ওতে প্রবেশাধিকার পেলো। ইন্দুবালা গ্রামাফোন কোম্পানীতে সর্বপ্রথম নূতন প্রথা সৃষ্টি ও বিজাতীয়ের কাছে বাঙালীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করলেন।*

---

* ...'তখন্ বাঙালী কারোকে রেকর্ড কোম্পানী হিন্দী গাইতে দিতেন না। আমার কোন সুযোগ ছিল না যদিও তখন বাংলা গানের বেশ ক'খানা রেকর্ড করে ফেলেছি। কিন্তু কি যে হল, হিন্দী গানের রেকর্ড করতে হবে বলে ভীষণ একটা জেদ চেপে বসল। হিজ মাস্টারস্ ভয়েস-এর কর্তাব্যক্তিদের মনের

প্রধানতঃ এই কারণেই গ্রামাফোন কোম্পানী শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, She is the *first* Bengali artist *to* sing Hindusthani songs *on records* and has Since then made a name in the market.…"

তার প্রমাণ রেকর্ডে এর পর থেকে বছর তিনেক একটানা হিন্দী ও উর্দ্দু গান ইন্দুবালা গাইবার পর প্রধানতঃ হিন্দী ও উর্দ্দু গান শিক্ষা দেবার জন্যে কোম্পানীর সঙ্গীতাধ্যক্ষ জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবকে কোম্পানী নিযুক্ত করলেন ইন্দুবালার ট্রেণার হিসেবে। ফলে এর পর থেকেই ইন্দুবালা হয়ে উঠলেন জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের শিষ্যা।

এইভাবে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেও ইন্দুবালা কিন্তু কখনো অন্য কোম্পানীর দেওয়া প্রলোভনের হাতছানিতে ভোলেন নি। যদিও সেকালে অর্থাধিক্যের প্রলোভনে অন্যান্য রেকর্ড কোম্পানী তাঁকে দিয়ে রেকর্ড করানোর প্রলোভন নানাভাবে দেখিয়েছিল।

ইচ্ছে বললাম। কিন্তু তাঁরা বাঙালীদের অপটু হিন্দী উচ্চারণের ওজর আপত্তি তুলে আমায় তেমন আমল দিলেন না। তাঁদের যুক্তি আমি মানতে পারলাম না। কারণ, নিজের হিন্দী উচ্চারণের শুদ্ধতা নিয়ে আমার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ছিল। তাই গোঁ আরও বাড়ল। তাছাড়া আমার আবদার করার আরও একটা কারণ ছিল। রেকর্ডে আমি বাঙলা গান আগে যা যা গেয়েছিলাম তার কোনটার জন্যেই আমি পারিশ্রমিক নিইনি।

…কিন্তু কোম্পানী কিছুতেই আর রাজী হয় না। চটে মটে ঠিক করলাম, ওদের হয়ে আর বাঙলা গানও গাইব না। তখন বাংলা রেকর্ড বিভাগের বড়বাবু ভগবতী ভট্টাচার্য মশায় ব্যাপারটা মেটাতে এগিয়ে গেলেন। মুন্সীজীর কাছে গিয়ে আমার হয়ে ওকালতি করলেন। মুন্সীজীর মত পাওয়া গেল। আর আমিও হিন্দী রেকর্ড করে শান্তি পেলাম। বাঙালীদের মধ্যে আমিই প্রথম যার জন্যে গ্রামাফোন কোম্পানী অনেক কালের বাঁধা নিয়ম ভাঙতে পারলেন। অবশ্য আমার হিন্দী রেকর্ড না চললে হয়ত পুরানো নিয়মই আবার ফিরে আসত। সুখের বিষয় তা হয়নি। অবাঙালী সমাজ আমার হিন্দী গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। ফলে আমারও হল পোয়াবারো। নিজের খুশীমত হিন্দী বা উর্দু গানের রেকর্ড করতে আমায় বাধা দেবার কেউই রইল না। ‥রেকর্ডে বেশ কিছু হিন্দী গান গাইবার পর গ্রামাফোন কোম্পানী জমিরুদ্দীন খাঁ সাহেবকে আমায় শেখাবার ভার দিলেন। আমার অধিকাংশ গানেরই সুর তাঁর দেওয়া। খাঁ সাহেবের সঙ্গে ডুয়েট গান গাইবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। তার রেকর্ডও আছে। হিন্দী ছাড়া তামিল-পাঞ্জাবীতেও কিছু রেকর্ড করেছি। ও ব্যাপারেও বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে আমিই প্রথম।…'

[অতীত দিনের স্মৃতি—ইন্দুবালা]

ভারতীয় মহিলা শিল্পীদের মধ্যে ইন্দুবালাই ছিলেন প্রথম 'এ্যামেচার' গায়িকা। এর জন্যে বিনিময়ে গ্রামাফোন কোম্পানী তাঁর নির্লোভ চরিত্রের সন্ধান পেয়ে তাঁকে সে আমলে প্রথম থেকেই নানাভাবে পুরস্কৃত করেছেন। যেমন তখনকার (১৯১৬ খ্রীঃ) প্রায় ৪৫০ টাকা দামের মূল্যবান সুদৃশ্য হারমোনিয়াম, চোদ্দ ভরি সোনায় নির্মিত একজোড়া 'অনন্ত' এবং আনুমানিক ছয়'শ টাকা দামের সেকালে কেনা চমৎকার গ্রামাফোন ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে তাঁর মতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল প্রায় দু-ভরি সোনার একটি বড় মেডেল যা কোম্পানী ইন্দুবালাকে দিয়ে সেকালেই সম্মান জানিয়েছিলেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং যে কোন শিল্পীর পক্ষে খুব বড়ো একটা সম্মানও বটে। কেননা, একমাত্র অত্যধিক জনপ্রিয় বা বিখ্যাত শিল্পীদেরই এমন সম্মান কোম্পানী কালেভদ্রে দেখিয়েছেন। উপরন্তু ১৯৩৩খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত H. M. V. কোম্পানীর নিউজ বুলেটিনে'র অষ্টম সংখ্যায় বলা হয়েছিল। **From the advertisement she received from her records her fame spread rapidly, and she soon become inunded with invitations from all parts of India to sing at special concerts—such invitations carrying large fees. Owing to her many local engagements, however, she was only able to accept but few of these requests.** এমন কি ইন্দুবালার সম্পর্কে কোম্পানী উচ্ছ্বসিত হয়ে একদা লিখেছিলেন, **Her musical education commenced under Gouri Sankar Ostadji· who was the celebrated teacher of Indian classical Music. she was fortunate in having as her constant companion Gouher Jan, the primadonna of India. This friendship provided her with much valuable musical knowledge and experience"·········**

'হিজ মাষ্টার্স্ ভয়েসের' হিন্দী, উর্দ্দু ও বাংলা রেকর্ডে ইন্দুবালা প্রায় দুই শতাধিক গান দিয়েছেন। আধুনিক যুগের গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে অনেক বিষয়েই শ্রীমতী ইন্দুবালা তাঁর শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছেন। প্রথমতঃ গানের ভাষা উচ্চারণে বিশুদ্ধতা এবং দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীতের ভাবধারাকে বাঁচিয়ে রেখে সুর-চালনায়

গ্রামাফোন কোম্পানীতে হিন্দী ও উর্দ্দু গান রেকর্ড করার পর অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন সত্বেও অকস্মাৎ কিছুকাল পরেই প্রোফেসর জমিরুদ্দীন খাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে ইন্দুবালার জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে। জমিরুদ্দীন খাঁও যে একদা ইন্দুবালার শিক্ষিকা গহরজানেরই শিষ্য ছিলেন। তখনকার দিনে তাঁকেই বলা হত ঠুংরী সম্রাট বা ঠুংরীর বাদশা। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯২২ খ্রীঃ ২৯শে নভেম্বর বুধবার জমিরুদ্দীন খাঁ তার কলকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করেন। ঠুংরী গায়ক হিসেবে প্রফেসর জমিরুদ্দীন খাঁ ছিলেন সেকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতেও স্বয়ং অনেক নতুন রাগরাগিনীর সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৯১ খ্রীঃ পাঞ্জাবের আম্বালায়। বাবাও ছিলেন বিখ্যাত ধ্রুপদ গাইয়ে ফলে বাবার কাছেই তিনি তাঁর সঙ্গীতের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। পরে কলকাতায় এসে তিনি বদল খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতায় আসার অনতিকাল পরেই সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে তিনি নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হন। পুঁঠিয়ার মহারাণী তাঁকে তাঁর সভাগায়কের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রতিভার নাম কাজী

অসাধারণ দক্ষতার আভাস দিতে ইন্দুবালার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। শেষোক্ত গুণটির জন্য অন্ধ গায়ক—কৃষ্ণচন্দ্র দে কে-ও অনায়াসে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি। 'শ', 'ষ', 'স', 'ই', 'ঈ' 'ণ', 'ন', 'জ', 'য', 'উ' এবং 'ঊ'র পাঠ প্রণালীতে উচ্চারণের বিভিন্নতা ইন্দুবালার কথা অর্থাৎ "Speech" এর মধ্যে অতি সুন্দর রূপে বোঝা যায়। আমার কথা কারুর কাছে বিশ্বাস-যোগ্য বিবেচিত না হ'লে সন্দেহ-পরায়ণ ব্যক্তিরা তাঁর যে কোন একটি রেকড মনোযোগ সহকারে শুনলে সংশয় থেকে মুক্ত হ'তে পারবেন। 'অঞ্জলি'কে 'ওঞ্জলি', 'সঙ্গীত'কে 'চোঙ্গীত' ইত্যাদি বহুপ্রকার বিকৃতি ভাষা উচ্চারণের বদ্ অভ্যাস অনেকেরই আছে, কিন্তু এই জঘন্য ত্রুটি ইন্দুবালার গানে আমরা একেবারেই খুঁজে পাই না; এ-কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য সকলকেই আমি "His Master's Voice"-এর N 7336 রেকর্ডখানা শুনতে অনুরোধ করি। আমার মনে হয়, শিক্ষিত সমাজে শ্রীমতী ইন্দুবালা হয়তো এইজন্যই এখনো তার সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক কলা রসিকের কাছ থেকে Perfect pronunciationএর জন্য ইনি একটি দামী পদক পুরস্কার পেয়েছেন। একঘেয়ে গানের জন্য অনেকেই আজ জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন অথচ ইন্দুবালার মধ্যে কেউ কখনো সেই দোষ আবিষ্কার ক'রতে পারেনি। বিশেষজ্ঞেরা বলেন —এঁর প্রত্যেক গানেই মীড়, গমক, গিটকিরি ও সুর বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য শ্রোতাকে মুগ্ধ করে।

(সুরপরী শ্রীমতী ইন্দুবালা—শ্রীদেবেন্দ্রলাল দাশ)

'শান্তি' পত্রিকা ১৩৪৩ সন পৃঃ ৭৮-৭৯

নট-নটীর জীবন কথা

নজরুল ইসলাম, আব্বাসউদ্দীন, ইন্দুবালা প্রভৃতি। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্রকে রেখে গিয়েছিলেন। জমিরুদ্দীনের একমাত্র পুত্র আব্দুল করিম খাঁ'ও ছিলেন একজন বিখ্যাত গায়ক।

জমিরুদ্দীনের অকাল মৃত্যুর পর কলকাতায় মুসলিম ইন্‌স্টিটিউটে অনুষ্ঠিত (১৫ই আশ্বিন রবিবার ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) শোকসভা সম্পর্কে সেকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় (২১শে আশ্বিন ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) লেখা হয় :—

স্বর্গত সুরশিল্পী

জমিরুদ্দীন খাঁ

মুস্লিম ইনষ্টিটিউটের শোক সভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

স্মৃতিরক্ষায় ব্যবস্থার জন্য কমিটি গঠন

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী জমিরুদ্দীন খাঁর পরলোকগমনে গত রবিবার অপরাহ্নে মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে এক শোকসভার অনুষ্ঠান হয়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে হিন্দু মুসলমান-নির্বিশেষে বালক-বৃদ্ধ-যুবকগণ দলে দলে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া পরলোকগত সুর শিল্পীর স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সভায় বিখ্যাত বাঙালী গায়ক আব্বাসউদ্দীন দুইখানি অতি সুমধুর সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সুরশিল্পী জমিরুদ্দীনের স্মৃতির প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সভাপতি কাজী নজরুল ইসলাম স্বর্গত জমিরুদ্দিন খাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বলেন যে, বর্তমানের হিন্দু-মুসলমান শ্রেষ্ঠ এবং তরুণ গায়কগণের অনেকেই সুরসম্রাট জমিরুদ্দিন খাঁর শিষ্য ছিলেন বলা যাইতে পারে। গানের পাখী নীড় বাঁধে না কোথায়ও। তাই পাঞ্জাবে জমিরুদ্দিন খাঁর জন্ম হইলেও বাঙালী তাঁহাকে পাইয়াছিল। তিনি সকল সম্প্রদায়, সকল মানুষের উর্দ্ধে ছিলেন। সুরের পথ ধরিয়া তিনি ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়াছিলেন এবং সেই সুরের মধ্য দিয়া সকলকেই আনন্দ বিলাইয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল ঠুংরি গানেরই সম্রাট ছিলেন না। ধ্রুপদ, টপ্‌পা খেয়ালও বেশ ভাল জানিতেন। সারা ভারতে অত বড় ঠুংরি গায়ক কেহই ছিল না। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের সঙ্গীত জগতের একটা স্তম্ভ খসিয়া পড়িয়াছে। শুধু গানেই নয়, সুর সৃষ্টিতেতেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। নব নব প্রতিভার সাহায্যে তিনি বিভিন্ন সঙ্গীতে বিভিন্ন সুর সংযোজনা করিতেন। এত বড় গুণী হওয়া সত্বেও তাহার মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ছিল না। তিনি শুধু বাঙ্গলার নহে, সারা ভারতের সঙ্গীত জগতে যে কত বড় দান রাখিয়া গিয়াছেন-তাহা আজ হয়ত বুঝা যাইবে না; কিন্তু দেশ যদি কোনদিন স্বাধীন হয়, সেই দিন তাঁহার দানের সত্যিকার পরিমাপ হইবে। অতঃপর কবি নজরুল বলেন যে, যে এত বড় গুণী ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার্থে একটা কিছু করা কর্তব্য; এইজন্য তিনি সকল সম্প্রদায়ের লোককেই যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।......

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ জমিরুদ্দিন খাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিশেষে স্বর্গত জমিরুদ্দীন খাঁর স্মৃতি রক্ষার্থ অর্থসংগ্রহ ও অন্যান্য উপায় নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সভাপতি, মৌলানা আক্রাম খাঁকে কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও মুহম্মদ মোদাব্বেরকে সম্পাদক করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

জমিরুদ্দীন খাঁর অকাল মৃত্যুর পর গ্রামাফোন কোম্পানী ট্রেণার হিসেবে জমিরুদ্দীনের সহকারী কাজী নজরুল ইসলামকে হেড কম্পোজার এবং কোম্পানীর মিউজিক ট্রেণার হিসেবে নিযুক্ত করেন। এর ফলে গায়িকা ইন্দুবালাও কোম্পানীর সূত্রে নজরুলের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। ইন্দুবালা ভীষণভাবে উপকৃত হন কবির কাছে এসে। তাঁর স্বীকারোক্তি, গ্রামাফোন কোম্পানীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমার সবচেয়ে যে লাভ হয়েছিল, টাকার বিচারে তার হিসেব হয় না। তা হল কাজী নজরুল ইসলাম আর ধীরেন দাসের মত মহান মানুষের সান্নিধ্য লাভ। তখন চিৎপুরে বিষ্ণুভবনে ছিল আমাদের গ্রামাফোন কোম্পানীর রিহার্সাল ঘর। কাজীদা ছিলেন বাংলা গানের ট্রেণার। 'চুপটি করে বোস' বলেই কাজীদা যে কত তাড়াতাড়ি গান লিখে ফেলতে পারতেন তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। শুধু কি লেখা, সঙ্গে সঙ্গে সুরও দিয়ে দিতেন। এ এক অসামান্য প্রতিভা। কাজীদার গানের আমার প্রথম রেকর্ড 'রুম ঝুম রুম ঝুম' আর 'চেয়োনা সুনয়না আর'। মাঝে মাঝে আমায় যখন জিগ্যেস করতেন 'কি লিখি বলত' আমি তখন লজ্জায় মরে যেতাম। কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে শুধু বলতাম 'ঢুটো গানই যেন ভাল হয়।' কাজীদা আমাদের প্রিয় ছিলেন আর একটা ব্যাপারে। চমৎকার হাত দেখতে পারতেন উনি। তার ওপর ছিল প্রাণখোলা দরাজ—দিল হাসি। জীবনের সব দিকে ছিল তাঁর সুর চেতনা। সত্যিই তিনি সুরের রাজা।'

কবি নজরুলের সংস্পর্শে আসার পর থেকে ইন্দুবালার সঙ্গীত জীবনেও বিশেষ করে বাংলা গান পরিবেশনার দিক থেকে কিঞ্চিৎ রূপান্তর লক্ষ্য যায়। মনে রাখা দরকার যে কাজী নজরুল গ্রামাফোন কোম্পানীতে যখন যোগ দেন তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ অর্থাৎ ১৯২৩ খ্রীঃ। শিল্পী ইন্দুবালারও তখন প্রায় ঐ একই বয়স। অবশ্য নজরুলের চেয়ে ইন্দুবালা ছ' মাসের বড় ছিলেন। ইন্দুবালার জন্ম কার্তিক মাসে আর নজরুল জন্মেছিলেন পরের জ্যৈষ্ঠ মাসে। আদর করে তবু কাজী ইন্দুবালাকে ডাকতেন কখনো 'ইন্দু' কখনো 'নানী' বলে। তাছাড়া ইন্দুবালা গ্রামাফোনে প্রথম যোগ দেন ১৯১৬ খ্রীঃ এবং সে বছর থেকেই রেকর্ড করতে শুরু করেন। আর নজরুল

তখন স্কুলে পড়াশোনা করছেন উঁচু ক্লাশে। অবশ্য দুজনেই জমীরুদ্দীনের সাহচর্য ও শিক্ষালাভে ধন্য। ইন্দুবালা অনেক আগে গ্রামাফোন কোম্পানীর অজস্র রেকর্ডের শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে প্রায় আট বছর বাদে নজরুলের ট্রেনিং এ এসে ইন্দুবালা বাধ্য ছাত্রীর মতই কাজী সাহেবকে মেনে চলতেন, ভালবাসতেন ও সম্মান জানাতেন। কাজী নজরুলও ইন্দুবালাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন এবং তাঁর প্রতিভা ও সঙ্গীতের প্রতি তিনি গোড়া থেকেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই দুই প্রতিভার মিলনে বাংলা গান পরিবেশনার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বা রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘকাল সঙ্গীত শিক্ষার ফলে ইন্দুবালা খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরীর শিক্ষালাভের মাধ্যমে সুনাম অর্জন করেছিলেন। নজরুলের কাছে এসে ইন্দুবালা প্রধানতঃ গজল, হোলি, চৈতী, কাজরী ইত্যাদি শিক্ষালাভের মাধ্যমে তাঁর অতীত জীবনের শিক্ষা ও শিল্পীজীবনকে আরও সমৃদ্ধতর করে তোলার সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া পূর্বে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ যে সব রাগিনী ইন্দুবালা আয়ত্ব করেছিলেন নজরুলের কাছে এসে সেই সব রাগ—রাগিনী আশ্রিত বহু গান তিনি নজরুলের রচনা থেকেই গেয়েছিলেন। যেমন বাগেশ্রী, দরবারী, পুরবী, ভূপালী, ইমনকল্যাণ, চৌরী, হিন্দোল। মালকোষ, পিলু, খাম্বাজ, ভৈরবী, আশাবরী বা জৌনপুরী যা নজরুলের সবিশেষ প্রিয় তা তিনি ইন্দুবালা ও তাঁর অন্যান্য প্রিয় শিল্পী দিয়েই রেকর্ড করাতেন। নজরুলের গান তাঁর তত্ত্বাবধানে যারা গেয়েছেন আজও তাঁদের মধ্যে ইন্দুবালাই অগ্রগন্যা। এই কারণেই অনেক সময় দেখা গেছে নজরুল যখনই তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে আপন প্রতিভার স্পর্শ মিশিয়ে নতুন কোনো একটা রাগ-রাগিনী সৃষ্টি করেছেন তখনই ইন্দুবালার মত প্রতিভাময়ী শিল্পীদের গলায় তা তুলে দিয়েছেন। কেননা কবি জানতেন, ইন্দুবালার মত শিল্পীরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘকাল অনুশীলনের মারফৎ নিজেদের উপযুক্ত করে তুলেছেন এবং সেই গানটির মাধ্যমে নজরুল যা চাইতেন প্রত্যাশিত সেই ভাবটিই তাঁদের কণ্ঠে যথাযথভাবে ফুটে উঠত।

যেমন নজরুল কোন কোন গজল গানকে কোথাও কোথাও ঠুংরী বা দাদরার আঙ্গিকে ফেলে রচনা করে ইন্দুবালাকে দিয়ে নানাভাবে নতুন নতুন

ঢঙে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বলা বাহুল্য, ইন্দুবালার কণ্ঠে যাঁরা গজল, ঠুংরী বা দাদরা শুনেছেন তাঁরাই একমাত্র অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে কত অবলীলায় এ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে নজরুলকে সাহায্য করতে ও তাঁর নিজের কণ্ঠকে ব্যবহার করতে তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন। ইন্দুবালার পরিশীলিত কণ্ঠে নজরুলের বহুবিধ সুরের যথাযথ স্ফুরণ হত বলেই তিনি নজরুলের এত প্রিয় শিল্পী।

নজরুলের মাধ্যমেই সেকালের বাংলা গানের বিশিষ্ট প্রতিভার সঙ্গে ইন্দুবালা পরিচিতা হন। তাছাড়া কাজীদার সুবাদে তিনি তাঁদের আরও কাছাকাছি আসারও সুযোগ পান। নজরুল ব্যক্তিজীবনে ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছ্বাসপ্রিয় মানুষ। রাজবালার ২৪নং দয়াল মিত্র লেনের মজলিশ থেকে সুরু হয় নজরুলের আসা-যাওয়া। পরে ইন্দুবালার সঙ্গে প্রাত্যহিক যোগা-যোগের ফলে ২১নং যোগেন দত্ত লেনের বর্তমান বাড়ির দোতলার উত্তর-দক্ষিণমুখো লম্বালম্বি ঘরের গানের আসরে প্রায়ই নজরুলের আগমনে গানের মেহ্‌ফিল বসত। এই আসরের মধ্যমণি ছিলেন ইন্দুবালা। কিন্তু নজরুল এলে তিনিই হয়ে উঠতেন সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। ঐ বাড়িতে হুটহাট করে চলে আসতেন ইন্দুবালার প্রিয় কাজীদা। ফরমাস করতেন চা এবং পান। হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন স্বয়ং কাজী নজরুল। কখনো ইন্দুবালা গাইতেন, কখনো নজরুল অথবা তাঁর সঙ্গী গায়কের দল। আবার কখনো কখনো ওই ঘরে বসেই আপন মনে গান লিখে নজরুল তারপর সঙ্গে সঙ্গে তাতে সুর দিয়ে হারমোনিয়ামে তুলে সস্নেহে ইন্দুবালাকে হেসে বলতেন, 'কেমন লাগছে সুরটা?' এখনো ইন্দুবালার মনে পড়ে অতীতের এমনি এক সন্ধ্যার আসরে কাজীদা তাঁকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে তাঁরই বাড়িতে বসে শিখিয়েছিলেন—বউ কথা কও/বউ কথা কও। আনন্দে, উচ্ছ্বাসে, অভিমানে উচ্ছলতায় ঘেরা সেই সব জলসার দিন-রাত্রি আজও তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

গ্রামাফোন কোম্পানীতে নজরুল ইন্দুবালাকে বহু গান শিখিয়েছেন। অবশ্য তাঁর শেখানো সব গানই রেকর্ডে বানীবদ্ধ করা হয়নি বা করা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নজরুলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রায় পঁচিশটি গানের

রেকর্ড হয়েছিল যার মধ্যে দুটি বাদে বাকী আটচল্লিশটি গানের কথা ও সুর স্বয়ং নজরুলের। অন্য দুটি গানের একটি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও অপরটি ধীরেন মুখোপাধ্যায়ের রচনা হলেও স্বয়ং নজরুল ইসলামই ইন্দুবালার গাওয়া ওই গান দুটিতেও সুর দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে ইন্দুবালার গাওয়া এই গানগুলির একটি তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

বস্তুতঃ সে সময় ইন্দুবালার কাছে নজরুলের গানের যে সব বৈশিষ্ট্য নজরে এসেছিল তা হল নজরুলের গানে ঠুংরীর একটি বিশেষ আকাঙ্খিত ঢঙ এবং সেই সঙ্গে নজরুলের গানের লয়দারী। হিন্দী গানের ভাঙা সুরকেও কবি চমৎকার ভাবে তাঁর রচিত বাংলা গানের সঙ্গে জুড়ে দিতেন। ফলে ইন্দুবালার মত প্রতিভাময়ী শিল্পী যাঁরা খেয়াল ও ঠুংরী গানের আসর থেকে বাংলা গানের আসরে পরে এসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে এই ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এছাড়া কাজী সাহেব গজলে শায়র'এর ঢঙে সুর রচনা করে সেই পর্বে শ্রোতাদের এবং ইন্দুবালার ন্যায় সুরেলা অথচ তেজী কণ্ঠের গায়িকাদের কাছে অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে উঠে ছিলেন। বিশেষ করে ইন্দুবালাকে নজরুলের গানের সুরের বৈচিত্র্যই অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে বলা যায়। কেননা, এত সুরের বৈচিত্র্য এবং আকর্ষণ সমকালীন অন্যান্য সুরকারের মধ্যে ইন্দুবালার মত গায়িকারা পেতেন না।

নজরুলের কাছে ইন্দুবালা বেশ কিছু ভজন জাতীয় গানও শিখেছিলেন। যেমন—'হে বিধাতা' ও 'ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরায় দ্বার ছেড়ে দাও দ্বারী'। নজরুলের হোলির গান গেয়েও অসম্ভব তৃপ্তি পেয়েছেন ইন্দুবালা। এ ধরনের যে সব গান তিনি নজরুলের কাছে শিখে রেকর্ড করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য দুটি গান হল, 'আয় গোপিনী খেলবি হোলী' এবং 'আজি নন্দদুলালের সাথে।' এমন কি বেনারসের গায়িকাদের গাওয়া প্রচলিত কাজরীর ঢঙে নজরুল তাঁকে বাংলায় কাজরী গান 'কাজরী গাহিয়া চল গোপ ললনা' শিখিয়ে তা রেকর্ড করিয়েছিলেন।

নজরুলের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি 'গান দূর দ্বীপবাসিনী / চিনি তোমারে চিনি' গানটি রচনার পেছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে যা অনেকেই জানেন না। প্রায় বছর পঞ্চাশেক আগে ইন্দুবালা এইচ, এম, ভি রেকর্ড কোম্পানী

থেকে একটি হিন্দী গানের রেকর্ড (ভজন N 6395) বের করেছিলেন যার প্রথম কটি কলি ছিল নিম্নরূপ :

শ্যাম গিরিধারী তো সে ক্যায়সে মিলু
তেরি ফুরকত মে তড়প বহি হুঁ
ফুকত হ্যায় তন-মন ॥

রেকর্ডটি প্রকাশের পর সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই জনপ্রিয়তার মূলে ছিল এর সুরের মধ্যে মিশরীয় সুরের প্রাধান্য যা শ্রোতাদের কাছে ছিল ভিন্নতর এক অভিজ্ঞতা। উপরন্তু এর মিউজিকের উৎকর্ষতা এবং জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে কিছুকাল পরেই 'আহ্ মজলুমান্' নামে একটি উর্দ্দু ছায়াচিত্রে গানটি ইন্দুবালাকে দিয়ে উর্দ্দু ভাষায় সেই সুরে তা গাওয়ানো হয়। উর্দ্দু ভাষায় গানটি ছিল এ রকম :—

গমকী কাহানী মওলা কিস্‌সে ম্যায় কহুঁ।
দুখকে ভমরমে আন ফসিহুঁ লাগেনা মেরা মন ॥
তেরা দামন থাম কে মওলা কহুঁ ম্যায় দুখ সুখ সে অপনা,
গম কি সারি করত হুঁ জাবি, দেখতে হুঁ সায়ে রাহ তুমহারী,
তুমহারে বিনা ম্যায় তলফ রহি হুঁ উঠা দো চিলমন ॥

যথারীতি ছায়াচিত্রেও গানটি সুরের আকর্ষণে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নজরুলও গানটির সুরে আকর্ষণ বোধ করেন। তিনি গানটির সুর ও পর্দাকে অপরিবর্তিত রেখে বাংলায় গানটিকে বেঁধে ফেলেন এবং সেকালের গায়িকা অনিমা বাদলকে দিয়ে রেকর্ড করান। গানটি বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে হল, দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি।

ইন্দুবালা প্রথম নজরুলের কাছে যে দুটি গান শিখে রেকর্ডে গেয়েছিলেন আগেই বলা হয়েছে তা হল 'রুমু ঝুমু রুমু ঝুম' ও 'চেয়োনা সুনয়না আর'

গ্রামাফোন কোম্পানীতে বসে অধিকাংশ সময় গান রচনা বা সুর দেবার কাজেই নজরুলকে ব্যস্ত থাকতে হত। সুরটা পছন্দ হয়ে যাবার পর গানটি তিনি গ্রামাফোন কোম্পানীর ট্রেনিং ঘরে বসেই সবাইকে শোনাতেন। সেকালের অধিকাংশ শিল্পীর মত ইন্দুবালাও সেখানে উপস্থিত থাকতেন। কোনো কোনো গানের সুর উপস্থিত শিল্পীদের এত পছন্দ হয়ে যেত যে সেটি রেকর্ডে কে গাইবেন তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। সম্ভবতঃ এখনকার শিল্পীদের পেশাদারী সচেতনতা সেকালে ততখানি তীব্র ছিল না। তাই তখনকার শিল্পীরা অনেকরকম গান শুনতেন, গাইতেন, পছন্দ করবার সময় পেতেন।

(রেকর্ড নং P 11661)। গান দুটি ধীরেন দাসের নির্দেশনায় তিনি রেকর্ড করেছিলেন।

তাঁর মতে—, সেই সময় আমার মতই অন্যান্য যাঁরা কাজীদার গান গেয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁরা হলেন—আঙ্গুরবালা, কমলা ঝরিয়া, হরিমতী মাণিকমালা, মিস লাইট, ধীরেন দাস প্রমুখ। এর মধ্যে আমি আর আঙ্গুর কাজীদার গান বেশি গেয়েছি বলে আমার মনে পড়ছে।

* * * *

ইন্দুবালা গ্রামাফোনে এসেছিলেন প্রথম ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। আর রেডিওতে যোগ দিলেন কণ্ঠশিল্পী হিসেবে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। ঐ বছর প্রথম কলকাতায় রেডিও কেন্দ্রটি চালু হয়। যে দিন থেকে রেডিও কলকাতা কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচারিত হল তার পরের দিনই ইন্দুবালাকে আমন্ত্রণ জানান হল গান গাইবার জন্যে। রেডিওতে প্রথম গাইবার অভিজ্ঞতাটি চমৎকার বলেছেন ইন্দুবালা। তাঁর স্মৃতি অনুযায়ী, সে প্রায় ১৯২৬-২৭ সালের কথা। রেডিও শুরু হবার দ্বিতীয় দিনেই আমি গান গেয়েছিলাম। সেদিন কি পাগলামিই না করেছিলাম। রেডিওয় যাব, গান গাইব ; ভাবলাম, খুব বুঝি সেজে গুজে যেতে হবে। খুব করে সাজলাম। রেডিও থেকে গাড়ী এসে নিয়ে গেল। গাড়ী থেকে নাবতেই নৃপেনদার একেবারে মুখোমুখি। আমার সাজের ঘটা দেখে নৃপেন দা হো-হো করে হেসে বললেন, 'ওরে ইন্দু সেজে গুজে মুজরো করতে এসেছে'। নৃপেনদার ঐ ছিল ধারা। কথায় কথায় রসিকতা করতেন। প্রথম দিন খুব ভয়ে ভয়েই গাইলাম। কোন্ বাতি জ্বললে শুরু করতে হবে, কোন্ বাতির আলোয় থামতে হবে, অত ভজকট মনে রেখে গান গাইতে একটু অস্বস্তি হয়েছিল বই কি। তবে ফিরে এসে পাড়াপড়শীর মুখে খবর পেলাম আমার গান নাকি খুব উতরে গেছে। প্রথম দিনের প্রোগ্রাম করে কোন পয়সা নিইনি। পরে অবশ্য রেডিও অফিস পয়সা দিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম মাসে ঘন ঘন প্রোগ্রাম আসত। রেট ছিল দশ টাকা। বছর দুই চলার পর রেডিওতে প্রোগ্রাম করা ছেড়ে দিলাম। কারণ এতে আমার মুজরোর ক্ষতি হত। রেডিওতে প্রচারের বিরাট সুযোগের চেয়ে মুজরোর টাকার পরিমাণ আমার কাছে অনেক

লোভনীয় মনে হত। তাই নিজেই খানিকটা আলসেমি করে রেডিওর সঙ্গে সম্পর্কে ঢিলে দিলাম। পরে শ্রোতাদের অবিরত তাগাদা আর ফোন ধরতে ধরতে জ্বালাতন পোড়াতন হয়ে আবার রেডিওয় গান গাওয়া শুরু করি। মাসে চারদিন করে প্রোগ্রাম পেতে লাগলাম। রেট এক একদিন এক-এক রকম—প্রথম দিন সাড়ে বারো টাকা, দ্বিতীয় দিনে পনেরো টাকা, তৃতীয় দিনে বাইশ টাকা আর শেষ দিনে সাতাশ টাকা। বছর বছর দু-তিন এভাবে চলতে চলতে মাসে তিন দিন করে প্রোগ্রাম হল। রেট—পনেরো, বাইশ,, সাতাশ। তার পর হল মাসে দুদিন। দিন-পিছু তিরিশ টাকা। শেষে একদিন—৪৫ টাকা। পরে প্রোগ্রাম আরও কমল। বছরে এগারোটা। পঞ্চাশ টাকা করে রেট হল। এই পঞ্চাশের গাঁট পেরোতে আরও বেশ কিছুদিন কাটল। বছরে যখন একটা করে প্রোগ্রাম ঠিক হল, তখন থেকে ৭৫ টাকা হিসেবে পেতাম।

ইন্দুবালার জীবনে রেডিওর সঙ্গে যোগাযোগ দীর্ঘকাল বজায় ছিল। ১৯২৬ খ্রীঃ সুরু করে অর্থাৎ রেডিও কলকাতা চালু হবার পর থেকেই প্রায় পঞ্চাশ বছর তিনি নিয়মিত গান গেয়ে এসেছেন। সত্তর বছর বয়স হবার পর থেকেই স্বেচ্ছায় আস্তে আস্তে রেডিও প্রোগ্রাম থেকে তিনি সরে আসেন। অবশ্য তার পরেও দু' এক বার তাঁকে রেডিওতে যেতে হয়েছে। কখনো গান গাইতে, কখনো বা স্মৃতিকথনের জন্যে। তাই তিনি বলেন, রেডিও অফিস আমার সম্পর্কে অবিচার করেন নি। কলকাতার বাইরেও অনেক ষ্টেশনে আমায় তারা ডেকে নিয়ে গেছেন। যেমন দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই। কলকাতা স্টেশন থেকে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আমার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তবে আমি নিজেই তাঁদের ডাকে সাড়া দিইনি। কারণটা আর কিছু নয়, শরীরে আমি অপটু হয়ে পড়েছি। তা ছাড়া পুরানো দিনের মানুষগুলো সব চলে গেছে বলে আর তেমন উৎসাহ পাইনা। সেই নৃপেন-বাবু নেই, রাইবাবু নেই। নেই সেই সদালাপী সাহেব স্টেপলটন। আর আজ নেই সেই বিমান দাত। রেডিওতে সব ধরণের গানই গেয়েছি। খেয়াল থেকে শুরু করে শ্যামাসঙ্গীত কিছুই বাদ যায়নি।

ইন্দুবালার মত শিল্পীদের সবচেয়ে বড় গুণ এই যে তাঁরা সব রকমের

গানই অবলীলায় যথাযথ ভাবে পরিবেশন করতে পারতেন এবং আসলে করতেনও তাই। নিষ্ঠা, চর্চা ও অধ্যবসায়ের ফলে তাঁরা এই ব্যাপারে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকাল এমনটি একেবারেই দুর্লভ বলা চলে।

কলকাতা কেন্দ্রের গায়িকা হিসেবে ইন্দুবালার খ্যাতি তখন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে তিরিশের দশকটি ইন্দুবালাকে জীবনের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়। এই সময় সারা ভারতবর্ষ থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসে। রেডিওতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সাবেকী Indian State Broadcasting Service। Garstin, place, calcutta যা পরবর্তীকালে All India Radio তে রূপান্তরিত হয় সেখান থেকে তাঁকে দিল্লী কেন্দ্রে গাইবার জন্যে প্রায়ই আমন্ত্রণ পাঠানো হত। এরকম অসংখ্য পত্রের মধ্যে একটি এখানে তুলে দেওয়া হল।

'রেডিওর কথা বলতে বলতে একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। একদিন খুব বৃষ্টিতে ভিজে রেডিও অফিসে ঢুকেছি। বীরেনদার (বীরেন ভদ্র) সঙ্গে দেখা। আমার অমন কাক-ভেজা চেহারা দেখে বীরেন দা একটা ফাঁকা ঘর দেখিয়ে কাপড়-জামা শুকিয়ে নিতে বললেন। আমি তো শুধু শায়া, বডিস পরে কাপড়-জামা খুলে হাওয়ায় মেলে দিয়েছি। ঘর বন্ধ। চেয়ারে চুপচাপ বসে আছি। হঠাৎ গীর্জের দিকের খোলা জানলার কাছে চোখ পড়তেই দেখি এক ধবধবে সাহেব স্থির দৃষ্টিতে জানলা ধরে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার চাউনি দেখে আমার কেমন ভয়ে গা শিরশিরিয়ে উঠল। আমি তো লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে ঘর খুলে 'সাহেব সাহেব' বলে চিৎকার করতে করতে এক ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। লোকজন ছুটে এল। আমার কথা শুনে সকলেই কিন্তু নির্বিকার রইলেন। শুধু বললেন, 'বুঝেছি'। কি যে ছাই বুঝলেন তা অবশ্য আমি বুঝলাম না। তবে একটু পরেই গান গাইবার ডাক আসাতে আর অত বোঝাবুঝির সময় পেলাম না। আসল খবর জানলাম আর কিছুদিন পরে। সেদিনও গেছি রেডিও অফিসে। বাথরুমে ঢুকেছি, দেখি সেই সাহেব বেসিনে মুখ ধুচ্ছে। আমি কাল বিলম্ব না করে তরতরিয়ে নীচে নেমে এলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে যাঁকে পেলাম তাঁকেই ঘটনাটা বললাম। যথারীতি একই জবাব পেলাম, 'বুঝেছি'। সেদিন কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। বললাম, 'কি বুঝেছেন তা না বললে আমি আর রেডিওর গান গাইতে আসছি না'। জবাবে যা শুনলাম তাতে তো আমার রক্ত হিম হবার যোগাড়। শুনলাম ওই সাহেব নাকি ভূত। উনি খেয়াল খুশীমত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। অনেকেই ওনাকে দেখেছেন, তবে উনি কখনও কারোর কোন ক্ষতি করেন নি। পুরোনো দিনের লোকজনকে জিগ্যেস করলে গার্স্টিন প্লেসের ওই ভূতের গল্প এখনও শুনতে পাওয়া যাবে।'

—[অতীত দিনের স্মৃতি—ইন্দুবালা]

Indian State Broadcasting Service
Calcutta Station

Telephone No. Regent 818 — 1, Garstin Place

Telegrams "Airvoyce" — Calcutta

Calcutta — **12 April,—1937**

In Reply please quote
Ref. No AI/1-114

INDIAN STATE
Seal
BROADCASTING SERVICE

Miss Indubala,
21, Jagen Dutta Lane,
Rambagan
Calcutta
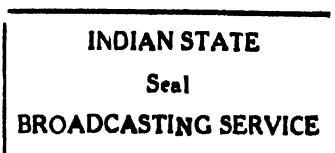
Dear Madam,

With referenee to our verbal conversation over the phone regarding your engagement in the Delhi Station of the All India Radio, I am glad to inform you that your engagements on the 2nd 4th, 15th and 17th May 1937 have been confirmed by the Station Director, Delhi and a letter to that effect is attached here to. I am also attaching herewith a contract form for your signature, which please filled in and forward to the address of the station Director, Delhi, at your earliest convenience.

Thanking you
Yours faithfully,
Sd/—
Director of Programmes

Encls : Contract form.
Copy of the letter

*** Indian State Broadcasting Service ছাপাটির ওপরে কালির দাগ এবং ওপরে All India Radioর রবার স্ট্যাম্প ছিল।**

রেডিওতে ইন্দুবালা নানাধরনের গান সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছিলেন। সেকালের সমস্ত পত্র পত্রিকায় ইন্দুবালার প্রতিটি রেডিও প্রোগ্রাম সম্পর্কে প্রশংসা সূচক মন্তব্য প্রকাশিত হত।

এ সম্পর্কে শিশির, বাঙলা, ভগ্নদূত, দুন্দুভি, দীপক প্রভৃতি পত্রিকায় বহু মতামত পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ 'দীপালী' পত্রিকার একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা হল।

…এবারের বেতার-আসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ শ্রীমতী ইন্দুবালার আবির্ভাব। আমরা দুই মঙ্গলবারে দু'দিনই তাঁর গান শুনলাম। শুনে মুগ্ধ হলাম। ইন্দুবালা কলকাতা সহরের বড় গায়িকা। কিন্তু বড় গায়ক বা গায়িকার নাম শুনলেই আমরা বড় চিন্তিত হয়ে পড়ি—ইন্দুবালা আমাদের সে চিন্তা দূর করেছেন। বেতার যন্ত্রে সফলকাম হবার যাবতীয় কৌশল তাঁর জানা আছে। যথাস্থানে আমরা তাঁর গানের পরিচয় দিব। ….শ্রীমতী ইন্দুবালা দুটি বাংলা গান গেয়েছিলেন। প্রথমটি বাংলা ঢঙের টপ্পা, দ্বিতীয়টি হিন্দুস্থানী ঢঙের দাদরা। দুটি গানেই তাল ছিল। আলাপ ছিল—কিন্তু কোথাও একটি কথা সে আলাপের চাপে মারা পড়েনি।

(দীপালী শনিবার ১৩ই আষাঢ় ১৩৩৭)

রেডিওতে বাংলা হিন্দী ও উর্দু গজলই বেশী গাইতেন ইন্দুবালা। নজরুলের গান, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত ও পুরাতনী গানের পাশাপাশি হিন্দী ভজন বা উর্দু গজল তিনি স্বচ্ছন্দে গাইতে পারতেন বলে বেতারে তাঁর গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া রেকর্ডে যে সব গান জনপ্রিয় ছিল সেগুলোও প্রায়ই বেতারে তাঁকে গাইত হত। রেডিওতে অনেক সময় ইন্দুবালা 'বেতার নাটকে'ও অংশগ্রহণ করতেন। যেমন একদা তিনি রেডিওতে বরদাপ্রসন্ন দাশ-গুপ্ত রচিত 'সত্যভামা' নাটকে 'মধুকর' চরিত্রে গান গেয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। এই সঙ্গে যে সমস্ত গান বেতারে তাঁকে প্রায়ই পরিবেশন করতে হত সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান হল,—এত সুন্দর করে, কালী জপরে মন, দেখা হলে এই অবহেলায়, রূপ দেখে সখা, ফাগুন রাতে,

কত আরাধনা করে পেয়েছি তোমারে (প্রাচীন এবং বিলুপ্তপ্রায় পুরাতনী)। দারুণ কপট, বনের পথ ভোলা কানন গিরি সিন্ধু পথে, শোন্ তোরা ঐ কালো জলে, ইত্যাদি। এইপ্রসঙ্গে আরও কয়েক 'শ গানের কথা উল্লেখ করা যায়।

রেডিও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চিরকালই অত্যন্ত মধুর ছিল বলা যায়। যার ফলে বিভিন্ন সময়ে ইন্দুবালাকে উল্লেখযোগ্য নাটকের অনুষ্ঠানে তাঁর অভিনয় এবং গান শোনবার জন্যে কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ জানাতেন। কর্তৃপক্ষ যে তাঁকে সৌজন্যের খাতিরে অনুপস্থিত থাকলে পত্র দ্বারা জানিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে বহুবার। এমন কি দেশ স্বাধীন হবার পরও ষ্টেশন ডিরেক্টররা ব্যক্তিগত ভাবে শিল্পী ইন্দুবালাকে কেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তার প্রমাণ এই পত্রটি :

ALL INDIA RADIO

Tel :—"AIRVOICE"

Tel : C 6980. 6981. 6982 — 1, GARSTINS PLACE

Ref : No. PF/SD/224 — Calcutta. 10th. **Feb, 1948**

Dear Madam,

Thank you very much indeed for your kind invitation at the charity performance of "Balidan" staged at the Minerva Theatre on the 9th February, 1948. It was good of you to have thought of us and we should have liked to attend had we not been prevented from doing so owing to illness in the family.

Thanking you again and with kind regards,

I remain

Your sincerly,

Sd/—

Sm. Indubala,
21, Jogen Dutta Lane,
CALCUTTA

দিল্লীতে ১৯৩৭ খ্রীঃ রেডিওতে গাইতে গিয়ে চার দিন প্রোগ্রাম করে পেয়েছিলেন মোট ১২৫ টাকা। এবং এই সব প্রোগ্রাম তখন একই সঙ্গে দুটো ট্রান্সমিশনে প্রচারিত হত। এর অর্থ হল সেকালে খ্যাতনামা শিল্পীদের অনুষ্ঠানকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা। ইন্দুবালাকে তাই জানান হল, You will be required to sing in two transmissions on each date.

তিরিশের দশকের গোড়া থেকেই গ্রামাফোনে ইন্দুবালার রেকর্ডের বিক্রী অসম্ভব ভাবে বেড়ে যায়। সারা ভারতবর্ষে ইন্দুবালার গাওয়া হিন্দী, উর্দু গান লক্ষ লক্ষ শ্রোতার মনকে জয় করে রাখে। তাঁর রেকর্ড থেকেও গ্রামাফোন কোম্পানীর লাভ দারুণ ভাবে বেড়ে যায়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি তাঁর হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী এবং তামিল গানের রেকর্ডের সাফল্যে রেকর্ড কোম্পানী তাঁকে স্বীকৃতি জানিয়ে একটি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন :

The Gramophone Company Ltd.

(Incorporated in England)

Telegrams & Cables : "JASSOLENT", DUM DUM

Telephone : REGENT 800, 801 & 802

CODES
A B. C 5TH & 6TH EDITIONS
LIEDERS, BENTLEYS
WESTERN UNION

HEAD OFFICE & FACTORY IN INDIA
33, JESSORE ROAD
DUMDUM

In your reply please refer to

21st May 1936
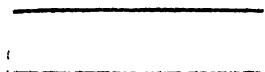
TO WHOM IT MAY CONCERN.

This is to certify that Miss Indubala is an artiste of high reputation and she has been making Gramophone records since the year 1920. She is the first Bengali female singer to sing

---

প্রথমে ১৯১৬ সাল থেকে এ্যামেচার হিসেবে এবং পরে ১৯২০ সাল থেকে ইন্দুবালা পেশাদার শিল্পী হিসেবে রেকর্ড করতে সুরু করেন।

Hindustani, Panjabi and Tamil songs on records, which are greatly enjoyed by all classes of customers. This certificate is given to her as a test of her ability in Indian music.

THE GRAMOPHONE COY LTD.
Sd/- A Wahed
Recording Representative

ইন্দুবালার গানে মুগ্ধ ছিলেন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তের মানুষ। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা নানাভাবে তাঁকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পত্রও দিয়েছেন বহুবার। এঁদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সাধারণ শ্রোতা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণী শিল্পীর দল। সেকালে সর্বভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাদ্রাজের কীর্তনাচার্য্য সি, আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। তিনি বহুবার ইন্দুবালাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। একটি চিঠিতে একবার তিনি লিখেছিলেন :

Ramyana Vilas
KEERTANACHARYA 28 Nacchilappa Chetty Street
C. R. SRINIVASA AYYANGAR. B. A. Mylapore
Madras. 30th December 1936

I hold as no ordinary privilege and pleasure to have an opportunity of expressing what I feel about the music of Miss. Indu Bala Devi of Calcutta. She has been with us long before, this through the medium of the gramophone and now it is given to us to hear her in person and modify and go back upon our opinion of her ; it is but poor justice that the gramophone has done her and her music. She contrasts most favourable with the other artists of Hindustan that have spoken to us through the machine in person, in that she stands above them in my opinion in every way. In all these sixty years of my musical life, I have never heard a voice like that. Power, force, volume, pitch, flexi-

bility, and adaptability and reach these and more characterise it. Her intonation, her expression and rendering illuminate her subject ; it is so plain, so clear, so distinct and so convincing. Her forte is piece singing ; She does not follow the line of the great professionale of her land who confine themselves mostly to the intellectual section of music and devote very little attention to the matter except as a nail to hang their brain work upon. She sings only what she herself understands, appreciates, feels and enjoys ; and she succeeds marvellously in making her audience enjoy like herself even those who do not know the language in which the matter is put. What forms the outstanding feature about her is that she is a devotee above all ; devotion thrills through her music : and she gives a just proportion to it and music and matter ; and I noted with pleasure and wonder that Indu Bala Devi when she sings is utterly and emphatically different from the Miss Indu Bala Devi at other times. She is inspired, illuminated and transfigured ; she lives in her music and makes it a living thing. She is the first and last exponent of her particular line of music and takes her place along with those to whom it was given to be so great.

C. R. Srinivasa ayyangar
(C. R. Srinivasa Jyengar)

সমসাময়িক কালের গায়ক প্রখ্যাত শিল্পী অন্ধ গায়ক কৃষ্ণ চন্দ্র দে নিজে অত বড় গুণী শিল্পী হয়েও ইন্দুবালার প্রশংসায় প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ। একসঙ্গে বহুবার ইন্দুবালার সঙ্গে তিনি অভিনয় করেছেন পেশাদারী মঞ্চে, এখানে সেখানে বহু জায়গায়। তিনিও একসময় উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন :—

KRISHNA CHANDRA DEY — 9 Madan Ghosh Lane
Calcutta, 6th April 1936

It is to Certify that Miss Indubala has earned a good fame in

the domain of microphone. She is one of the most celebrated artist in the His Masters Voice Company and her activities on the face of the screen is also remarkably successful. She has also an exclusive Knowledge in Indian classical music. I have much pleasure to introduce her any where.

Krishna Ch Dey (Blind Singer)
By the pen of P. C. Dey.

প্রায় তিন দশক ধরে বাংলার মহিলা শিল্পীদের ক্ষেত্রে একটানা প্রাধান্যের শীর্ষে অধিষ্ঠিতা ছিলেন ইন্দুবালা। তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন অনুজ লোকপ্রিয় শিল্পী আব্বাসউদ্দীন। নজরুলের কাছে ইন্দুবালার মত ইনিও দীর্ঘকাল গ্রামাফোন কোম্পানীতে এসে ট্রেণিং নিয়েছিলেন। বয়সে কনিষ্ঠ এই লোকসঙ্গীত শিল্পীও ইন্দুবালার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেন নি। ১লা মে ১৯৩৪ খ্রীঃ তিনি ইন্দুবালাকে প্রদত্ত শ্রদ্ধার্ঘপত্রে লিখেছিলেন—

সঙ্গীত-কলা-বিদুষী শ্রীমতি ইন্দুবালার
করকমলে :—

আজ সারা ভারতের আকাশে বাতাসে তোমার সুরের ঝঙ্কার ছড়িয়ে পড়েছে। সুরের বৈচিত্র্য, কণ্ঠের মাধুর্য্য এবং সঙ্গীতে রসসৃষ্টি করবার যে তোমার কতখানি অধিকার তা' তোমার সজীব-সঙ্গীত না শুনেও গ্রামোফন রেকর্ডের ভিতর দিয়ে পরখ হ'য়ে গেছে—মানুষের। * * * *

ভগবানের কাছে নিয়ত প্রার্থনা—তোমার জীবন ফুলের মত পবিত্র, সুন্দর ও মধুময় হোক ; জন্ম জন্ম ব্যাপী তোমার কণ্ঠে সপ্তসুর বিরাজ করুক। * * *

সঙ্গীতে তোমার দান চিরকাল ভারতবাসীর তথা বঙ্গ-বাসীর চির গৌরবের বস্তু হ'য়ে থাকবে। * *

কলিকাতা
১লা মে ১৯৩৪

তোমার গুণমুগ্ধ
আব্বাসউদ্দিন

তিরিশের দশকের শুরুতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইন্দুবালার কাছে আমন্ত্রণ আসতে থাকে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের প্রায় প্রধান সব শহর থেকে উদ্যোক্তারা সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন এবং তাঁকে গাইবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হত। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গীত সম্মেলনেও কর্তৃপক্ষ তাকে নিয়মিত আমন্ত্রণ জানাতেন। ইন্দুবালার মত যশস্বিনী শিল্পীদের অনেক সময় বিভিন্ন গুণীব্যক্তিদের মারফৎই যোগাযোগ করা হত। উদ্দেশ্য : ইন্দুবালার আগমনকে সুনিশ্চিত করা। যেমন Andhra Musical Conference কর্তৃপক্ষের অনুরোধে একবার ১৯৩২ খ্রীঃ সরোজিনী নাইডুর ছোট ভাই কবি নাট্যকার সঙ্গীত রসিক ও গায়ক হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ও 'সীমাবদ্ধ' ছবিতে সম্প্রতি চমৎকার অভিনয় করেছেন) ইন্দুবালাকে লিখেছিলেন,

"আগমণ"
Courtallam
Via Tenkasi
1st July 1932

Dear Miss Indubala,

Your letter to the Secretary of the Andhra Musical Conference has been directed to me for advice. Since it is very essential that our Northern Indian Music be represented at the Conference (which will afford our musicians both of the North and South of establishing a good and useful National Contact), I request you, in all humility and regard, to participate in it on the following terms, which, if approved by you, kindly communicate acceptance immediately to the Secretary at Rajahmundry. The organisers are willing to offer you Rs. 400/- for two performances (including expenses of travel, board and lodging or Rs. 250/- for one performance (excluding expenses of travel board and lodging). This is as far as the offer can be stretched and if you

believe that organisers look upon your contribution to the Conference as very great work done for our Nation's music, and the offer made to you by the conference comparatively very poor, included, - I am sure you will consider accepting the invitation

I have been a great admirer of your Gramaphone Records, and recognise in you a fine artist with a beautiful soul. I shall always look forward to your new records from time to time, and, if opportunity allows, to hear you singing in person.

I am myself recording on the Columbia this month, and trust you will hear some of my music (though poor) when the records appear—remembering, of course, that I am an amateur, like you, —my line being drama-writing and poetry.

With kind regards
Yours V. truly
Harindranath Chattopadhyaya.

P. S.

Dilip Roy is a good friend of mine and we were together in England in 1920.

H. C.

এই সময়ে ইন্দুবালা মুজরো গানের আসরে ছিলেন কলকাতা তথা ভারতবর্ষের সঙ্গীত রসিক মহলের প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়িকা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের রাজা মহারাজা, জমিদার, বনেদী পরিবার, ইত্যাদি থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসতে থাকে। সঙ্গীত জীবনে অজস্র অনুষ্ঠানে তিনি গেয়েছেন। তবু যে সব জায়গা থেকে ইন্দুবালার গানের জন্য নিয়মিত আমন্ত্রণ আসত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি নাম হল :—(১) আর, ডি, গুপ্ত (Shabjahanpur), (২) ক্যাপ্টেন এস. সি. বসু (কলকাতা ', (৩) রায় দেবেন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুর (পাকুড়), (৪) কে. সুব্রাহ্মণ্যম্ (Madras), (৫) জনি সাহেব (Bangalore), (৬) প্রাইভেট সেক্রেটারী (Nawab of Palanpur), (৭) সিয়োলী এ. জি. স্বামী (Nagpur) (৮)

হুসেন খাঁ (সাব) Bangalore, (৯) ভি ব্যকিরাজু (Rajahmundi), (১০) দুর্গাপ্রসাদ (Balarampur, Gonda, Oudh), (১১) এস. এস. মনি (Trivandrum), (১২) ডি. পি. ভার্গব (Dholpur), (১৩) এস. লোকনাথ. মুদালিয়ার (Madras), (১৪) কাকি প্রভাকর রাও (Rajah mundri), (১৫) এন্. দক্ষিণামূর্ত্তি (Kumbakoram), (১৬) আই. শরিফ (Hyderabad), (১৭) শেখ মহম্মদ মিঞাঁ (Kathiawar), (১৮) বি. দত্তগুপ্ত ও আর. ডি. গুপ্ত (শাহজাহানপুর), (১৯) এম. এস স্বামী (Vizagapattam), (২০) এম. সিরাজ (Hyderadad), (২১) এম. এ শেখ (Kathiawar), (২২) পর্বত সিং (Hathiawar, Rajputana), (২৩) মির্জা আলতাফ হোসেন (Mysore) (২৪) পূরণ চন্দ এণ্ড সন্স (Mussorie), (২৫) কে. নরসিম আয়েঙ্গার (Mysore), (২৬) মিঃ টি থাম্বুচেটী O. B. E হুজুর সেক্রেটারী (Mysore), (২৭) The Cabinet General A. G. C (Qoembatore), (২৮) অমরনাথ চ্যাটার্জী (Ajmeer), (২৯) ব্রজগোপাল দাস (সনাতন মহল, সজীমহল, ঢাকা) ইত্যাদি।

বিভিন্ন সময়ে ইন্দুবালা এঁদের আমন্ত্রণে এইসব জায়গায় গিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করে এসেছেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হিজ মাষ্টার ভয়েস কোম্পানীর ডিলার্স, শিল্পী গীতিকার, ট্রেণার ও যন্ত্র শিল্পীদের পক্ষ থেকে তাঁকে কলকাতার শ্রী সিনেমা হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত করা হয়। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিদের দ্বারা সম্বর্ধিত ঐ সভায় আমন্ত্রণ-পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

HIS MASTER'S VOICE

Dealers, Artistes, Composers, Trainers, Instrumentalists

present their respectful compliments to

Miss Indubala

and request the pleasure of her company at 'Sree' Cinema House. 138-1, Cornwallish Street, Calcutta, at 9 AM on Tuesday,

the 24th inst. for giving a hearty farewell to Mr. B. C. Bhattacharya, Recording Representative and City Traveller, The Gramophone Company Ltd, on his retirement.

Calcutta
The 22nd May, 1936

K. C. Dey (Artiste)
R. L Saha (of Messers L C. Saha Ltd.)
B. Sen (of Mesers N. B. Sen & Brs)
C. C. Saha (of Messers M.L. Shaw Ltd & C. C. Saha Ltd.)
KAZI NAZRUAL ISLAM (Poet)

এই সম্বর্ধনার মাস ছয়েক আগে (ডিসেম্বর ১৯৩৫) ইন্দুবালা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করে বিভিন্ন স্থানে বিপুল সম্মান, অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর এই সাফল্যের সংবাদ সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলায় এসে পৌঁছয়। বিশেষ করে মাদ্রাজে পৌঁছেই তিনি বিপুলভাবে মাদ্রাজ ষ্টেশনে সম্বর্ধিত হন। তাঁর সাফল্যের সংবাদ প্রকাশ করে 'বর্ত্তমান' পত্রিকায় ১৯শে মাঘ ১৩৪২ রবিবার লেখা হয়,

মাদ্রাজে
শ্রীমতী ইন্দুবালা।

মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত কে, সুব্রাহ্মন্যম্ এর সাদর আমন্ত্রণ ও অনুরোধে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা শ্রীমতী ইন্দুবালা মাদ্রাজ গিয়াছিলেন—গত ২৫শে ডিসেম্বর, বুধবার। সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র ইন্দুবালাকে ষ্টেশনেই বিস্তর মালা, চন্দন ও ফুলের তোড়া দিয়া অভ্যর্থনা করা হ'য়েছিলো শুনে আমরা সত্যই অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়েছি।

২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে যথাক্রমে শনি এবং রবিবার মাদ্রাজের বিখ্যাত 'কংগ্রেস্ হাউস্' এর নিকটস্থ "ওয়েষ্ট্ এণ্ড্ টকীজে" শ্রীমতী ইন্দুবালা গান গেয়েছিলেন।

প্রথম দিন প্রায় দুই ঘণ্টা গানের পর মাদ্রাজের মেয়র মহাশয় এক সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা ইন্দুবালার অজস্র প্রশংসা ক'রে একটি চমৎকার স্বর্ণ পদক পুরস্কার দিয়েছিলেন। তারপর শ্রীমতী বিশালাক্ষী ফুলের মালা ও গোলাপের

তোড়া উপহার দিয়ে ইন্দুবালার শুভ কামনা করলেন। শেষে "হিন্দু" পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় ইন্দুবালার গুণ কীর্ত্তন ক'রে ব'ল্লেন যে তাঁর গানে শ্রোতারা সকলেই মুগ্ধ হ'য়েছে। অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় মাদ্রাজে গিয়ে তাঁদের আনন্দ দেবার জন্য ও কয়েকটি তামিল গান শোনাবার জন্য তিনি গায়িকাকে অনুরোধ ক'রেছিলেন।

রবিবার দিন প্রেক্ষাগৃহে অত্যন্ত ভীড় হ'য়েছিলো, স্থান ও প্রবেশ পত্রের অভাবে অনেক দর্শক দুঃখিত হ'য়ে বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন। বিদেশে বাঙ্গালী গায়িকা যে সম্মান অর্জ্জন ক'রেছেন তাতে গর্ব্বিত হবার কারণ আছে। ঈশ্বর ইন্দুবালাকে শান্তিময় দীর্ঘজীবন দান করুন, আমরা নিয়ত তাঁর চরণে এই প্রার্থনা জানাই।

পাশাপাশি কলকাতার 'বাঙালী' পত্রিকাও ১৮ই মাঘ শনিবার ১৩৪২ বঙ্গাব্দে 'জয়যাত্রায় আজি যাও গো' শিরোনামায় লিখলেন, সুগায়িকা শ্রীমতী ইন্দুবালা দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করে সম্প্রতি ক'লকাতায় ফিরে এসেছেন। বিগত বড়দিনের সময় ইনি মাদ্রাজ গমন ক'রেছিলেন—সেখানকার জনৈক ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে। মাদ্রাজের বহু গন্যমান্য ব্যক্তি ফুলের মালা ও তোড়া ইত্যাদি নিয়ে ষ্টেশনে ইন্দুবালাকে বিরাট আড়ম্বরে অভ্যর্থনা ক'রেছিলেন। এইরূপ রাজোচিত সম্মানে ইন্দুবালাকে অভিনন্দিত করায় আমরা বাস্তবিকই খুসি হয়েছি। 'কংগ্রেস্ হাউস' এর নিকটস্থ—'ওয়েষ্ট এণ্ড টকীজে' দু'দিন গান গেয়ে ইনি শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছিলেন। প্রথম দিন মাদ্রাজের মেয়র মহাশয় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা গায়িকার গানের প্রশংসা ক'রে একটি সুদৃশ্য স্বর্ণ-পদক উপহার দিয়েছিলেন। তারপর "হিন্দু" ও "জাস্টিস" নামক দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকদ্বয় সুখ্যাতিপূর্ণ বক্তৃতায় ইন্দুবালাকে সম্মানিত করেছিলেন। কীর্ত্তনাচার্য্য C. R. Srinivasa Ayyengar এর কাছ থেকে শ্রীমতী ইন্দুবালা একটি সুদীর্ঘ প্রশংসাপত্র লাভ করেছেন। এঁর গান শোনবার জন্য প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের অত্যন্ত ভীড় হয়েছিলো, স্থানাভাবে অনেকেই নাকি ইন্দুবালার গান শোনা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বাঙ্গালোরেও এর গানের আসর বসেছিলো। সেখানকার শ্রোতারাও ইন্দুবালার গানে মুগ্ধ হ'য়েছেন। বিদেশে বাঙালী গায়িকার এইরূপ কৃতিত্ব

সত্যই আমাদের গৌরবের বিষয়। মাদ্রাজের বহু প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে ইন্দুবালার প্রশংসা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

শুনলাম কয়েকদিনের মধ্যেই পুনরায় ইনি নাকি হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও মাদ্রাজে যাবেন গান গাইতে। আধুনিক যুগে উচ্চশ্রেণীর গায়িকার মধ্যে শ্রীমতী ইন্দুবালা অন্যতমা, অতএব তাঁর সঙ্গীতে সকলেই যে পরিতুষ্ট হবেন তাতে আর সন্দেহ কি? আমরা কামনা করি—দেশ-বিদেশে এঁর সুনাম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হোক।

প্রকৃত পক্ষে ইন্দুবালা বড়দিনের প্রোগ্রামগুলি মাদ্রাজে সেরে তারপর সোজা জানুয়ারী মাসে হায়দরাবাদে চলে আসেন এবং বাঙ্গালোরে ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৩৬) শিবানন্দ থিয়েটারে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল বাঙ্গালোর সিটির সব কটি প্রধান পত্র-পত্রিকায়। যেমন The Daily Post ৩রা জানুয়ারী ১৯৩৬ সান্ধ্য সংস্করণে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে :—

Rare Opportunity for Music Lovers

Don't Miss to Hear Personally

MISS INDUBALA

(of Gramaphone Fame)

On Saturday, 4th January, 1936

At 6 P.M.

At the SIVANANDA THEATRE,

(Bangalore City)

Rates :—3.4, 2.4, 1.II, 1.2. 0.8 0. 0.3,11

INCLUDING TAX

মাদ্রাজের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা The Hindu পত্রিকা ইন্দুবালার প্রশংসায় সে সময় মেতে উঠেছিলেন। ইন্দুবালার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সাফল্য সংবাদ কলকাতায় রীতিমত আলোড়ন তুলেছিল। বাঙালী মাত্রেই তাঁর এই কৃতিত্বে অত্যন্ত গৌরবান্বিত ছিলেন। এখানকার পত্র-পত্রিকায় ইন্দুবালার সংবাদ তখন শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রকাশিত হত। কলকাতায়

প্রত্যাবর্ত্তনের পর The Amrita Bazar Patrika (Weekly Edition) Thursday, January 30, 1936 সংবাদে জানিয়েছিলেন।

A Brilliant Bengali Musician

Sm. Indubala a talented musician of the classical (Hindusthani) music in Bengal, who is by the way, already well-known to the lovers of Gramophone music has lately returned to Calcutta after an extensive music tour of the south India. She gave there a number of performances. In Madras, to refer to only one of her demostration, her subtle rendering of the pure music of North India elicited from all the admirable they so richly merited Kirtan and Bhajan are her forte. She has been awarded a gold medal by the Mayor of Madras and a certificate of efficiency by Mr. Srinivas Iyengar, a clever exponent of karnatic music, for her brilliant performance.

কলকাতায় ফেরার আগে তিনি বেশ কয়েক জায়গায় অনুষ্ঠান করে আসতে বাধ্য হন। শিবানন্দ থিয়েটারে যে অনুষ্ঠান তিনি ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩৬ তারিখে করেছিলেন সে সম্পর্কে বাঙ্গালোরের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে Hindu পত্রিকার সংবাদ দাতা লিখেছিলেন, Miss Indubala Devi of Calcutta gave a Hindustani musical concert last evening in the Sivananda Theatre in the presence of a large number of lovers of music. With her rich and melodious voice, she kept the audience spell-bound for more than three hours. Her rendering of Bhajans in particular was much appreciated. She gave a very good delineation of Hindusthani ragas like Tilang, Bahimpalas, Bhageswari, Lalit, Mand ane Peelu which was of a very high order.

[Miss Indubala at Bangalore, The Hindu,
Monday, January 6, 1936]

প্রথমবার মাদ্রাজে গিয়েই ইন্দুবালা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতাপিপাসু

আপামর জনসাধারণের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম শ্রেণীর সমস্ত পত্র-পত্রিকায় তাই ইন্দুবালার জীবনী প্রকাশিত হতে শুরু করল। তাঁকে সাদরে আহ্বান জানালেন মাদ্রাজের দৈনিক পত্রিকাগুলি। তাঁর জীবনীতে লেখা হল :

INDUBALA DEVI

A Brilliant Singer

Another brilliant exponent of the northern style of music who is now in Madras on a short visit is Miss Indubala Devi, well known to music lovers through her gramophone records—She gave two concerts at the West-End Talkies, one on the 28th and one on 29th instant. "C R. S." in the course of an appreciative review of the performaces writes :

The music of Indu Bala is a thing apart. I find nothing in the range of North Indian Music that I have heard in person and through the Gramophone, that I could place along with it. It differs too markedly from the music I have heard from singers like Rahimat Khan, Abdul Karim Khan, Allauddin Khan, Nasiruddin Khan, Sekruddin Khan and others.

These vocalists, and the many able instrumentalists from the north, show us the intellectual section of music to a large degree Their alapas, 'tans', and swara executions cover the whole field. They take it all at the opening words of a piece and make these words a clothes' peg to hang their creations on you have very little of the Sahitya element in it to understand and enjoy. We do not know what the music expresses nor apreciate the ability of the artiste to make the sound echo the sense. We have but a combination of sounds falling pleasantly on the ear.

On the other hand, Miss Indubala Devi combines in herself all the elements that go to make up good, real music. Pieces are,

with her, everything; and the music is so proportionately adjusted as to complement the Sahitya and round it off. She understands and feels and enjoys whatever she sings; and she tries her best (and successfully too) to speak to us heart to heart. Even those that know not the language in which the matter is cauched can not fail to catch the sense and follow it.

Her voice is the most wonderfull and perfect, I have even heard. In volume and pitch and reach the response it is unapproached. Her intonation, enunciation of letters, syllables, words, and phrases are clear and striking. She is in the front rank among living artistes.

(THE HINDU, Monday, December 30, 1935)

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ তথা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত রসিক জনের আগ্রহে বেশ কয়েক মাস ধরে ইন্দুবালাকে সঙ্গীতের আসরে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হয়। এই সময় অন্যান্য স্থানেও তাঁকে অনেকবার সঙ্গীত পরিবেশনের কাজে ছুটে যেতে হয়েছে। যোগাযোগের সুবিধা এবং সঙ্গীতের প্রয়োজনে তিনি মাদ্রাজে অস্থায়ীভাবে কিছুকাল বসবাসও করেছিলেন। তাঁর অস্থায়ী ঠিকানা ছিল Triplecane, Madras. অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হল ইন্দুবালার জনপ্রিয় গজল গানের সেই রেকর্ড 'হাঁস হাঁস কে জখম' ও 'হমে পরোয়া নহী' (N6686)। এরই মধ্যে এক ফাঁকে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে এসে গাইলেন তেসরা অক্টোবর ও বারোই অক্টোবর (১৯৩৬) তারিখে। রেকর্ড কোম্পানী গজল গানের রেকর্ডটি প্রকাশ করে বিজ্ঞাপন দিলেন:

Miss Indubala has recently concluded a very successful tour in south India and was the recipient of several medals and costly presents. Her latest triumph is on record N6686 on which she sings two Ghazals "HANS HANS KE ZAKHAM" and "HAMEN PARWA NAHIN".

The irrestible charm of her voice added to her perfection of style makes her records a work of art, and we are sure this record will be classed amongst her best.

ইতিপূর্বে জুলাই মাসে মহীশূরের মহারাজার কাছ থেকে ডাক এল ইন্দুবালার। ইন্দুবালার ছবি বড় করে ছাপিয়ে 'দীপালী' পত্রিকায় (Vol. VIII, No 31) ৩১শে জুলাই ১৯৩৬ খবর বেরোল, **On an invitation from H. M. the Maharaja of Mysore Indubala gave vocal music performance which was highly appreciated by the Maharaja & the State officials.** এই অনুষ্ঠানের সাফল্যে মহীশূরের সঙ্গে ইন্দুবালার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হল। প্রায়ই ইন্দুবালা তখন মহীশূর প্রাসাদে পত্র বিনিময় করতেন। মহীশূরের মহারাজার কাছ থেকে জুন মাসের চিঠিতে ইন্দুবালা জানতে পারলেন মহারাজার ইওরোপে যাওয়ার সংবাদ। চিঠির বয়ান ছিল এইরকম :—

No 2806 — The Palace
Government of — Bangalore, 23rd June 1936.
Mysore (Seal)

Madam,

Thanks for your letter. I regret very much not writing to you earlier but His Highness suddenly decided to visit Europe and so we have been kept so busy. As I told you personally it will give His Highness great pleasure to have you in his service as per terms I mentioned to you. Considering that we have other well known musician already in service, it is very much regretted that only a nominal allowance is offered and any time you make up your mind, please do not hesitate to let me know. Kindly remember that as per terms it will not be necessary for you to stay at Mysore but you could visit Mysore only once a year and that too for a few days.

Yours truly,
Sd/—Sadiq Z. Shah
Asst. Secretary to H. H,
the Maharaja of Mysore

Miss Indubala
C/o The Madras United Artiste Corporation
7 Bus Bad, Triplicane, Madras.

দরবারে ইন্দুবালার যোগদানের ব্যাপারে সম্ভবতঃ চুক্তি বিষয়ক কোনো আলোচনার ইঙ্গিত এই পত্রে উল্লেখিত হয়েছে। এবং ইন্দুবালা বোধহয় গোড়ায় দরবারের প্রদেয় চুক্তিতে সম্মতিদানের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিতা ছিলেন। তা সত্ত্বেও যেহেতু **it will give his Highness great pleasure to have you in his service** সেই কারণেই ইন্দুবালাকে কয়েক দিনের জন্যে হলেও বছরে একবার মহীশূর ভ্রমণের অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

ঐ বছরই মাঝামাঝি গানের আমন্ত্রণ ও বছরের শেষ দিকে ইন্দুবালাকে মহারাজা কৃষ্ণজীরাও মহীশূর রাজদরবারে সভাগায়িকা হিসেবে নিযুক্ত করেন। তাঁর এই পদে নিয়োগের সংবাদ ছবিসহ প্রকাশিত হল **The Indian Listener** পত্রিকায় **(September 22, 1936)**। **Listener** লিখলেন, **This noted filmstar, Miss Indubala has recently been appointed Court Musician to H. the Maharaja of Mysore**

কলকাতার পত্র পত্রিকায় এ খবর আগেই চলে আসে। **The Amrita Bazar Patrika (Friday, Sept 11, 1936)** গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হিসেবে লিখলেন—

MYSORE RULER'S BIRTHDAY

Celebration attended by Distinguised invitees

(From our Corespondent)

Mysore (By Mail)

Her Imperial Majesty, the Calipha of Turkey attended the birthday celebration of His Highness the Maharaja of Mysore, which came off in June last, before His Highness left for Europe. Other distinguised invitees on this occasion were the Hon'ble British President, Prince Pratap singha of Baroda, H. H. the Maharaja of Jhalwar, the Yubaraj of Kasmandi, Sir Charles chun-

ningham and Dewan Bahadur G. N. Chetty of madras.

The success of the musical performances was, to a great extent due to the talented Bengali artiste, Miss Indubala, who was invited from Bengal. She gave performances at his 'Highness' palace and won appreciation.

পত্র-পত্রিকায় ইন্দুবালাকে নিয়ে কি পরিমাণ হৈ-চৈ পড়ে যায় তার প্রমাণ বাংলার 'বন্দেমাতরম' ও 'কেশরী' পত্রিকা।

'বন্দেমাতরম' পত্রিকা (সোমবার ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩) 'গায়িকার সম্মান' শিরোনামায় লিখেছিল, মে মাসের শেষের দিকটা মহীশূর মহারাজের জন্ম দিন। এই তারিখটিকে স্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যে সেখানে নানারূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়, এবার এই উৎসবের সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য মহারাজ বাংলার সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা শ্রীমতী ইন্দু-বালাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমরা শুনে সুখী হলুম যে, ইন্দুবালা মহীশূর গিয়ে রাজদরবারে বহু বিশিষ্ট অতিথি ও সঙ্গীতজ্ঞের সামনে গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন, বাঙ্গালী গায়িকার পক্ষে এই রকম দুর্লভ সম্মানের অধিকারিণী হওয়া সত্যই গর্বের বিষয়, আমরা ইন্দুবালার সাফল্যে আনন্দিত।

দিন পনেরো বাদে 'কেশরী' পত্রিকা জানালেন :—

মহীশূরে বাঙ্গালী গায়িকার
সম্মান

গত ৩০শে মে মহীশূর মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে মহীশূর রাজদরবারে মিস্ ইন্দুবালা সঙ্গীতের জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার সঙ্গীত শুনিয়া মহারাজা এবং সভাস্থ সঙ্গীত রসজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, উপর্যুপরি ৩।৪ দিন ধরিয়া মিস্ ইন্দুবালা তাহাদিগকে সঙ্গীতে পরিতৃপ্ত করেন। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রাজদরবারে স্থায়ী গায়িকার আসন তাঁহাকে দেওয়া হইবে বলিয়া মহারাজা আশা দিয়াছেন। বাঙ্গলার গায়িকার পক্ষে এরূপ সম্মানলাভ শুধু গৌরবের নহে, অত্যন্ত আনন্দের।

(৬ই আষাঢ় শনিবার ১৩৪৩)

মহারাজা সেবার ইন্দুবালার গান শুনে এত প্রীত হয়েছিলেন যে তাঁকে তিনি অসংখ্য মূল্যবান উপহার দ্রব্য প্রদান করেছিলেন। এ ব্যাপারে মাদ্রাজের THE HINDU পত্রিকা বিস্তারিত ভাবে লিখেছিলেন :—

MISS INDUBALA HONOURED

Madras, June 13

Miss Indubala, the talented musician of Calcutta, arrived in Madras, this morning, after her visit to Mysore.

During her stay in Mysore, she gave four musical entertainments in the Palace. His Highness the Maharaja attended the performances and expressed his great appreciation of the same. Before she left Mysore, Miss Indubala had an interview with His Highness blessed her for her gifted voice and for her rendering of difficult ragas in classical style

Miss Indubala was the recipient of costly presents from His Highness. A beautifully mounted photography of His Highness was given as a souvenir to her.

It is understood that Miss Indubala will be appointed a Durbar musician.

The United Artist Corporation, in whose Picture Miss Indubala has acted have arranged for her a South Indian tour and a visit to Colombo. Musical concerts will be organised in important towns.

A representative of 'the Hindu' has a brief talk with her this morning in the course of which she said that she had a desire to learn Tamil and take part in Tamil Talkies.

(The Hindu, Saturday, June 13, 1936)

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ এবং মহীশূরে সভাগায়িকা হিসাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ইন্দুবালা নিজে বলেছেন, গান গাইবার আমন্ত্রণ নিয়ে ভারতবর্ষের বহু জায়গাতেই ঘুরে বেড়াবার সৌভাগ্য হয়েছে। তবে সবচেয়ে ভাল লেগেছিল দক্ষিণ ভারতে। হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ,

বাঙ্গালোর আর মহীশূরের কথা মনে পড়লে এখনো যেন ছেলেমানুষের মত আনন্দ হয়। মাদ্রাজের এক নামকরা সিনেমা দলের অনুরোধে আমাকে সেখানে যেতে হয়। মাদ্রাজ থেকে আসি বাঙ্গালোরে। কোথাও আমার ভাষা কেউ বোঝেনি। আমিও বুঝিনি তাদের ভাষা। তবু শুধু সুর দিয়েই জয় করেছিলাম তাঁদের হৃদয়। সারা দক্ষিণ ভারতে যে সমাদর পেয়েছিলাম তাতে কোন খাদ ছিল না। আমি মানুষ কেমন, আমার পরিবারের ইতিহাসে কোথায় কোন দাগ রয়েছে সে সব নিয়ে কেউ কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি। আমার গানেই ছিল আমার পরিচয়। এর বেশী দাবী করেনি কেউ। মাদ্রাজের মেয়র আমায় একটি সোনার মেডেল দিয়েছিলেন, আজও তা আছে আমার কাছে।

দক্ষিণ ভারতের অভিজ্ঞতার গল্প বলতে গিয়ে সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে মহীশূরের কথা। ঘরদোর নিয়ে আছি, হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল মহীশূর থেকে। আর সে কি যে সে ডাক, একেবারে খোদ রাজার তলব। পুরী, নেপালের রাজদরবারে আগেও গেয়ে এসেছিলাম বটে, তবে মহীশূরের ব্যাপারটা ছিল আলাদা। সেখানে গান বাজনার অনেক রথী-মহারথী রাজার চারপাশে ভিড় করে থাকতেন। স্বয়ং গহরজান ছিলেন সভাগায়িকা। সুতরাং রাজার ডাক পেয়ে আনন্দও যেমন হল ভয়ও তেমন হল। বুক দুরদুর করতে লাগল—কি জানি গান শুনিয়ে খুশি করতে পারবো কিনা। যাই হোক্, দুগ্গা বলে তো চলেই গেলাম। যথাসময়ে রাজদরবারে নিয়ে যাওয়া হল। যেমন সেখানে জাঁকজমক তেমন লোকজনের ভিড়। যে সে লোক নয় সব রাজ-রাজড়ার ভিড়। তাছাড়া গাইয়ে বাজিয়েদের দল তো রয়েইছে। চোখে যেন ধোঁয়া দেখলাম। কিন্তু তখন তো আর ফেরার উপায় নেই। অতএব কাঁপতে কাঁপতেই শুরু করে দিলাম গান। গান শেষ হতে অবশ্য সাহস গেল বেড়ে, কেন না, চারিধারেই শুনি তারিফ আর বাহবা। বেশ কয়েকদিন মহীশূরে থেকে যেতে হ'ল। রোজ মহারাজা আমার গান শুনতেন। ইতিমধ্যে আমার সঙ্কোচ অনেকটা কেটে গিয়েছিল। যেটুকু বা ছিল তাও চলে গেল মহারাজের লেখা একটা বইয়ের কথা শুনে। বইখানা আমায় মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী উপহার দিয়েছিলেন।

মহারাজা একবার নেপাল গিয়েছিলেন, বইয়েতে সে অভিজ্ঞতার কাহিনী বলা ছিল। নেপালের রাজা মহীশূররাজকে অনেক কিছু উপহার দেন। বিনিময়ে তিনি তাঁকে একটি গ্রামাফোন ও আমার তিনটি গানের রেকর্ড উপহার দিয়েছিলেন। সেক্রেটারীর মুখে বইয়ে লেখা এই কাহিনীর খবর শুনে আমি আনন্দে-বিস্ময়ে একেবারে আত্মহারা। সামনা-সামনি আমার গান শোনার আগেই মহারাজা যে আমায় স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তা আমার জানা ছিল না।

বাস্তবিক আমার প্রতি মহীশূর রাজের কৃপার অন্ত ছিল না। পরবর্তীকালে আমাকে তিনি সভাগায়িকার সম্মান পর্যন্ত দিয়েছিলেন। বাঙালী হিসেবে এতবড় সম্মান আগে কখনও কেউ পায়নি। মহীশূরে থাকতে হতো না। আমাকে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতে হত। সমস্ত খরচা রাজাই দিয়ে দিতেন। দেশে যতদিন ইংরেজ রাজত্ব ছিল, ততদিন এ-ভাবেই চলছিল। দেশ স্বাধীন হতে আমার কপাল হল মন্দ। মাসিক আড়াই শ' টাকা হিসেবে সভাগায়িকার যে সম্মান মূল্য একটানা এগারো বছর পেয়ে আসছিলাম, সে আমাদের স্বাধীন সরকার দিলে বন্ধ করে। মহীশূরে আমার প্রতিষ্ঠার মূলে একজনের সাহায্যের কথা উল্লেখ না করলে বেইমানি করা হবে। তিনি হলেন মিস্টার এ ওয়াহেদ্। গ্রামাফোন কোম্পানী লিমিটেডের হিন্দী ও উর্দু বিভাগের তিনি ছিলেন সর্বময় কর্তা। আমরা তাঁকে মুন্সীজি বলে ডাকতাম।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে মাদ্রাজ সফর শেষ করে কলকাতায় কিছুদিন থাকার পর ইন্দুবালাকে উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরে যেতে হয় Industrial & Agricultural Exhibition কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে। লক্ষ্ণৌতে এই প্রদর্শনী চলছিল ৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৬ থেকে একটানা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ পর্যন্ত। এই সংবাদ প্রথম কলকাতায় প্রকাশিত হল DEPALI পত্রিকায় (December 11, 1939)। DEPALI জানালেন,

Indubala invited to Lucknow

Miss Indubala the talented musician of Bengal has been invited to Lucknow Government Industrial Exhibition. Many famosn

artistes from differant parts of India are also invited. She has charmed the audience with her high class music. Bengal can be proud of her.

পরের দিন 'আজকাল' পত্রিকা (Dec. 12, 1936 ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৩) লিখলেন,

বাঙালী গায়িকার কৃতিত্ব

ভারত গভর্ণমেণ্টের অষ্টম বার্ষিক শ্রম শিল্প অধিবেশন হবে এবার লক্ষ্ণৌ-সহরে। সরকার পক্ষ এই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও করদ রাজ্য সমূহকে আমন্ত্রণ করেছেন। এই কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে গত ৫ই ডিসেম্বর এবং প্রমোদানুষ্ঠানের জন্যও কর্তৃপক্ষ অর্থব্যয় করেছেন অজস্র। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা শ্রেণীর বহু প্রসিদ্ধ শিল্পীদের এই উপলক্ষে আহ্বান করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিতা হয়েছেন স্বনামধন্যা গায়িকা শ্রীমতী ইন্দুবালা। প্রায় এক সপ্তাহ কাল পর্যন্ত একাধিকবার সঙ্গীতের জন্য তিনি চুক্তিবদ্ধা হয়েছেন। লক্ষ্ণৌর অধিবাসীরা ইন্দুবালার গানের প্রশংসা করেছেন। এই সংবাদে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

সেকালের চিত্র ও মঞ্চ বিষয়ক পত্রিকা 'দুন্দুভি' ও (বৃহস্পতিবার ২৪শে অগ্রহায়ন ১৩৪৩) শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছিলেন,

ইন্দুবালার সম্মান

বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী ইন্দুবালা লক্ষ্ণৌ সরকারী কৃষি শিল্প প্রদর্শনীতে গানের জন্যে আমন্ত্রিতা হয়েছিলেন। বহু নরনারীকে সে স্থানে তিনি তাঁর উচ্চ সঙ্গীত দ্বারা খুসী ও সুখী করতে পেরেছেন এবং সে জন্যে সে জয়মাল তাঁর কণ্ঠে লগ্ন হয়েছে তার সৌরভে আমাদের বাংলার গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি হোক্ এই-ঐ কামনা।

লক্ষ্ণৌ প্রদর্শনীতে আশাতীত সাফল্যের পর লক্ষ্ণৌর পরীস্থানে ইন্দু-বালার গানের আসর বসল। এই অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গুণীজ্ঞানীদের সমাবেশে তাঁকে যথার্থই 'Nightingale of Bengal' বলে অভিনন্দিত

করা হয়। THE PIONEER পত্রিকায় ইন্দুবালার প্রশস্তি করে লেখা হয়,

MUSICAL FEAST AT THE PARISTAN

Bengal "Nightingale's" debut in luckuow.

Not many singers in India had to work their way to fame harder than miss Indubala, deservedly known as the "Nightingale of Bengal". Severely plain in appearance she started her career on the stage about 20 years ago and carved a name for herself by sheer merit. Several of her contemporaries were rocketed to stardom by their publicity agents and accomodating theatrical managers only to be effected within a few years from the public memory.

A versatile artiste who has appeared in the leading role in scores of musical comedies and in number of plays. Miss Indubala's chief claim to fame is as a singer.

She is not of the type to rest on her laurels. Provincial fame was not enough for her. She learnt Hindi and urdu in record time and widened the circle of her admirers by her exquisite interpretation of garals. Those who have heard of her rendering of dadra and bhairabi maintain that she forms a class of her own.

She is one of the talented artistes who have made the "paristan" the big draw of the U P. Industrial and Agricultaral Exhibition. Those who missed seeing her during her short visit should make it a point to visit "paristan" early in january when she will return to lucknow after having fullfiled her engagement at Cacutta.

(Sunday, December 13,)

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান প্রধান শহর থেকে ইন্দুবালা আমন্ত্রিত হন। কলকাতা-মাদ্রাজ-বাঙ্গালোর-মহীশূর-লক্ষ্ণৌ তাঁকে অনবরত

ছুটোছুটি করতে হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জমিদার, রাজা এবং বনেদী বাড়ির সঙ্গীতের আসরে প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে যোগদান করতে হত। এছাড়া কুষ্টিয়া, খুলনা, ঢাকা এবং বিহারের মিহিজাম, মধুপুর, দেওঘর, জসিডি, তুমকা, পাকুড়, মন্দারহিল, ভাগলপুর, জামশেদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই সময় অজস্র আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করতে গিয়েছিলেন ইন্দুবালা। উনিশ শো চোদ্দ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দুবালা সঙ্গীতের আসরে প্রথম যোগ দেন। এর পর থেকে দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর ধরে একটানা তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদা নিয়ে কয়েক সহস্র অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ-শ্রোতাকে গান শুনিয়ে তৃপ্ত করেন।

তাঁর এই জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বোম্বাই চলচ্চিত্র জগৎ তাঁকে এই সময় বোম্বাইতে আমন্ত্রণ জানায়। তাঁর বোম্বাই যাত্রার মূলে ছিলেন বোম্বাইয়ের **Ranjit Movietone** কোম্পানী।

বোম্বাই যাত্রাকালে (১৯৩৭ খৃঃ) ইন্দুবালাকে অভিনন্দিত করে কবিতা লেখেন বিখ্যাত নট ও নাট্যকার স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র শ্রীসত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত। অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইন্দুবালার বাবা মতিলাল বসুর বন্ধু ও বোসেস সার্কাসের অনুরাগী। অভিনন্দন পত্রের কবিতাটিতে লেখা হয়ঃ

শ্রী শ্রী শিব দুর্গাজয়ন্তী
শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ
গায়িকা কুল নায়িকা
শ্রীমতি ইন্দুবালার

মুম্বাই যাত্রা প্রাক্কালে, ২২শে অগ্রহায়ন। বুধবার, ১৩৪৪

"অভিনন্দন"

'ইন্দুর মত কিরণ বিতরি
উদিয়াছ তুমি বঙ্গ আকাশে।
কণ্ঠে তোমার, কণ্ঠির মত
কোকিল-কণ্ঠ নিত্য বিকাশে।
প্রতি দেশে, তব যশ দুন্দুভি
উঠিছে বাজিয়া প্রতি ঘরে ঘরে।

তুমি সে বাণীর বরদত্তা, তা
প্রকাশিছে তব সুমধুর স্বরে।
বীনাপানি-বীনা ঝঙ্কারে বাঁধা
কণ্ঠের সুর সুর-সুমধুর।
বিরহ-বিধুর বঁধু বঁধুয়ার
জাগাতে বেদনা তুমি সচতুর।
পাষাণে যেরূপ ঝরে নির্ঝর
পাষান-চিত্তে তব সঙ্গীতে।
ফুটিয়াছে ফুল শত শতদল
সপ্ত সিন্ধু রহে তরঙ্গিতে।
যদিও বিশাল ধরণীর মাঝে
লভিয়াছ স্থল একটু বিন্দু।
তব নাম সাথে জগৎ উজলি
উদিয়াছ তুমি নবীনা ইন্দু।
ইতি
তোমার গুণমুগ্ধ ও সঙ্গীত ভক্ত
শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
(স্বর্গীয় নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্র নাথ দত্তের পুত্র।)
১৩৯ বি, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, হাতীবাগান,
কলিকাতা।

কলকাতা শহরের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় ইন্দুবালার বোম্বাই যাত্রার এ সংবাদ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। অসংখ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ইন্দুবালাকে এই গৌরব ও সম্মানের জন্য অভিনন্দন বার্তা পাঠান।

'আজকাল' পত্রিকা (শনিবার ১৯শে ভাদ্র ১৩৪৪) এ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করে লেখেন :—

মিস্ ইন্দুবালার কৃতিত্ব

বোম্বাইর রনজিৎ ফিল্ম কোং মিস ইন্দুবালার সহিত ৪ মাসের কনট্রাক্ট

করিয়াছেন। মিস্ ইন্দুবালা এই ৪ মাসে প্রতি মাসে তিন হাজার করিয়া বার হাজার টাকা পাইবেন। একটি বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয়। মিস্ ইন্দুবালার যশ আজ সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে মহীশূর রাজ্যের দরবার গায়িকা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সেজন্য তিনি যাবজ্জীবন একটা মাসিক ভাতা পাইবেন। কিন্তু তাঁহাকে সেখানে থাকিতে হইবে না। যখন মহীশূর যাইবেন তখন সেজন্য পৃথক অর্থ পাইবেন।

ইন্দুবালার কৃতিত্বের সংবাদ এছাড়াও প্রকাশিত হয় 'সোনার বাংলা' ও ইংরেজী সংস্করণ DIPALI পত্রিকায়।

'সোনার বাংলা' (২৬শে ভাদ্র ১৩৪৪) লিখলেন, বাংলার খ্যাতনাম্নী গায়িকা ও চিত্রজগতের রসিকা নটী শ্রীমতী ইন্দুবালা সম্প্রতি বোম্বের প্রসিদ্ধ চিত্র প্রতিষ্ঠান শ্রী রঞ্জিত ফিল্ম কোম্পানীর সহিত এক বছরের জন্য ১২০০০ টাকা বেতনে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এই বছরে মাত্র চার মাস তিনি কাজ করবেন—অবসর সময়ে অন্য কোম্পানীতেও কাজ করতে পারেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি মহীশূর রাজসভায় গান গেয়ে অতুল যশ ও সম্মান লাভ করে মহারাজের সভা গায়িকার পদে নিয়োজিত হয়েছেন। বাঙ্গালী গায়িকার এ সম্মানে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

অন্যদিকে DIPALI (August 20, 1937) জানালেন :—

Indu Bala, the famous songtress and comic actress of Bengal, has joined Ranjit Movietone of Bombay on a monthly salary of Rs. 1000/-. The name of her first picture is not yet announced. We wish her the best of luck.

লক্ষ্য করবার বিষয় ইংরেজী সংস্করণে মাসিক ১০০০ টাকা বেতন লিখেছেন DIPALI পত্রিকা। কিন্তু ঐ পত্রিকার বাংলা সংস্করণে (দীপালী, বৃহস্পতিবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৪৪) লেখা হল, শ্রীমতী ইন্দুবালা বোম্বায়ের রণজিৎ ফিল্মের সহিত এক বৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন এবং তিনি এক বৎসরে বার হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন। তিনি বৎসরের

মধ্যে মাত্র চার মাস উক্ত কোম্পানীতে কাজ করিবেন; বাকী সময়টা অন্য কোম্পানীর হইয়া কাজ করিতে পারিবেন।

বোম্বাইয়ের সেকালের সিনেমা পত্রিকা Film India-র তথ্যানুযায়ী (June 1938) রঞ্জিত মুভীটোনের শিল্পী হিসেবে ইন্দুবালার হিন্দী ছবি 'রিক্সাওয়ালা' চরিত্রলিপি ছিল এইরকম—

RICKSHAWALA

Produced by :	Ranjit Movietone, Bombay
Released at :	West End Cinema, Bombay.
Date of release :	14th May 1938.
Cast :	Mazhar, Ila Devi, Charlie, Wasti, Wahidan, Dixit, Ghory, Indubala etc.
Music :	Jnan Dutta
Direction :	Ezra Mir

পত্রিকার মতে, Indubala sang well and her comic skit was put over well.

আসলে ছবিটির নাম 'Bhola Raja Rickshawala'। বোম্বাইতে ইন্দুবালা ক্রমশঃ জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিসেবে সাফল্য লাভ করেছিলেন। ফলে তিনি পরপর ছয়টি ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধা হন। যেমন— Bhola Raja Rickshawala, Nadi Kinarey, Holi, Dewali, নামে চারটি হিন্দি ছবি এবং Sher-E-Kabul, Miss Sundari, নামে দুটি উর্দু ছবি যার সব কটিতেই ইন্দুবালা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। ছবিতে ইন্দুবালার গানও ছিল অতিরিক্ত আকর্ষণ।

হিন্দী ছবিতে সাফল্যের সংবাদে মাদ্রাজের চলচ্চিত্র মহলও তাঁর সম্পর্কে উৎসাহী হন। ফলে মাদ্রাজের The United Artists Corporation ইন্দুবালাকে তাঁদের 'Naveena Satharam' নামক একটি ছবির জন্যে আমন্ত্রণ জানান। ইন্দুবালা ইতিপূর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করে তামিল ভাষী মাদ্রাজের জনগণকে মুগ্ধ করেছিলেন। তার সেই সাফল্যের স্মৃতিকে স্মরণ

করে তিনি Naveena Satharam ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

এই ছবিতে অভিনয়ের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করেন মাদ্রাজের The United Artists Corporation। ছবিটি প্রযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন East India Film Co. Calcutta. এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন S. D. Subbulakshi, R. Sankaralingam. Jolly Kittu Iyer, S. S. Mavi Bagavathar, G. Pattu Iyer, Indubala, K. K. Parvathi Bai ইত্যাদি। ছবিটির Release Brochure এর কভারে এই শিল্পীদের নাম মুদ্রিত হয়েছিল। এই সংবাদের পর আরও একটি ছবির সম্পর্কে মতামত দিয়ে 'আজকাল' পত্রিকা জানান :

মাদ্রাজে মিস ইন্দুবালা

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, মিস ইন্দুবালা যখন মহীশূর রাজদরবারে গায়িকা রূপে মহিশূর মহারাজার দরবারের কাজ শেষ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন মাদ্রাজে তিনি পৌঁছিলে মাদ্রাজ ইউনাইটেড আর্টিষ্টস্ কর্পোরেশন নামক ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তাঁহাকে মাউণ্ট রোডস্থ স্টুডিওতে লইয়া গিয়া তাঁদের একটি ডবল সংস্করণ ছবির জন্য তাঁহার সহিত কণ্ট্রাক্ট করেন। ছবিখানির নাম ইন্দ্র-সাগর (তামিল) এবং প্রেম সাগর (হিন্দী)। তিনি হিন্দি সংস্করণে চঞ্চলার কমিক ভূমিকায় অভিনয় করিবেন। তিনি সেখানে একমাস থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন।

[আজকাল, শনিবার ৩১শে আষাঢ় ১৩৪৫]

East India Film Co এর ডিরেক্টর A. R. Kardar ছিলেন ইন্দুবালার গানের একান্ত অনুরাগী। ইন্দুবালাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বহুকাল ধরে চিনতেন। সিনেমায় ইন্দুবালা প্রথম যোগ দিয়েছিলেন ১৯৩২খ্রীঃ মহীশূর, মাদ্রাজ বা বাঙ্গালোর যাত্রার আগে। এবং বলা বাহুল্য এই East India Film Co'র হয়েই তিনি প্রথম চলচ্চিত্রে অবতীর্ণা হন। মাত্র আট বছরের মধ্যে তিনি বাংলা, হিন্দী, উর্দু, তামিল, পাঞ্জাবী এই পাঁচটি ভাষার ছবিতে একটানা প্রায় পঞ্চাশটি ছবিতে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয়

করেছিলেন। কাদির সাহেব নানাভাবে ইন্দুবালাকে সাহায্য করেছেন। কাদির সাহেবের সাহায্য ও ঋণ এখনো তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দুবালা যখন বিপুলভাবে সাফল্য লাভ করছিলেন এবং একের পর এক শহরে পরিভ্রমণ করে তাঁর সঙ্গীতের দ্বারা অনুরাগীদের মনোরঞ্জন করছিলেন তখন তাঁকে যারা অভিনন্দিত করেছিলেন এ, আর কারদার ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ঐ বছর তিনি ইন্দুবালাকে যে অভিনন্দন পত্রটি পাঠিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ :

A. K. KARDAR

Calcutta. 13. 5. 36

To whom it may Concern

I think a credential is needed when an individual acquires perfection in any Art by going through a particular or specified course of training. But when the Art itself is a part of natural element of a person, the necessity of testimony should remain no more.

However I feel pleasure in certifying that Miss Indu Bala has worked in several of my pictures with great adroitness and efficiency. Miss Indu Bala is not only a singer of uncommon popularity and genuinity but a competent and accomplished character Actress. Her abilities in portrying all sorts of human emotions and feeling ate highly commendable.

I wish to see Miss Indu Bala playing prominent roles in all of my pictures.

Sd/- A. R. Kardar
Director.
East India Film Co.

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় টিকমগড়ের রাজার সঙ্গে ইন্দুবালার যোগাযোগ হয়। মধ্যভারতের ORCHHA STATE এর মহারাজা অফ

টিকমগড় সেই সময় তাঁর সঙ্গীতের ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিলেন। তাঁর দরবারে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ থেকে আঙ্গুরবালা এবং কমলা ঝরিয়া সঙ্গীত পরিবেশন করতে আমন্ত্রিত হয়েছেন। ফলে বাংলার আর এক প্রতিভা ইন্দুবালার সঙ্গীত সম্পর্কে মহারাজা উৎসাহী হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী পত্রে ইন্দুবালাকে লিখলেন :—

Office of the Private Secretary
ORCHHA STATE
TIKAMGARH (C. I)
29th January 1937

Dear Miss Indu Bala,

With reference to your letter of the 23rd January, I write to inform you that we will have Darbars from 22nd to 27th every evening. There are some other girls coming here as well famous amongst them would be Angur Bala and Kamala Jharia Generally we are not exacting in our demands, but any how you will have to sing daily when your turn comes but one is not supposed to sing here beyond her stamina. We will ask you to sing as long as you like.

I shall send Rs. 250/- for your travelling expenses ete. in the first week of February. It would be better if you give exact time of your arrival at Lalitpur by wire enabling me to make conveyance arrangements.

Sd/—
Private Secretary

ঐ বছরই ফেব্রুয়ারী মাসে ইন্দুবালা টিকমগড় মহারাজের দরবারে যান এবং সঙ্গীত পরিবেশন করে মহারাজাকে তৃপ্ত করেন। ঐ একই অনুষ্ঠানে কলকাতার আরও দুই প্রখ্যাত গায়িকা আঙ্গুরবালা এবং কমলা ঝরিয়া'ও সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন।

বোম্বাই এবং মাদ্রাজে সিনেমার কাজকর্ম শেষ করে ইন্দুবালা মাস ছয়েক বাদে আবার মহীশূর এলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন মহীশূরের রাজার জন্মদিনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মহীশূর প্রাসাদ থেকে প্রেরিত পত্রে ইন্দুবালাকে জানানো হল,

No. 3254

GOVERNMENT OF (Seal) MYSORE

The Palace,
Mysore
24th May 1938

Miss Indubala,
21, Jogen Dutta Lane,
P. O. Beadon Street, Calcutta.

Madam,

I am in receipt of your letter of the 19th instant. As you desire to be here for his Highness the Maharaja's birthday you can certainly come to Mysore. His Highness's Birthday falls on the 8th June 1938. As the racing season is on, the cottage you used to stay has been occupied. So I am reserving some place elsewhere for you to stay. I note you are reaching Mysore by the 10-45 A. M. train on the 5th June next.

Yours faithfully,
Sd/—
For Huzur Secretary
to H. H. the Maharaja of Mysore

মহীশূর রাজ-দরবারে সেকালের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকারা সকলেই প্রায় আমন্ত্রিত হতেন। যদিও তাঁদের সকলেই অবশ্য দরবারের সভা-গায়িকার মর্যাদা পাননি। কলকাতা থেকে আঙ্গুরবালা মহীশূর দরবারে গিয়ে তিনটি অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

সারা ভারতবর্ষে ইন্দুবালার সুনাম ছড়িয়ে পড়ার ফলে এই সময়ে ইন্দুবালা নিজের নামে একটি কনসার্ট দল খোলেন। এই দলের নাম ছিল INDU BALA CONCERT PARTY.

২১নং যোগেন দত্ত লেনের (রামবাগান, কলকাতা, ফোন নং BB2658) এই Concert দলের প্যাডে লেখা হত Sole Propririetrin Miss Indubala, The Nightingale of the North (Artist of H M V Records Radio & Film Fame)

এই পর্বেই মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক তাঁকে বিপুলভাবে মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁর সঙ্গীত বিষয়ক কৃতিত্বের জন্য সম্বর্ধিত করেন এবং অজস্র গুণী জ্ঞানীদের সেই সমাবেশে তাঁকে সঙ্গীত সাম্রাজ্ঞী' উপাধি প্রদান করা হয়।

তাঁর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত M.L.C. তাঁকে ১৯৩৭ খ্রীঃ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচন কালে প্রতিবেশী ইন্দুবালাকেই তাঁর পোলিং এজেন্ট হিসেবে বেছে নেন। হরিধন দত্তের সার্টিফিকেটে লেখা হয় :

Dr. Haridhan Dutt
Rai Bahadur, M. L. C.

81 Harrison Road
31 Chittaranjan Avenue
Calcutta (South)
12th January '37

I hereby appoint Miss Indubala to be my polling agent at the ensuing Election of the Bengal Legislative Assembly, Calcutta Central (General) constituency (Words 6, 8 & 9) on the 18th January, 1937.

Authorised by me
Sd/-
Retiring Officer,
17. 1. 37

Haridhan Dutt
Candidate

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মঞ্চে অভিনেত্রী ইন্দুবালা

১৯২২ খ্রীঃ। প্রথমে বাংলা থিয়েটারে ইন্দুবালা নেহাৎই সখ করে যোগ দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, মা রাজবালা প্রতিষ্ঠিত 'দিঃ রামবাগান ফিমেল কালী থিয়াটার' যাকে তিনি মনে করতেন 'আমার প্রতিষ্ঠান' সেখান থেকেই তাঁর অভিনয় জীবনের শুরু। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ (বাংলা ১৩২৬ বঙ্গাব্দ) বন্যার আর্থিক সাহায্যের জন্য গড়া রাজবালার নারী সমিতির অধীনস্থ 'কাঙ্গালিনী থিয়েটার' উঠে যাবার পর রাজবালারই উৎসাহে ও চেষ্টায় এই ফিমেল কালী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা (১৯২২) হবার ফলে মা ও মেয়ে একই সঙ্গে এই দলে অভিনয় করতে থাকেন। প্রধানতঃ মহিলা শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত ও পরিচালিত এই থিয়েটার দলটি পেশাদারী দল হিসেবেই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বস্তুতঃ সেকালে এই মহিলাদের দলটি যে কেবলমাত্র জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তাই নয়, অন্যদিকে বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রেও এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা, এই রামবাগান থিয়েটারই মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এবং এদেশের প্রথম অভিনেত্রীদের গঠিত পাবলিক থিয়েটার। শুধু বাংলাদেশে কেন, ভারতবর্ষে অন্য কোথাও এর আগে এ রকম কোনো পেশাদার মহিলা থিয়েটার দল আত্মপ্রকাশ করেছে বলে জানা নেই।

এই থিয়েটারের দুই বছর (১৯২২-২৪) আয়ুষ্কালে মোট যে বারোটি নাটক প্রদর্শিত হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতেই ইন্দুবালা অভিনয় ও গানে অংশ গ্রহণ করেন। যেমন—বিল্বমঙ্গল, নরমেধ যজ্ঞ, খাস দখল, বরুণা, পলিন, হীরে মালিনী, কুব্জ দরজী, আলিবাবা, রেশমী রুমাল, হীরার ফুল, পরদেশী ও চন্দ্রগুপ্ত।

কিন্তু অকস্মাৎ এই থিয়েটারটি আর্থিক ক্ষতির ফলে উঠে যাবার পর ইন্দুবালা প্রথম স্টার থিয়েটারের সঙ্গে এসে যুক্ত হন। এই থিয়েটারে

প্রথম পর্বে তিনি প্রায় বছর তিনেক জড়িত ছিলেন। মোট যে তিনটি নাটকে এই সময় তিনি অভিনয় ও গানে অংশগ্রহণ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন সেগুলি হল—নসীরাম (সোনার ভূমিকায়), বিল্বমঙ্গল (পাগলিনীর ভূমিকায়), ও নরমেধ যজ্ঞ (কাত্যায়নীর ভূমিকায়)।

১৯২৫ খ্রীঃ এর শেষদিকে (৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪২ বঙ্গাব্দ) স্টারে পেশাদার থিয়েটারে ইন্দুবালার প্রথম অভিনয় প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা দিন দুই পরে লিখলেন—

স্টার থিয়েটারে "নসীরাম"

গত বুধবার রাত্রে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ধর্মমূলক নাটক "নসীরাম" অভিনীত হইয়া গিয়াছে। প্রেক্ষাগৃহ দর্শক পরিপূর্ণ ছিল। অভিনয় গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত বেশ জমিয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় নসীরামের ভূমিকায় এই প্রথম অভিনয় করিলেন।

নসীরামের ভূমিকায় আমরা প্রবীণ-নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়কে দেখিয়াছি। তবে ঘোষ মহাশয়ের অভিনয়ও সুন্দর হইয়াছিল।

সোনার ভূমিকায় শ্রীমতী ইন্দুবালার অভিনয় বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী ইন্দুবালা সোনার ভূমিকায় যে সমস্ত গান গাহিয়াছিলেন তাহা অতীব মনোরম হইয়াছিল।

[সেপ্টেম্বর ১৯২৫]

এছাড়া 'অবতার' পত্রিকায় লেখা হয় :—

স্টার থিয়েটার

[১৩৩২—৩৫ সাল]

স্টারের নতুন গায়িকা শ্রীমতী ইন্দু গত সপ্তাহের বুধবারে স্টেজে প্রথম অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া দর্শকগণ সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দধ্বনি করিয়াছিল। গানগুলি তাঁহাকে দুইবার করিয়া গাহিতে হইয়াছিল। স্টার থিয়েটারে এইবার দুইজন গায়িকা হইলেন—এক আশ্চর্যময়ী, অপর ইন্দু।

[অবতার ২০শে ভাদ্র শনিবার ১৩৩২ সন]

তাঁর মঞ্চে আসাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন সেকালের জনপ্রিয় মঞ্চ ও চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা 'বাঙলা'। এর সংবাদদাতা লিখেছিলেন—শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা তাঁহার নাম যশের মর্যাদা রাখিয়াছেন। বুধবার সন্ধ্যায় তাঁহার স্পষ্ট, মধুর, সুললিত কণ্ঠসঙ্গীতে তিনি সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে আনন্দ দান করিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই একটি গাল ভরা বিশেষণ দ্বারা তাহাকে সম্ভাষত করায় আমরাই আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আমরাই আজ আনন্দে বলিতেছি, এ একটা সংগ্রহ! এই "সংগ্রহ" দ্বারা সম্প্রদায় উপকৃত হইবেন।

[বাংলা, ইংরাজী ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫]

'নসীরাম' নাটক সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী সমালোচনা করেছিলেন 'রঙ্গদর্শন' পত্রিকা। এই পত্রিকার 'রঙ্গালয়' বিভাগ কঠোর ভাষায় এই নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে কশাঘাত করে। বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের নাটক সম্পর্কে এই পত্রিকায় অনেক কটূক্তি করা হয়। তা সত্ত্বেও এই পত্রিকায় ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল—তথাপি নবীনা অভিনেত্রী শ্রীমতী ইন্দুবালা সোনার ভূমিকায় কতকটা মান বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, নবীনা অভিনেত্রী হিসাবে বিচার করিলে সোনার মত বড় ভূমিকায় তাঁহার অভিনয়ের নিন্দা করা চলে না। তাঁহার সকল গান ভাল না লাগিলেও, দুই একটি গান আমাদের ভালই লাগিয়াছে।

'শিশির' পত্রিকার কটূক্তি মিশ্রিত আলোচনা :—

স্টারে নসীরাম

গত বুধবার রাত্রে আমরা ষ্টারে "নসীরাম" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। "নসীরাম" নটগুরু গিরীশ-চন্দ্রের একখানি ধর্ম্মমূলক নাটক, এবং স্বয়ং নাট্যাচার্য দানীবাবু প্রধান ভূমিকায় নামিয়াছিলেন। আশা করিয়াছিলাম, একটা নূতন কিছু দেখিতে পাইব; কিন্তু রঙ্গালয়ের সম্মুখে যাইয়াই যেন অনেকটা দমিয়া গেলাম—অভিনয়ের সময়—অথচ একখানি গাড়িও কুত্রাপি দেখা গেল না, অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষের মটর ছাড়া; টিকিট ঘরের সম্মুখেও সেরূপ জনতা নাই। ভিতরে ঢুকিয়া দেখি লোকজন বড় একটা নাই। দেখিয়া সত্যই মনে কষ্ট হইল। ভাবিলাম নব পর্যায়ে নসীরামের এই কি প্রথম অভিনয়? সেদিনের কথাও মনে পড়ে, আর্ট থিয়েটারে প্রতি নূতন বই অভিনয়ের দিনে সে কি বিরাট জনতা। কিন্তু এক বৎসরের অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ফলে এই নবীন সম্প্রদায়ের কি শোচনীয় পরিণামই না ঘটিল। আর্ট থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট আমাদের সবিনয় অনুরোধ, তাহারা একবার ভাবিয়া দেখুন তাহারা কি

কিন্তু 'শিশির' পত্রিকাও ইন্দুবালা সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। 'শিশির' পত্রিকার রঙ্গালয় বিভাগের মতে—সোনার অংশে ষ্টারের নবীনা গায়িকা ইন্দুবালা অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। সোনা ছিল পৈশাচিক প্রকৃতির—অতি কদাকার রমণী, সুতরাং ইন্দুবালাকে এই ভূমিকাটি মন্দ মানায় না। তবে তাহার কালোয়াতি গানের ধাক্কা থাকিয়া থাকিয়া দর্শকদের নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ষ্টারের অভিনেত্রী নির্বাচনের বাহাদুরী আছে।

অন্যদিকে একদা কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমদ্ সম্পাদিত পত্রিকা 'নবযুগ' লিখলেন—চিরকুমার সভার আনন্দস্রোত একটানা বইছে—দেশের লোকে যে বইখানা 'নিয়েছে' তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এঁরা সম্প্রতি ইন্দুবালা নামক এক সুগায়িকাকে দলভুক্ত করেছেন। মধ্যে একদিন এঁর বৈঠকী গানও হয়ে গেছে এবং মনে হয় এঁকে পেয়ে এঁরা সত্যই লাভবান হবেন। (নবযুগ ২০ ভাদ্র ১৩৩২)

ছিলেন, আর কি হইয়াছেন। সেই কর্ণার্জ্জুনের দিনে তাহাদের কতই না উৎসাহ, কতই না উদ্যম দেখিয়াছিলাম, কিন্তু যতদিন যাইতেছে ততই যেন সে উৎসাহ, সে উদ্যম অন্তর্হিত হইতেছে। এখন প্রথম অভিনয় রজনীর লোভ, এবং নাট্যাচার্য্যের আকর্ষণ, কিছুতেই আর তেমন লোক সমাগম হইতেছে না। কেউ দেখিয়া শেখে, কেউ ঠেকিয়া শেখে, অতীব দুঃখের বিষয় যে ষ্টার থিয়েটারকে ঠেকিয়া শিখিতেও বিলম্ব হইতেছে।

অভিনয় দেখিয়া মনে হইতেছিল, গিরিশবাবুর নাটকের বোধ করি ব্যঙ্গাভিনয় হইতেছে। জানিনা, এই নাটকের মহলা দিবার অবকাশ কর্তৃপক্ষ মোটেই পাইয়াছিলেন কিনা, কিন্তু promtor এর গলা এত জোরে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ হইতে শুনা যাইতেছিল, যে একাধিকবার দর্শকেরা চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে prompter আসিয়া অভিনয় করুক।

দানীবাবু এই ভূমিকাটি লইয়া না নামিলেই ভাল করিতেন। তাহার অভিনয়ে বিশেষত্ব কিছুই দেখিলাম না। তাহার সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

রাধিকাবাবুর অনাথ নাথের সম্যক সমালোচনা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না—আমরা আমাদের ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। "ভূমিকা-জবাই" কথাটি বাঙ্গলা ভাষায় প্রয়োগ হয় কিনা জানিনা, কিন্তু তাহার অভিনয় সম্বন্ধে ঐ এক কথাই খাটে। দানীবাবু স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রকে গুরু বলিয়া মানেন, আমরা দানীবাবুকেই জিজ্ঞাসা করি—তাহার ঐ গুরুদেবের অভিনীত এই ভূমিকাটিকে রাধিকাবাবুর দ্বারা এইরূপ ভাবে জবাই করাইয়াই কি তিনি গুরু দক্ষিণা পরিশোধ করিতেছেন? দানীবাবুর শিক্ষকতায় আজকাল কি এইরূপ কলারই আমদানী হইতেছে?

(অগ্রহায়ণ, ১৩৩২)

'রঙ্গদর্শন' পত্রিকার মতামতেও ইন্দুবালার প্রশংসাই প্রতিধ্বনিত। পত্রিকায় 'রঙ্গালয়' শিরোনামায় এই পত্রিকাটিতে লেখা হয়—সেকালের অনাথ নাথ স্বর্গীয় গঙ্গামণি কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা বলিব? তথাপি নবীনা অভিনেত্রী শ্রীমতী ইন্দুবালা সোনার ভূমিকায় কতকটা মান বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, নবীনা অভিনেত্রী হিসাবে বিচার করিলে সোনার মত বড় ভূমিকায় তাঁহার অভিনয়ের নিন্দা করা চলে না। তাঁহার সকল গান ভাল না লাগিয়েও দুই একটি গান আমাদের ভালই লাগিয়াছে।

[রঙ্গদর্শন, (রঙ্গালয় বিভাগ) ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২]

এই 'নসীরাম' চলাকালেই অকস্মাৎ 'বাঙলা' পত্রিকায় মন্তব্য—খবর, গায়িকা ইন্দুবালা স্টারে আর নাই। এ যে আগমনেই বিসর্জ্জন দেখি!

অবশ্য এই সংবাদের কোন ভিত্তি ছিলনা। তাছাড়া ইন্দুবালা ষ্টার থিয়েটার তখন ত্যাগ করার কোনো পরিকল্পনাও করেননি।

'বাঙলা' পত্রিকাতে শ্লেষ মিশ্রিত সমালোচনা (৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২):—

যে "নসীরাম" লইয়া হাতীবাগানে ষ্টারের প্রতিষ্ঠা, বহুকাল পরে গত বুধবারে ষ্টার থিয়েটার সেই নসীরামের পুনরভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। যাহাকে লইয়া যাহার প্রতিষ্ঠা তাহার কাছে তাহার একটা মর্য্যাদা থাকিবার কথা। কিন্তু এযুগের আবহাওয়া স্বতন্ত্র—এটা কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগ। একালে যাহা কিছু মর্য্যাদা তাহা কাঞ্চনের, অন্য মর্য্যাদা নাই। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে এখনও যাঁহারা ষ্টারের নাম সগর্ব্বে ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা নসীরাম অভিনয় করিয়া নসীরামের অমর্য্যাদা করিবার সাহস করিতেন না।

* *

দেখিতেছি বঙ্কিম, গিরিশের বহি একালে অভিনীত হইলে, তাহার এখন এইরূপ দুর্দ্দশাই হইবে। ঐ সকল বহি অভিনয় করিবার শক্তি একালের আর্টিষ্টদের নাই—সেকালের যে দুই এক জন অভিনেতা এখনও রঙ্গালয় সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহাদেরও সে যত্ন যে আয়াস স্বীকার আর নাই বুঝিবা সামর্থ্যেও কুলাইতেছে না। বঙ্কিম-গিরিশের লেখায় সে আর্ট কৈ, যে একালের আর্টিষ্ট অভিনয়ে তাহা ফুটাইয়া তুলিবেন? এটা 'পাষাণী,' 'চিরকুমার', 'আত্ম দর্শনের' যুগ—এখন চন্দ্রশেখর, বিল্বমঙ্গল, নসীরাম জমিবে কেন?

* *

বাস্তবিক আমরা সেদিন নসীরামের অভিনয় দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি এবং তাহার অধিক ব্যথিত হইয়াছি। আমরা ষ্টারের বর্ত্তমান সুযোগ্য ও প্রবীণ অধ্যক্ষ অপরেশ বাবুকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে, নসীরামকে এরূপ নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়া কেন তিনি তাঁহাদের মন্ত্রগুরু গিরিশের মুখখানি ম্লান করিয়া দিলেন? তিনি অবশ্য সেকালের নসীরাম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গিরিশের অভিনীত নসীরামের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম—গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা ভগবৎ বিশ্বাস ও ভগবৎ ভক্তিতে পরিপ্লুত জীবন সে নসীরামের সাক্ষাৎ বঙ্গ

নসীরাম নাটকের বিরূপ সমালোচনা 'শিশির' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর পাঠকেরা এর প্রতিবাদে চিঠি লিখে তাঁদের অনুকূল মতামত জানিয়েছিলেন। প্রতিবাদ পত্রের দুটি নমুনা 'বাঙলা' পত্রিকা থেকে হুবহু তুলে দেওয়া হল।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয় সমীপেষু —

গত সংখ্যার শিশিরে নসীরামের সমালোচনা পড়িয়া চেতলা হইতে আপনার সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিবার বাসনায় আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার অনুসন্ধানে শিশির আফিসে গিয়াছিলাম। আমার ধারণা ছিল আপনি এখনও শিশির সম্পাদক। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম যে আপনি বহুকাল শিশিরের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। শুনিলাম আপনি এখন 'বাংলার' সেবক এবং বাংলার রঙ্গমঞ্চের সমালোচনা করেন।

আমি আর্ট থিয়েটারে অভিনীত নসীরামের অভিনয় দেখিতে গত বুধবারে গিয়াছিলাম। শিশিরে যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে এরূপ জঘন্য মিথ্যা 'সমালোচনা' যে কোন কাগজে ছাপা হইতে পারে ইহা আমার ধারণা ছিল না। আমি সমালোচকের মিথ্যা কথাগুলির একে একে সমালোচনা করিলাম আশা করি আপনার পত্রিকায় একটু স্থান দিবেন।

১। আমি দ্বিতীয় পংক্তিতে বসিয়াছিলাম। শিশির আফিসে গিয়া যে লোকটিকে বর্তমানে শিশিরের সম্পাদক বলিয়া জানিলাম, তাঁহাকেও সেদিন দেখিয়াছিলাম। তাঁহার স্থান ছিল অষ্টম পংক্তিতে। আমি দ্বিতীয় পংক্তিতে বসিয়া prompter এর গলা শুনিতে পাইলাম না আর তিনি অষ্টম পংক্তিতে

রঙ্গমঞ্চে আর পাওয়া যাইবে না, তাহা জানি। কিন্তু তিনি ত অমৃতলালের নসীরাম দেখিয়াছেন। অমৃতলাল বসুর নসীরাম অতি সুন্দর এবং আমরা আশা করিয়াছিলাম গিরিশ-পুত্র দানীবাবুর নিকটও নসীরামের অমর্যাদা হইবে না। কিন্তু আমরা হতাশ হইয়াছি! দানীবাবুদের এমন অপ্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিতে আমরা পূর্বে দেখি নাই। মাঝে মাঝে প্রতিভার বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি কুত্রাপি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইল না। নসীরামের হরিনামে নসীরামের নিজের মনই ভিজিল না—সুতরাং সে হরিনাম আমাদের মত পাতকী দর্শকের পাষাণ প্রাণ গলাইবে, সে সে আরও কঠিন কথা।

* *

সেকালের অনাথ নাথ স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র, সেকালের সোনা স্বর্গীয় গঙ্গামনি কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা বলিব?

বসিয়া prompter এর উচ্চগলা শুনিতে পাইলেন ইহা তাহার মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশেষতঃ তিনি নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে, হাস্য করিয়া, কথা বলিয়া লাফাইয়া ও তাঁহার পরিচিত অথবা সঙ্গের ভদ্রলোকদের ঠেলিয়া নসীরামের অভিনয়কালীন যে অভিনয় করিতেছিলেন —আমার অনেক সময়ই মনে হইতেছিল কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে কেন উঠাইয়া দিতেছেন না। অভিনয় আরম্ভ হইতেই শিশির সম্পাদক স্বয়ং যে অভিনয় করিতেছিলেন তাহা ভদ্রতার বাইরে। কোন পত্রিকা সম্পাদক, বিরুদ্ধ থিয়েটারেও যে সেইভাবে অভদ্রতা দেখাইতে পারেন ইহা চক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। সংবাদপত্র সম্পাদকগণ, আচারে বিনয়ে ব্যবহারে সভ্যতায় সাধারণের আদর্শ হইবেন, ইহাই লোকের ধারণা, তবে কি এ ধারণা ভুল ?

দানীবাবুর সরল অভিনয় ইহাদের কাছে ভাল না লাগিবারই কথা। হরিপ্রেমে পাগল ভক্তের অভিনয় সকলের নিকট ভাল লাগিতে পারে না। সে অভিনয় দেখিবার ও বুঝিবার প্রাণ চাই।

রাধিকাবাবুর অভিনয় সম্বন্ধে শিশির সম্পাদকের মতের সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটে। অতি বড় নিন্দুকও বলিবেন, রাধিকাবাবু অভিনয়ে কোন দোষই করেন নাই।

সোনার ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা ইন্দুবালার গানগুলি খুবই হৃদয়-স্পর্শী হইয়াছিল। প্রত্যেক গানেই দর্শকবৃন্দ এনকোর দিয়া গায়িকাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শিশির সম্পাদকের মতে "কালোয়াতি গানের ধাক্কা থাকিয়া থাকিয়া দর্শকদের নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল"— কথাটি যে কতদূর সত্য তাহা সে রাত্রির দর্শকবৃন্দ খুব ভাল রকমই জানেন।

আমার একটী বন্ধুর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতে শুনিলাম যে শিশিরের এই প্রকার সমালোচনা লিখিবার অনেক নিগূঢ় কারণ আছে। তাহার মধ্যে একটি কারণ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির সম্পাদক ও শিশিরের সত্বাধিকারীর নামে একটি জ্বলন্ত চার্জ্জে হাইকোর্টে মামলা রুজু করিয়াছেন। তাই গায়ের জ্বালা মিটাইবার জন্য তাঁহারা এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে শিশির সম্পাদক কাগজে

লেখা ছাড়িয়া দিয়া আর্ট থিয়েটারকে অন্য প্রকার গালাগালি দিতে পারেন কিন্তু সংবাদপত্রের অন্তরালে এ জঘন্য ব্যাপার কেন।

*　　　　*　　　　*

শেষাংশ পরিত্যক্ত হইল।　　　　বশম্বদ

শ্রী রত্নেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

চেৎলা

পাশাপাশি এই পত্রের সমর্থনে এলগিন রোড থেকে জনৈক মহিলা দর্শক আর একটি পত্র লিখেছিলেন যা 'নসীরাম' এর সাফল্যকেই প্রমাণিত করে। যেমন—

শ্রীযুক্ত বাঙলা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

বর্ত্তমান সংখ্যার বাঙলায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা একখানি চিঠি প'ড়ে আমি অত্যন্তই সুখী হ'য়েছি দেখে যে, লেখকের সত্য বল্‌বার মত সাহস আছে। এদেশে এখন সত্য কথা কইবার লোকের বড়ই অভাব ব'লেই সমালোচনার দোহাই দিয়ে "যা তা" লেখা অবাধে চ'লে যাচ্ছে। সত্য সমালোচনা একেবারেই বিরল হ'য়ে উঠেছে। তার পরিবর্ত্তে এসে প'ড়েছে কেবল ব্যক্তিগত বিদ্বেষ—যাহা গাত্র দাহ নিবারণের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। আর্ট থিয়েটারে "নসীরামের" প্রথম রাত্রির অভিনয় আমরাও দেখতে গিয়াছিলাম। সত্য কথা বলতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। এই অন্যায় এবং অসত্যের প্রতিবাদ করবার জন্যই বহুদিনের সঞ্চিত জ্বালা আর চেপে রাখতে না পেরে নারী হ'য়েও কলম ধরতে বাধ্য হ'য়েছি, কারণ যা অসত্য, যা অধর্ম্ম তার প্রতিবাদ আর কেউ না ক'রে তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় আমি করব—কখনই বিমুখ হব না। অন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব করা আমার দ্বারা ঘ'টে উঠবে না।

সেদিন "নসীরাম" অভিনয়ে শ্রদ্ধেয় দানীবাবুর অভিনয়ের মধ্যে একটু আধটু প্রম্পটিং শোনা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু এখন তিনি বৃদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছেন, এতদিন তিনি "অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা" রূপে আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়ে এসেছেন। আজ তাঁর বৃদ্ধ বয়সে যদি কিছু ত্রুটি—বিচ্যুতি ঘটেই থাকে, তার জন্য তাঁর এই বয়সে তাঁকে সমালোচনার তীক্ষ্ণ শরাঘাতে বিদ্ধ করা কি

সমালোচক প্রবরের উচিত কার্য্য হয়েছে? উচিত কথা আমি নিশ্চয়ই বলব এর জন্য আমার নাম "মেয়ে জ্যাঠাই" হোক্ আর আমি মকরাক্ষের "গরুর পুচ্ছই" হই, কিংবা "ছদ্মবেশী পুরুষ"ই হই এই সব অপূর্ব্ব বিশেষণে বিভূষিতা হ'য়েও নির্ভয়ে "সত্য" বলতে—সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে কখনই পশ্চাদ্‌-পদ হব না।

রাধিকানন্দবাবুর "অনাথ নাথের" ভূমিকা অতি সুন্দর হয়েছিল। পত্র লেখক মহাশয় খাঁটি সত্যকথাই লিখেছেন যে অতি বড় নিন্দুকেও তাঁর অভিনয়ের দোষ ধরতে পারবেন না। অনাথনাথের অভিনয়ের আবৃত্তি এবং Expression অতি উচ্চ দরের, এবং উচ্চ শ্রেণীর অভিনেতার যোগ্যই হয়েছিল।

শ্রীমতী ইন্দুবালার "সোনার" অভিনয় এবং গান দুইই এতদূর চিত্তাকর্ষক হ'য়ে উঠেছিল যে আমরা একান্ত বিস্ময়ে অভিভূতা হ'য়ে পড়েছিলাম যে একজন নূতন অভিনেত্রী তার প্রথম ভূমিকাতেই এতটা সাফল্য লাভ করল কি ক'রে। শুধু গান নয়, অভিনয়ও তার অতি সুন্দর, আর হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছিল। গান কয়টি মধুর হ'তেও মধুরতর হ'য়ে এসে প্রাণস্পর্শ করছিল। ইন্দুবালা যে একজন প্রথম শ্রেণীর গায়িকা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। দর্শকবৃন্দও আনন্দে বিহ্বল হয়ে তাকে পুনঃ পুনঃ "এনকোর" দিয়ে উৎসাহিত করে তুলতে বিমুখ হন নি।

না জানি কি নিদারুণ গাত্রদাহের জ্বালায় জর্জ্জরিত হ'য়ে সমালোচক প্রবর এমন সমালোচনা ক'রেছিলেন? এ সমালোচনার কোন মূল্যই আছে কি?

ভবিষ্যতে এরূপ অন্যায় ও অসত্য সমালোচনা চোখে পড়লেই নির্ভয়ে তার তীব্র প্রতিবাদ করতে কখনই ভীতা হব না।

এলাগন রোড পোঃ বিনীতা—
ভবানীপুর, কলিকাতা। মিসেস্ এন. সি. রায়

'নসীরাম' নাটকের সমালোচনা সত্ত্বেও পেশাদার থিয়েটারে এই নাটক থেকেই ইন্দুবালার জয়যাত্রা শুরু। দর্শক সমাজের কাছে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা যে কোন নাটকের পক্ষেই ছিল লাভজনক। এই জন্যে পত্র পত্রিকায় তাঁর স্বপক্ষে অনেকেই প্রস্তাব পেশ করতেন। রঙমহলে নতুন

নাটক বাছাই এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রসঙ্গে তাঁর নামও এসে পড়েছিল। প্রস্তাবক লিখেছিলেন-আগামী ৪ঠা বা ৫ই ফেব্রুয়ারী রঙমহল দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করবে। আমরা যতদূর সংবাদ পেয়েছি, রঙমহলে সপ্তাহে পাঁচদিন অভিনয় হবে। শনি ও রবিবার নাটক ও অন্যান্য তিন দিন অপেরা বা গীতি-নাট্য। ভূপেন্দ্রবাবুর 'শিব ও শক্তি' বা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' নিয়েই বোধহয় যাত্রা সুরু হবে। তবে অল্প সময়ের মধ্যে যদি এই দু'খানি নাটকের অভিনয় আয়োজন সম্ভব হয়ে না ওঠে, তবে, কোন্ নাটক প্রথমে অভিনীত হ'বে বলা যায় না। আর অভিনেতা recruitment না হওয়া পর্যন্ত এই দুটি নাটকের অভিনয় হওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। এক অখ্যাতনামা লেখকের একটি গীতি নাট্যের মহলা নাকি আরম্ভ হয়েছে। যাই হোক কি হয় দেখা যাক্।

* *

রঙমহলে নাকি শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যোগদান করেছেন—তিনকড়ি বাবুর নামও রঙমহলের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে চায়ের দোকানের আলোচনাকে মুখরোচক করে তুলেছে। আরও দু'একজন খ্যাতনামা নট আসছেন। আগামী সপ্তাহে আমরা তাঁদের নাম জানাব।

কিন্তু অভিনেত্রী কোথায়? রঙমহলের এ দিকের Assets ত শ্রীমতী লাইট ও শ্রীমতী চারুবালা। শ্রীমতী সুশালা সুন্দরী নাকি আসবেন, অন্ততঃ সংবাদপত্রের খবর তাই। কিন্তু, আমরা শুনলাম তাঁর যোগদান সম্ভবপর নয়। শ্রীমতী নিভাননী, শ্রীমতী শেফালিকাকে নিয়ে কি অভিনেত্রী-সঙ্ঘ পুষ্ট করা যায় না! গায়িকা হিসেবে শ্রীমতী কমলাবালা (ঝরিয়া) শ্রীমতী ইন্দুবালা অথবা শ্রীমতী বীনাপাণিকে সম্প্রদায় ভুক্ত করা সম্ভবপর নয় কি?

(দুন্দুভি, ১৫ই মাঘ শনিবার ১৩৩৯)

ষ্টারে ইন্দুবালা অভিনীত দ্বিতীয় নাটকের নাম 'বিল্বমঙ্গল'। এই নাটকে ইন্দুবালা পাগলিনীর চরিত্রে দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছিলেন। অবশ্য এই নাটকে ইতিপূর্বে তিনি বহুবার মা রাজবালার দি রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটারেও সাফল্যের সঙ্গে একই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ফলে সেই অভিজ্ঞতাকে পেশাদার থিয়েটারে এসে আরও শাণিত করবার সুযোগ

পেয়েছিলেন ইন্দুবালা। কিন্তু ষ্টারে ইন্দুবালার অভিনয় ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হলেও তাঁর সাজ পোশাক এবং মেকআপ সম্পর্কে 'নবযুগ' পত্রিকা (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) সমালোচনা করে লিখেছিলেন—মধ্যে ইহাদের বিল্বমঙ্গল একদিন দেখিতে গিয়াছিলাম—কারণ ইহাদের নবনিযুক্তা গায়িকা ইন্দুবালা পাগলিনীর ভূমিকা লইবেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। আমরা কিন্তু এঁর পাগলিনীর অভিনয়ের সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। গানগুলি হয়ত সুরে তালে ঠিক হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন একটা রস ছিল না—অর্থাৎ প্রাণ ছিলনা। তারপর সন্থ পাটভাঙ্গা ধোয়া লাল সাড়ী পরিয়া ও সামনের চুলে পাতা কাটিয়া যে পাগলিনী সাজা চলে না, এ কথাটা ইহাকে বুঝাইয়া দিবার মত একটি ক্ষুদ্র আর্টিষ্টও কি আর্ট থিয়েটারে ছিল না; অথচ অপরেশ বাবু, তিনকড়ি বাবু প্রভৃতি মহারথীগণ তাঁরই সঙ্গে অভিনয় করিতেছিলেন।

এই সমালোচনার প্রত্যুত্তর 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত না হলেও 'বাঙলা' পত্রিকার ৩৬শ সংখ্যায় চেৎলা থেকে শ্রীরত্নেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রে তার প্রতিবাদ যথাযথভাবে বিবৃত হয়েছিল। অথচ থিয়েটারে ইন্দুবালার অংশগ্রহণকে অভিনন্দিত করেছিলেন এই 'নবযুগ' পত্রিকার প্রথম যুগ্ম সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। এমন কি মাস তিনেক আগেও (নবযুগ ২০ ভাদ্র ১৩৩২) এই পত্রিকায় তাঁর আগমনকে সম্বর্ধিত করা হয়েছিল। অন্যদিকে, ঐ একই তারিখে 'বাঙলা' পত্রিকা (২০শে ভাদ্র ১৩৩২) ইন্দুবালার অন্তর্ভুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছিলেন, ষ্টার থিয়েটারে "বিল্বমঙ্গল" জমিয়াছে ভাল। দানীবাবু (প্রধান অংশে) তিনকড়িবাবু (ভিক্ষুক) অপরেশবাবু (সাধক), রানী সুন্দরী (চিন্তামণি) ও থুড়থুড়ে কুমুদিনী (থাক) প্রভৃতির অভিনয়ের ত কথাই নাই; এবার বাড়ার ভাগ ইন্দুবালার গান। পাগলিনীর এমন গান অনেক দিন লোকে শুনে নাই। আমরা ইন্দুবালায় ভবিষ্যৎ আছে এইরূপ ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলাম, বিল্বমঙ্গলেই তাহার সুচনা হইয়া গিয়াছে। আজ শুক্রবার সেই বিল্বমঙ্গলই অভিনীত হইবে। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ও অভিনয়—সোনার উপর জড়োয়া বসানো গহনার মত জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিবে।

স্টার থিয়েটারে ইন্দুবালা যোগ দিয়েছিলেন প্রধানতঃ স্টার থিয়েটারের মালিক কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের উৎসাহ ও আমন্ত্রণে। ইন্দুবালার মতে, মিত্র মশায় আমাদের 'ফিমেল কালী'র থিয়েটার দেখতে আসতেন। 'বিল্বমঙ্গলে' আমার অভিনয় দেখে ও গান শুনে এমন খুশী হলেন যে, স্টারে আমায় নিয়ে গিয়ে তবে স্বস্তি পেলেন। আমারও জীবনের একটা বড় সাধ পূর্ণ হল। স্টারে প্রথম প্রথম শুধু গান গেয়েই কাজ সারতে হত। পরে অবশ্য সঙ্গে পুরোপুরি অভিনয়ও যোগ হয়। স্টারে আমার প্রথম নাটক 'নসীরাম'। দানীবাবু 'নসীরাম', আমি 'সোনা'। দানীবাবুর মত বাঘা অভিনেতার পাশে দাঁড়িয়ে পাট করতে হবে শুনে আমার তো হাতে-পায়ে খিল ধরে যাবার জোগাড়। কিন্তু আশ্চর্য স্নেহশীল মানুষ ছিলেন। আমি 'সোনার' পার্ট করছি শুনে জিগ্যেস করলেন, 'কে শেখাল?' অপরেশ বাবু মানে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বললাম। উনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তবে আর ভয় কি?' বাস্তবিক ওনার অভয় না পেলে আমার পক্ষে সুস্থির হয়ে অভিনয় করা সম্ভব হত না। নিজের অভিমান বজায় রাখতে স্টার থিয়েটার ছেড়ে চলে আসি। ঘটনাটা খুলেই বলি। 'বশীকরণ' নাটকের মহলা চলছে, সেই উপলক্ষ্যে রিহার্সাল দিতে গেছি। দাঁড়িয়ে আছি উইংসের পাশে। হঠাৎ দেখি নীহারবালা আসছেন। তখনকার মঞ্চ জগতে নীহার বালার প্রতাপ ছিল অসামান্য। গানে নাচে চেহারায় অভিনয়ে তখন নীহারবালার জুড়ি ছিল না কেউ। থিয়েটারের মালিকরা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে থাকতেন। নীহারবালার দেমাকও ছিল খুব। যাকে তাকে যা খুশী বলে দিতে এতটুকু বাধত না। আমায় তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ বলে বসলেন, 'এ কপাল তোমার হবে না' অর্থাৎ কিনা, নীহার বালার সমকক্ষ হওয়া আমার দ্বারা হবে না। যদিও তাঁকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করতাম, তবুও তাঁর ওই ভাঙ্গা খোঁচাটা আমার বুকে গিয়ে বাজল। মনের দুঃখে অপরেশবাবুর অনুনয় সত্ত্বেও নিজের পোড়া ভাগ্য নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। পরে কুমার বাবুও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, কিন্তু আমার এক কথা, 'নীহারবালার থিয়েটারে আর যাবো না।'

পরবর্তীকালেও ইন্দুবালা তাঁর অভিনয় বা শিল্পী জীবনে এই ভাবপ্রবণতা

এবং আত্ম-সম্মানের ব্যাপারে বহুবার অত্যন্ত কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন।

যাইহোক, ১৩৩২ বঙ্গাব্দে ইন্দুবালা স্টার থিয়েটারে যোগ দেবার পর বছর তিনেকের মধ্যে 'নসীরাম' এবং বিল্বমঙ্গল' ছাড়া আর একটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন তা হল 'নরমেধ যজ্ঞ'। 'নরমেধ যজ্ঞ' নাটকে ইতিপূর্বে তিনি 'কাত্যায়ণী'র চরিত্রে অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল ১৩২৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ বছর সাতেক আগে যখন তিনি মা রাজবালার 'দি রামবাগান ফিমেল কালী থিয়াটার' এ অভিনয় করতেন। ষ্টারে এসে প্রথম পর্য্যায়ের শেষ নাটক 'নরমেধ যজ্ঞ'তেও তিনি পুনরায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ঐ কাত্যায়নীর চরিত্রে অভিনয়ের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এই নাটকেও পূর্বে অভিনয়ের স্নবাদে এবং অভিজ্ঞতায় তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন।

পরের বছর অর্থাৎ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে ইন্দুবালা এসে মনোমোহন থিয়েটারে যোগ দেন * সুনামের দিক থেকে তিনি তখন খ্যাতির শীর্ষে মনোমোহনে ইন্দুবালার প্রথম নাটক 'রক্তকমল'। 'রক্তকমল' শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত সামাজিক সমস্যামূলক একাঙ্ক নাটক। প্রথম অভিনয়ের তারিখ রবিবার ২রা জুন ১৯২৯ সাল।

ভূমিকা লিপি বিজ্ঞাপন অনুযায়ী নিম্নরূপ :

দাদা মশায়—শ্রীনির্মলেন্দু লাহিড়ী, কমল—শ্রীমতী শেফালিকা। পতিত প্রসন্ন—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মমতা—শ্রীমতী সরযুবলা। আনন্দ—শ্রীগণেশচন্দ্র গোস্বামী। করুণা—শ্রীমতী আশালতা।

পূরবী—সুবিখ্যাতা গায়িকা শ্রীমতী ইন্দুবালা।

ছটি চরিত্রের পাঁচটি দৃশ্যের নাটক এই 'রক্তকমল'এর মোট নয়টি গানেরই রচয়িতা ছিলেন স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম। এই নাটকে ইন্দুবালার অভিনয় ও গান সম্পর্কে 'নবশক্তি' পত্রিকা লিখেছিলেন,—"এইবার "রক্তকমল" অভিনয়ের সব চেয়ে বড় আকর্ষণের উল্লেখ করব। তা' হচ্চে পূরবীর ভূমিকায় সুবিখ্যাতা গায়িকা শ্রীমতী ইন্দুবালার গান। পূরবী "রক্তকমল" নাটকের অন্তর্গত কোন চরিত্র নয়। অভিনয়ের পূর্ব্বে প্রতি দৃশ্যের পূর্ব্বাভাস ফুটিয়ে

তুলতে এই চরিত্রটীকে সৃষ্টি করা হয়েচে। এই হিসাবে সে নাটকের গল্পকে এগুতে সাহায্য করে। পূরবী এই পূর্ব্বাভাস ফুটিয়ে তোলেন গানের মধ্যে। এবং এ দ্বারা তার পরবর্ত্তী দৃশ্যের উপযোগী এমন একটা পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি হয় যা' শ্রীমতী ইন্দুবালার মুখে কাজী নজরুল ইসলামের এই গানগুলি শোনবার পূর্ব্বে সম্ভব বলে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন হ'ত। শ্রীমতী ইন্দুবালার গান গ্রামাফোন রেকর্ডে অনেকেই শুনেচেন। তাঁর মত গাম্ভীর্যময় উচ্চ সুরেলা কণ্ঠ বাঙলা ষ্টেজে আর কারুর আছে বলে আমাদের জানা নেই। কথার তুলিতে কাজী যে ছবি আঁকেন, সুরের আগুনে তা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে শ্রীমতী ইন্দুবালার কণ্ঠে। সে গান ও সে সুর আমরা কখনো ভুলতে পারব বলে মনে হয় না।

গীতিরচনায় বৈশিষ্ট্যটুকু নজরুলের কবিত্বপূর্ণ "রক্তকমলে"র নয়খানি গানেই সুপরিস্ফুট হয়েচে। "ফাগুন রাতের ফুলের মায়ায় আগুন-জ্বালায় জ্বালাতে আসে," "দারুণ পিপাসায় মায়া-মরীচিকায় চাহিতে এলি জল বনের হরিণী"। "কেউ ভোলে না কেউ ভোলে" প্রভৃতি গানগুলি আর মাসান্তের পূর্ব্বেই সারা কলকাতার সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হবে—নজরুল ইসলামের অসাধারণ জনপ্রিয়তার খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই এ কথা জোর করে বলবেন।"

* অন্যদিকে 'কুরুক্ষেত্র' পত্রিকায় লেখা বেরিয়েছিল,—

প্রতি দৃশ্যের পূর্বে এক বিশেষ দৃশ্যপটে একটি নবীন গায়িকার আবির্ভাব ও দৃশ্যের আখ্যান বস্তুর একটা পূর্বাভাস প্রদানার্থ নানা রাগিনীর সংযোগে সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন—ইহা এযুগে একটা নূতন ব্যাপার। গায়িকাটি গাহিয়াছেন অতি চমৎকার এমন সুগায়িকা রঙ্গমঞ্চে খুব বেশী বোধহয় নাই, তাঁহার গান আমাদের তৃপ্তি দান করিয়াছে; সে বিষয়ে আমরা কলহ করিব না। কিন্তু এ ঘটনাটা হইল কি? নাট্যকার শচীন্দ্রবাবু কি প্রাচীন গ্রীক থিয়েটারে সেই Chorus কে এই বিংশ শতাব্দীর রঙ্গালয়ে 'পূরবীর' ছদ্মবেশে নূতন করিয়া চালাইতে চাহেন? চলিবে না চলিবে না। নাটকের অভিনয় কথকতা নয়। প্লটের সহিত যাহার সম্পর্ক নাই, সে ব্যক্তিকে অভিনয়কালে আমরা ষ্টেজের উপর দেখিতে চাই না। —তিনি যতই সুন্দর গান করুন বা যতই সুন্দর অভিনয় করুন!

অবশ্য এই প্রসঙ্গে আলোচনার গোড়ায় প্রতিবেদক বলেছেন, অভিনয় ও প্রযোজনা গুণে নাটকখানি মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে মনোরম মূর্তি ধারণ করিয়াছে। প্রযোজক শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ী এই রক্তকমলকে যে আলো হাওয়ার আবেষ্টনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা বঙ্গ নাট্যশালায় নূতন একথা অসঙ্কোচে বলা যায়।

প্রকৃতপক্ষে 'রক্তকমল' নাটকের বড়ো আকর্ষণই ছিল নজরুল ইসলাম রচিত ইন্দুবালার কণ্ঠের গান। আর এরই ফলে অভিনয়ের সময় অধিকাংশ গানগুলি দর্শকের অনুরোধে দু'তিন বার করে গাইতে হত। যদিও ইন্দুবালা পূরবীর গানগুলি অন্ধকারেই গাইতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দর্শক বা শ্রোতারা তা যথেষ্ট উপভোগ করতেন বলে জানা যায়।

'রক্তকমলে'র সাফল্যের পর মনোমোহনে ইন্দুবালার দ্বিতীয় নাটক 'বিষবৃক্ষ'। 'শিশির' পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশ করতে গিয়ে সংবাদদাতা জানিয়েছিলেন—একদিন স্টারে বিষবৃক্ষ নাটকে শ্রীমতী আশ্চর্যময়ী ও শ্রীমতী সুবাসিনীর সঙ্গীত সংগ্রাম দেখিবার জন্য কলিকাতার সহর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। মনোমোহন এইবার বিষবৃক্ষে ইন্দুবালা ও সুবাসিনীর সঙ্গীত সংগ্রামের আয়োজন করিয়া দর্শকদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এরূপ Combination হয়ত আর নাও হইতে পারে। সুতরাং সুযোগ থাকিতে দর্শকেরা দেখিয়া লইতে ভুলিবেন না।

অভিনয়ের পর 'ভোটরঙ্গ' পত্রিকা প্রশংসা করে জানালেন—এই অভিনয়ের সব চেয়ে আকর্ষণের বস্তু ছিল— ইন্দুবালার দেবেন দত্ত, ও শ্রীমতী সুবাসিনীর হীরা। দুইজন শ্রেষ্ঠ গায়িকার এক সঙ্গে প্রতিযোগিতা বড়ই আকর্ষণের জিনিষ। শ্রীমতী ইন্দুবালার দেবেন দত্ত দেখে আমরা বড়ই আনন্দ উপভোগ করেছি। ইনি শ্রীমতী আশ্চর্যময়ীর 'দেবেন দত্তকে'ও ছাড়িয়ে গেছেন মনে হল।

এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে 'কুরুক্ষেত্র' পত্রিকায়। সংবাদদাতা এখানে লিখেছেন—দুর্গেশনন্দিনীর আসরে বসিয়া পড়ায় বিষবৃক্ষ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি। এক নাট্যামোদী বন্ধুর নিকট শুনিলাম দেবেন্দ্র দত্ত ভূমিকায় শ্রীমতী ইন্দুবালা অতি উচ্চদরের সঙ্গীতালাপ করিয়াছিলেন—এমন কি শ্রীমতী সুবাসিনীও নাকি তাঁহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন।

যাই হোক দানীবাবুর অভিনয় ছাড়া মনোমোহনের বিষবৃক্ষের বড় আকর্ষণই ছিল ইন্দুবালার দেবেন্দ্র আর সুবাসিনীর হীরা। এবং রঙ্গালয়ের দুটি শ্রেষ্ঠা গায়িকার গান এক সঙ্গে শোনবার সুযোগ খুব কমই পাওয়া যেত বলে সকলেই এই নাটকের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া, শুধু গান শুনিয়েই

নয়, অভিনয় দিয়েও এঁরা নাটককে চমৎকার জমিয়ে তুলেছিলেন।

মনোমোহন থিয়েটারে যোগ দেবার পূর্বে ইন্দুবালা প্রায় বছর চারেক (১৯২৭—১৯৩০) পেশাদারী মঞ্চ থেকে কিছুটা দূরে থাকেন। কেননা, সঙ্গীতের আসরে তখন তিনি সত্যিই সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী। কিন্তু মঞ্চ তাঁকে যে ভেতরে ভেতরে টানত। ফলে আবার মঞ্চের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন ইন্দুবালা। তিনি বলেছেন,—চার বছর পর আবার মঞ্চে নাবলাম। সময়টা মনে আছে—তেরশ ছত্রিশ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। তবে স্টারে নয়, মনোমোহন থিয়েটারে। নিয়ে গেছলেন প্রবোধ গুহ। উনি আগে ছিলেন স্টারের ম্যানেজার, পরে মনোমোহন থিয়েটারে যোগ দেন। মনোমোহন থিয়েটারের কর্তা ছিলেন অনাদিনাথ বসু। এই অনাদিবাবুই অরোরা ফিলম্ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ওনাকে আমি 'বাবা' বলে ডাকতাম। উনিও আমাকে 'মা ইন্দু' বলে স্নেহ করতেন। যাই হোক, এলাম তো মনোমোহন থিয়েটারে। প্রথম নাটক হল 'রক্তকমল'। কাজীদার সুর দেওয়া গানে গলা দিতে হত আমায়। আমার চরিত্রের নাম ছিল 'পূরবী'। অভিনয়ের চেয়ে গানের অংশই ছিল মুখ্য। সাকুল্যে চারটি মাত্র গান হলে কি হয়, দর্শকদের বায়না মেটাতে আমায় প্রায় বার কুড়ি গাইতে হত। শুধু দর্শকদের প্রশংসাই নয়, তখনকার সব কাগজেও আমার 'রক্তকমলে'র গানের ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশংসা বেরিয়েছিল। অবশ্য আমার সাফল্যের মূলে ছিলেন কাজীদা।

মনোমোহন থিয়েটারে ছিলাম ন' মাস। টাকা পয়সার ব্যাপারে গণ্ডগোল বাধল বলে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম। ন' মাসের মধ্যে মাত্র দু মাসের মাইনে পেলে কার আর লেগে থাকতে ইচ্ছে হয়? তবে কি, রোজই প্রচুর খাওয়া জুটত। সেটাকেই পাওনা বলে মেনে নিয়ে মনকে প্রবোধ দিতে হল শেষে। মাইনে চাইবার জো ছিল কি! চাইলেই প্রবোধবাবু সকলকে শুনিয়ে ঠাট্টা করে বলতেন, 'লক্ষ্মীর মা ভিক্ষে চাইছে।'

মনোমোহন থিয়েটারে ন'মাস ছিলাম বটে, কিন্তু নাটক করেছি কম নয়। কত বিচিত্র চরিত্রেই না অভিনয় করেছি···মনোমোহন থিয়েটারে অভিনয় শেখাতেন স্বয়ং দানীবাবু। আর গানের মাস্টার ছিলেন কাশীনাথ চাটুজ্যে।*

* সূত্র: অতীত দিনের স্মৃতি—ইন্দুবালা।

মনোমোহন থিয়েটারে 'বিষবৃক্ষ' নাটকে ইন্দুবালার অভিনয় নাট্যরসিক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। ইন্দুবালা নিজেও বহুবার এ প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের কাছে বলেছেন যে, দর্শকদের অনুরোধে প্রতি শো'তেই একই গান তাঁকে বহুবার গাইতে হত। এমন কি দেবেন্দ্র বেশী ইন্দুবালাকে একটি গান একবার পর পর আঠেরো বার গেয়ে দর্শকদের সন্তুষ্ট করতে হয়েছিল। পুরুষ দেবেন্দ্রর ভূমিকায় তাঁকে চমৎকার মানাত। তাঁর গলার গানের সঙ্গে দেবেন্দ্র চরিত্রটিও একেবারে মিশে গিয়েছিল বলে জানা যায়। 'বিষবৃক্ষ' নাটকে ইন্দুবালা তাঁর গান গাইবার স্মৃতি প্রসঙ্গে একবার লিখে জানিয়েছিলেন। নৈহাটীতে ১৯৬৭ সনে শ্রীমতী গৌরী বসুকে লেখা একটি পত্রে তিনি লিখেছেন,...আমার জীবনেও বহুবার এরকম বিপদে পড়েছি, একবার এমন কাণ্ড হল, মনমোহন থিয়াটারে। ১৩৩৬ সাল, বিষবৃক্ষ বই। প্রথম অভিনয় রজনী, দানীবাবু নগেন্দ্র, শ্রীশ নির্মলেন্দু লাহিড়ী। সরযুবালা কুন্দনান্দিনী, হীরা ঝি সুবাসিনী, তখনকার বিখ্যাত গায়িকা, দেবেন্দ্র ইন্দুবালা, ১৮ খানি গান সমেত আগাগোড়া পার্ট, ব্যাস কয়েকদিন রোজ মজুরা করে গলা একেবারে বন্ধ। ফিস্ ফিস্ কথা কচ্চি। মালিকদের পায়ে ধরে অনুরোধ করলাম, বল্লেন অসম্ভব। সুবাসিনী ইন্দু জুটী গায়িকা, ফুল হাউস টিকিট ফেরত নেবেনা, উল্টে চেয়ার ইত্যাদি ভেঙ্গে তচনচ্ করে দেবে। মাকে বল্লাম আত্মহত্যা করতে হবে মা, মা বল্লে আমার আশীর্বাদ আর আমি তোর মদ তৈরী করে দেব কারণ দেবেন্দ্র মাতাল বড় টপ্পা গায়ক। কুন্দর জন্যে দিনরাত মাতলামী। দেবেন্দ্র হীরা ডুয়েট টপ্পা গান (ভালবাসিবে বলে ভালবাসি না) সাংঘাতিক গান আর গানের কাজও যথেষ্ট, মধ্যমান তাল। বোঝ! মায়ের ওষুধ নিয়ে শুরু হল আমার অভিনয় গান, আর গেলাস গেলাস মদ ও তামাক চলছে। হ্যাঁ মা ওষুধ বটে, এমন ধীরে ধীরে গলা উঠল যে মাৎ হয়ে গেল অডিটোরিয়াম। ক্লাপ অজস্র। থামেনা ১টা গান ২/৩ বার করে। পরে শততম রজনী হয়েছিল...'। (গৌরী বসুকে লেখা ইন্দুবালার পত্র ১৩ই অক্টোবর ১৯৬৭ শুক্রবার ৺বিজয়া দশমী)

ইন্দুবালা অভিনীত মনোমোহন থিয়েটারে নাটকের সংখ্যা মোট এগারো। যেমন—রক্তকমল, বিষবৃক্ষ, জাহাঙ্গীর, মহুয়া, দক্ষযজ্ঞ, তপোবল,

সাজাহান, পরদেশী, বলিদান, মীরাবাঈ ও প্রফুল্ল। মনোমোহনে এই এগারোটি নাটকে ইন্দুবালা যে সমস্ত চরিত্রে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ থেকে অভিনয় করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উন্নীত হয়েছিলেন তা হল,

(১) রক্তকমল—পূরবী

(২) বিষবৃক্ষ—দেবেন্দ্র

(৩) জাহাঙ্গীর—হুসিয়ার

(৪) মহুয়া—রাধুপাগলী

(৫) দক্ষযজ্ঞ—তপস্বিনী

(৬) তপোবল—বেদমাতা/সদানন্দ

(৭) সাজাহান—পিয়ারা

(৮) পরদেশী—সাকিয়া

(৯) বলিদান—জোবী

(১০) মীরাবাঈ—মীরাবাঈ

(১১) প্রফুল্ল—মাতাঙ্গনী

সে যুগে মনোমোহনের অভিনয় ছিল নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর শিল্পীমণ্ডলীর মধ্যে বাংলার প্রথিতযশা অনেক শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল। সেই কারণে এদের বিজ্ঞাপনের নমুনা ছিল এইরূপ :—

কি অভাবনীয় অভিনেতৃ সম্মেলনে

মনোমোহনে

অভিনয় হয় নিম্নে তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)

শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।

শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সরকার।

শ্রীকুঞ্জলাল সেন।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দত্ত।

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ।

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীগনেশচন্দ্র গোস্বামী।

শ্রীনীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীবিজয়কার্ত্তিক রায়।
শ্রীননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীহরিদাস ঘোষ।
শ্রীকালীচরণ গোস্বামী।
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ।
শ্রীমতী শশিমুখী।
শ্রীমতী ঊষাবতী।
শ্রীমতী সরযূবালা।
শ্রীমতী অন্নদাময়ী।
শ্রীমতী নিরুপমা।
শ্রীমতী ফুল্লনলিনী।
শ্রীমতী আঙ্গুরবালা।
শ্রীমতী কালীদাসী।
শ্রীমতী প্রমিলাবালা।
শ্রীমতী রাধারাণী।
শ্রীমতী মলিনাবালা।
শ্রীমতী তারকবালা।
শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাস।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকালীপদ গুপ্ত।
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীমতী ইন্দুবালা।
শ্রীমতী প্রকাশমণি।
শ্রীমতী আশালতা।
শ্রীমতী শেফালিকা।
শ্রীমতী সন্তোষকুমারী।
শ্রীমতী প্রমোদিনী।
শ্রীমতী পটলমণি।
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী।
শ্রীমতী কমলাবালা।
শ্রীমতী বীণাপাণি।
শ্রীমতী মণিবালা।
শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী।

এই সময় কোন এক বিজ্ঞাপনে শ্রীমতী শশিমুখীকে মনোমোহন কর্তৃপক্ষ 'বঙ্গের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী' বলে বিজ্ঞাপিত করায় বিজয়রত্ন মজুমদার সম্পাদিত 'বাঙলা' পত্রিকায় ময়মনসিংহ (জামালপুর) থেকে শ্রীসুধীর কুমার বসু নামে জনৈক অভিজ্ঞ দর্শক ও থিয়েটারপ্রেমীর দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়।

মনোমোহনে ইন্দুবালার 'জাহাঙ্গীর' নিঃসন্দেহে তখন বহু আলোচিত নাটক। হুসিয়ারের চরিত্রে ইন্দুবালার গান ও অভিনয় প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় সেকালে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

'জাহাঙ্গীর' নাটকের চরিত্রলিপির বিজ্ঞাপন ছিল নিম্নরূপ :

মনোমোহন—জাহাঙ্গীর।

শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত পঞ্চম ঐতিহাসিক নাটক। প্রথম অভিনয় তারিখ—১০ই পৌষ ১৩৩৬।

মূল ভূমিকা লিপি :

জাহাঙ্গীর—দানীবাবু। নূরজাহান—শশিমুখী।
সাজাহান—নির্মলেন্দুবাবু। মমতাজ—উষাবতী।
যশোবন্ত—দুর্গাদাসবাবু। জাহানারা—শেফালিকা।
সুন্দরলাল—মনীন্দ্রবাবু। মহামায়া—আশালতা।
মণিজা—সরযূবালা। হুসিয়ার—ইন্দুবালা।

এই নাটকে ইন্দুবালার অভিনয় ও গানের প্রশংসা যা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন—'নবশক্তি' ও 'ভোটরঙ্গ'তে প্রকাশিত হয়েছিল তা উল্লেখ করে বিরাট হ্যাণ্ডবিল সেকালে প্রচারের উদ্দেশ্যে বিলি করা হয়েছিল।

মনোমোহনে 'মহুয়া' নাটকেও ইন্দুবালার অভিনয় যথেষ্ট সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এটি ছিল শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় কর্তৃক মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত মহুয়ার পালাগান অবলম্বনে রচিত নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক এবং মোট পাঁচটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার এটি সর্বপ্রথম মনোমোহনে অভিনীত হয়। নরনারীর মনের যে প্রেম চিরন্তন মৈমনসিং গীতিকার অন্তর্গত মহুয়ার পালাগান তারই ভিত্তির ওপরে রচিত। মন্মথ রায় তখন একান্তই তরুণ নাট্যকার। মহুয়ার ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :—

মূল ভূমিকা লিপি :

নদের চাঁদ—দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহুয়া—সরযূবালা।
হুমড়া—নির্মলেন্দু লাহিড়ী। পালঙ্ক—ফুল্লনলিনী।
সুজন—প্রভাত সিংহ। রাধু পাগলী—ইন্দুবালা

ভোটরঙ্গের মতে, মনোমোহনের 'মহুয়া' নাটক হিসাবে আজিকার বাজারের শ্রেষ্ঠ নাটক, একথা সহজেই বলা চলে—অবশ্য কবিগুরুর তপতীকে

সসম্মানে আলাদা করে রেখে। মহুয়া একখানি নাটক নয়, একখানি নাট্য-কাব্য। ছত্রে ছত্রে এর কাব্যরস। যথার্থ নাট্যরসিকের হৃদয় স্পর্শ করবার মতোই বটে। অভিনয়েও নির্মলেন্দুবাবু, দুর্গাদাসবাবু, প্রভাতবাবু, গনেশ বাবু। সরযূবালা, ফুল্লনলিনী, ইন্দুবালা সকলেই এই কাব্যরসটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম মহুয়ার জন্যে বিশেষভাবে কয়েকখানি গান লিখে দেন। এবং বলা বাহুল্য নজরুলের সেই গানগুলিকে ইন্দুবালা যথাযথভাবে তাঁর কণ্ঠে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই কারণে 'বৈতালিক' পত্রিকা লিখেছিলেন, রাধুপাগলীর ভূমিকায় শ্রীমতী ইন্দুবালার গীত লহরী সমস্ত শ্রোতার কানকে পরিতৃপ্ত করেছে।

এই নাটকের জন্যে নজরুল লিখেছিলেন 'আজি ঘুম নহে নিশি জাগরণ', 'ও ভাই আমার এ নাও যাত্রী না লয়', 'কে দিল খোঁপাতে ধুতুরার ফুল লো' প্রভৃতি গান। ইন্দুবালার কণ্ঠে সবগুলিই যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল বলে জানা যায়। 'বৈতালিক', 'শিশির', 'বাঙলা' ও অন্যান্য অনেক পত্র-পত্রিকাতেই এই নাটকের গান উচ্চ প্রশংসিত হলেও ব্যতিক্রম 'কুরুক্ষেত্র'। এই পত্রিকার নাট্য সমালোচনা বিভাগে 'মনোমোহনে মহুয়া' শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনায় নাট্য সমালোচকের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে কটূক্তির পরিমাণও কম ছিল না। যেমন, 'প্রযোজনার দিক দিয়া পরিচয় দেবার মতন কিছুই হয় নাই। Material থাকা সত্ত্বেও নাটকখানি ভাল করিয়া সাজান হয় নাই। অতিরিক্ত ও অবাস্তব কল্পনাকে বাদ দেওয়া সমীচীন। দর্শক সংখ্যা দেখিয়া বড়ই নিরাশ হইয়াছি। বড়ই দুঃখের বিষয় মন্মথ বাবুর 'শ্রীবৎস' ও 'মহুয়া' নাটক দুইখানির একখানিও জমিল না। কবি নজরুলের Patent সুরগুলিতে অভিনয়ের গানগুলি কোথাও ভাল জমিতে দেখিলাম না।

মনোমোহনের Programme সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক। ৭ খানি গান ও ৫ দৃশ্যের নাট্রোলিখিত ব্যক্তিগণের নাম ভিন্ন আর কিছুই তাহাতে নাই। মূল্য দুই আনা মাত্র।'

এই পত্রিকা ইন্দুবালার সম্পর্কে লিখেছিলেন—চতুর্থ অঙ্কে রাধুপাগলী বেশে শ্রীমতী ইন্দুবালাকে দেখিতে পাই। তাহার 'ও ভাই আমার এ নাও

যাত্রী ভাঙ্গা না লয় আমার তরী' গানখানি আদৌ আমাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। তাহার সুরের অনুরূপ "মানীক—পীরই-ই-র" কথাটি বসাইলে আরও কৌতুক অনুভব হইত। রাধু পাগলীই তাহার উপযুক্ত বেশ ; ঐ বেশেই এখন তার তীর্থ পর্যটন দরকার।

যদিও সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত 'নাচঘর' (৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যায়) ইন্দুবালার অভিনয় ও গানকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অভিনন্দিত করেছেন। এঁদের মতে পুরুষের বেশে যে সব নারী অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের ভিতরে সব-চেয়ে ভাল করেছিলেন শ্রীমতী ইন্দু ("হুসিয়ার")। তাঁর গানগুলি অন্যতম উপভোগ্য ব্যাপার। গম্ভীর, জোরালো ও ভারী কণ্ঠের জন্যে শ্রীমতী ইন্দু এখনকার বাংলা রঙ্গালয়ে অদ্বিতীয়তার দাবী করতে পারেন।

মহুয়া নাটকটি সেকালে অনেকেই গোড়ার দিকে বুঝতে পারেন নি। তাছাড়া folk music-এর প্রচলন তখন তেমন ছিল না। শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'ষোড়শী' নাটকে প্রথমে গাজনের গান অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন কিন্তু সাধারণ দর্শক তখনও তা বুঝতে পারেন নি। নাচঘরের ভাষ্যানুযায়ী,—

'Folk musicকে শিশিরকুমার জাগ্রত করিয়াছেন। Folk music-এর সহিত প্রাণের কি একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে, একটা কি অদ্ভুত thrill আছে, কি একটা উন্মাদনা আছে, তাহা মহামতি Tolstoi বহুপূর্বে বলিয়া গিয়াছিলেন এবং ইউরোপ দীর্ঘকাল Tolstoi-এর এই মতকে ব্যঙ্গ করিয়া এখন অবনত মস্তকে Tolstoi-এর মতকেই সমর্থন করিয়া Folk music-কে প্রথম শ্রেণীর Music-এর মধ্যে স্থান দিতেছেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি কাজী নজরুলের সঙ্গীতের আমরা বিশেষ ভক্ত—তাহার গজল বা ঠুংরী সুরের গান অপূর্ব। বাউল, কীর্তন, ভজন, গাজনের গান, গর্ব্বা ইত্যাদির মধ্যে যে কি effect আছে এবং সে effect কত গভীর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন—এবং সেই কারণেই ওস্তাদেরা Classical Music এর পরিপন্থী এই শ্রেণীর গানের এত বিদ্বেষী।

শ্রীমতী ইন্দুবালার গান 'মনোমোহনে' একটি বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর অভিনয়ও ভাল। তাহার ন্যায় সুগায়িকা, এমন সুন্দর মীড়, গমক গিটকিরী,

এমন তালের উপর অসাধারণ ক্ষমতা কোন গায়িকার মধ্যে আমরা পাই না। মহুয়ায় তাহার গানগুলি অতি সুন্দর। পিয়ারার ভূমিকায় তিনি যে গান গাহিয়াছেন তাহা এত সুন্দর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে সেইরূপ গীত দ্বিজেন্দ্র-লালের অপূর্ব শিক্ষকতায় ৺সুশীলার মুখে ব্যতীত আর কখনও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে শুনি নাই। যাঁহারা ইন্দুবালার গীত সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা কাগজে করেন তাঁহারা গান সম্বন্ধে একেবারে নিরেট এবং এইরূপ সমালোচনার দ্বারা নিজেদের অসীম অজ্ঞতাই প্রচার করেন।'

মনোমোহনে 'মহুয়া'র পর ইন্দুবালা দক্ষযজ্ঞ, তপোবল, সাজাহান পরদেশী, বলিদান, মীরাবাঈ এবং প্রফুল্ল নাটকে অভিনয় ও গানে অংশগ্রহণ করে পরবর্তীকালে সেই সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। বিশেষ করে 'তপোবল' নাটকে 'বেদমাতার গান' সাজাহানে পিয়ারা, মীরাবাঈতে মীরাবাঈ। প্রফুল্ল নাটকে মাতালনীর ভূমিকায় তাঁর গান তাকে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা দান করে।

১৯৩০ সালে ৮ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গলার সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নট শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী এম. এ আমেরিকা যাত্রা করেন।

শিশির ভাদুড়ীর আমেরিকা যাত্রার মাস তিন-চার পরেই ইন্দুবালা মাইনে পত্তর না পাওয়ার ফলে মনোমোহন থিয়েটার ছেড়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে আমন্ত্রণ পেলেন নতুন থিয়েটার 'জুপিটার সিনেমা এ্যাণ্ড ভ্যারাইটি প্যালেসে'র কাছ থেকে। ইন্দুবালাও তখন নতুন সুযোগের অপেক্ষায় প্রস্তুত ছিলেন। এই নতুন কোম্পানীর থিয়েটার হলটি ছিল তাঁর বাড়ির খুব কাছে। যাতায়াতেরও খুব সুবিধা। কয়েক পা এগোলেই থিয়েটার। তাছাড়া এই থিয়েটার হলটি তৈরীর ব্যাপারে তদারক করেছিলেন স্বয়ং বরদা -প্রসন্ন দাশগুপ্ত। বরদাপ্রসন্নবাবু দীর্ঘকাল ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত Baudmau Opera Company তে দীর্ঘকাল সহকারী রূপে হাতে কলমে কাজ করে এসেছেন। ফলে ইউরোপীয় নাট্যকলা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা বাংলার নাটকে যুক্ত হয়ে নাট্য মঞ্চকে পরিপুষ্ট করবে এই আশায় ইন্দুবালার মত অনেকেই জুপিটারের ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিলেন।

১৯৩০ সালে খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর (বড়দিনের দিন) সন্ধ্যায় মহা আড়ম্বরের সঙ্গে ময়মনসিংহের মহারাজা সদ্যনির্মিত থিয়েটার 'জুপিটার সিনেমা এ্যাণ্ড ভ্যারাইটি প্যালেসের' উদ্বোধন করেন। জনৈক ধনী মুসলমান ব্যক্তি ছিলেন এর মালিক।

ইন্দুবালার মতে, 'মনোমোহন থিয়েটার ছাড়ার পর কাজ জুটল জুপিটার সিনেমা এ্যাণ্ড ভ্যারাইটি প্যালেসে। মাইনে ঠিক হল মাসিক তিনশো টাকা। জুপিটারে কেবল শনি ও রবিবার নাটক হত। অন্যান্য দিন শুধুই বায়োস্কোপ। এই 'জুপিটার'ই নাম বদলাতে বদলাতে এখন 'লিবার্টি' নাম নিয়েছে। এখানে আমার প্রথম নাটক বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের লেখা 'একলব্য'। নায়িকা চিত্রার ভূমিকায় পার্ট করেছিলাম। গান আর অভিনয় গুনে এখানেও সকলের আদর কেড়ে নিতে পেরেছিলাম। জুপিটারে গান শেখাতেন ভূতনাথ দাশ আর অভিনয় শিখতাম মন্মথনাথ পাল ওরফে হাঁদুবাবুর কাছে।'

জুপিটার থিয়েটারও নানাকারণে দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশী দিন চালানো সম্ভব হয় নি। ফলে শিল্পীদেরও একে একে ছেড়ে দিতে হল। বাধ্য হয়ে প্রায় আটটি নাটকে অংশ গ্রহণের পর ইন্দুবালাকেও জুপিটার ছেড়ে চলে আসতে হয়।

কিন্তু কলকাতার চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (বিডন ষ্ট্রীটের সন্নিকটে) নূতন আমোদ প্রাসাদ 'জুপিটার সিনেমা এণ্ড ভ্যারাইটী প্যালেস' নামে থিয়েটারটি ছিল খুবই প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন। কেননা সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও নাট্য ভবনটি নাট্যকার বরদাবাবুর (বরদা দাশগুপ্ত) পরিচালনায় নির্মিত হয়েছিল। ফলে ইন্দুবালা ১৯৩০ সালে এই থিয়েটারের গোড়া থেকেই এসে প্রায় যুক্ত হন। এঁদের প্রথম নাটক 'তপোবল'। এর অভিনয়াংশে যোগ দিয়েছিলেন, শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, যশস্বী গায়ক মিঃ কে মল্লিক, সুরের রাজা শ্রীভূতনাথ দাস, নৃত্যশিল্পী শ্রীভূপেন চ্যাটার্জ্জী, সুধাকণ্ঠী শ্রীমতী ইন্দুবালা, শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী নীরদা সুন্দরী, শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী (A New star) শ্রীমতী ফিরোজাবালা (নেনী) শ্রীমতী সুশীলা বালা। শ্রীমতী হিঙ্গন (হিনি) ইত্যাদি।

আগেই বলেছি, জুপিটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন জনৈক মুসলিম যিনি এর উন্নতিকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। প্রথম নাটক 'তপোবল' শ্রীফনীভূষণের (বিদ্যাবিনোদ) পুরাতন নাটকটি নয়, এটি আসলে পরিচালক বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রণীত অভিনব পৌরাণিক গীতবহুল নাটক। জুপিটারের প্রাচীর বিজ্ঞাপনী'তে এইসব তথ্য গোড়ায় প্রকাশিত হয়। ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে বড়দিনের সন্ধ্যায় নাটকটি প্রথম প্রদর্শিত হয়।

জুপিটারে ইন্দুবালা মোট ৮টি নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেমন :—

১। একলব্য—চিত্রা
২। পরীস্থান—হাসান
৩। শ্রীদুর্গা—বিজয়া
৪। জয়দেব—পরাশর
৫। সত্যভামা—মধুকর
৬। বরুণা—বরুণা
৭। খাসদখল—গিরিবালা / মুচিরাম
৮। তপোবল—বেদমাতা

জুপিটারে অভিনয় আরম্ভের আগেই 'বাঙলা' পত্রিকা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বয়স সম্পর্কে কটূক্তি বর্ষণ সুরু করে। অবশ্য এর প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় 'কুরুক্ষেত্র' পত্রিকায় (৪ঠা পৌষ শনিবার ১৩৩৭)।

'একলব্য' নাটকে অভিনয় করে ইন্দুবালা অজস্র প্রশংসা ও কিঞ্চিৎ নিন্দাকে সমানভাবে কুড়িয়েছিলেন। 'আত্মশক্তি' পত্রিকার মন্তব্য ছিল, 'গায়িকা ইন্দুবালাকে দিয়ে অভিনয় না করালেই ভাল হ'ত।' আবার পাশাপাশি কয়েকটি প্রশংসাসূচক মন্তব্যও করা হয়েছিল। যেমন—

(ক) শ্রীমতী ইন্দুবালার গানের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।
ইন্দুবালা যে অভিনেতৃ রূপেও উচ্চ স্থানের অধিকারিণী তাহার পরিচয় আমরা পাইলাম চিত্রার ভূমিকায়।

[কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক, সম্পাদক 'ভোটরঙ্গ'
২২শে পৌষ ১৩৩৭]

(খ) চিত্রার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীমতী ইন্দুবালা। এতদিন শুধু তাঁহাকে গায়িকা বলিয়াই জানিতাম এখন দেখিতেছি তিনি একজন বড় অভিনেত্রী।

[শিশির]

(গ) মিঃ কে মল্লিক ও কলিকাতার খ্যাতনাম্নী গায়িকা ইন্দুবালার গান কয়খানি খুবই সুন্দর ও উপভোগ্য হইয়াছিল। ইন্দুবালা, নীরদাসুন্দরী ও সুশীলাসুন্দরীর অভিনয়ও সুন্দর।

—য়্যাডভান্স-২৮।১২।৩০

(সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ)

যাই হোক্, ইন্দুবালার সবগুলি গানই ছিল 'একলব্য' নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বিশেষতঃ 'ওরে ও বনের পথ ভোলা—' গানটি মঞ্চের মধ্যে রীতিমত স্বপ্নালোকের সৃষ্টি করত। এর ফলে বসুমতী পত্রিকার মন্তব্য ছিল, সুগায়িকা মিস ইন্দুবালার সুরের স্বচ্ছন্দলীলা সঙ্গীতপ্রিয় সমাজের চিত্ত বিনোদন করিবে। এমন কি ইংরেজী Statesman পত্রিকাও বলেছিলেন, ইন্দুবালার গান কয়খানি বিশেষ উপভোগ্য।

জুপিটারে ইন্দুবালা যখন সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে যাচ্ছেন সেই পর্বে বছর তিনেক পরেই ২৮শে নভেম্বর সোমবার ১৯৩৪ বেলা দশটা পঞ্চাশ মিনিটে বাগবাজার বসুপাড়া লেনের বাড়িতে দানীবাবু অর্থাৎ নাট্যাচার্য সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

দানীবাবুর সঙ্গে ইন্দুবালার পরিচয় ছোটবেলা থেকে। রামবাগানে যখন মা রাজবালা ফিমেল কালী থিয়েটার খুলেছিলেন তখন মেয়েদের অভিনয় শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন এই দানীবাবুরই প্রিয় শিষ্য যোগীন্দ্রনাথ সরকার। ফলে গিরিশ পুত্র দানীবাবুর অভিনয় শৈলীর সঙ্গে ইন্দুবালা বাইশ বছর বয়স থেকেই অর্থাৎ ১৯২০—২১ সাল থেকেই সুপরিচিত। তাছাড়া, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে যখন ইন্দুবালা স্টার থিয়েটারে এসে পেশাদারী মঞ্চে 'নর্সীরাম' নাটকে আত্মপ্রকাশ করলেন তখনও এই দানীবাবুই ছিলেন মূল অভিনেতা এবং শিক্ষক। এমন কি মনোমোহন থিয়েটারে

ইন্দুবালার নয় মাসের মধ্যে অভিনীত এগারোটি নাটকেও সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বা দানীবাবুই ছিলেন তাঁর প্রধান অভিনয় গুরু। ফলে সেই অগ্রজ অভিভাবক স্বরূপ নাট্যশিক্ষকের মাত্র চোষট্টি বছরে (১৯৩৪ খৃঃ) মৃত্যুর সংবাদে ইন্দুবালা অকস্মাৎ বেদনায় ভেঙে পড়লেন। জুপিটার থিয়েটারে চলে আসার পর মন আরও ভারাক্রান্ত হয়ে রইল শুধু দানীবাবুর মৃত্যুতে।

জুপিটার ছেড়ে আসার পর কিছুদিনের মধ্যেই ইন্দুবালার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল দিলওয়ার হোসেনের। ইন্দুবালা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, এর পর যোগাযোগ হল মিনার্ভার মালিক দিলওয়ার হোসেন সাহেবের সঙ্গে। ওনার ব্যবসায় তখন একটু মন্দা পড়েছে। আমায় নিয়ে ভাগ্য ফেরাবার ফন্দি করলেন। গেলাম ওনার ডাকে। অভিনয় হল 'বিষবৃক্ষ'। নির্মলেন্দু লাহিড়ী নগেন্দ্রর ভূমিকায়, হরিমতী 'হীরার' আমি 'দেবেন্দ্র'র। দারুণ উতরে ছিল সেই বই। আমার নিজেরই ছিল উনিশ খানা গান। দু-একখানা হরিমতীর সঙ্গে দ্বৈত সঙ্গীতও ছিল। দুজনে মিলে একটা গান গাইতাম। যার শুরুর কথা হচ্ছে 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসি না'। আমি করতাম খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের কাজ আর ও ঠুমরী অঙ্গের। লোকে হাততালি দিতে দিতে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াত। সে সব কথা ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হোসেন সাহেবের বরাতে 'বিষবৃক্ষে' হল সোনার ফল। এত লাভ হল যে, তাতে তাঁর সব দেনা শোধ হয়ে গেল। এক নাগাড়ে ছ'মাস নাটক চলেছিল। পরের বই হল 'ধাত্রীপান্না'। পরিচালনা করেছিলেন ছবি বিশ্বাস। আমার রোল ছিল বাঈজীর। 'ধাত্রীপান্না'র পরেই হোসেন সাহেব মারা গেলেন।* আমারও আর মিনার্ভা ভাল লাগল না, ছেড়ে দিলাম। মিনার্ভায় দিন হিসেবে টাকা পেতাম। 'বিষবৃক্ষে'

* মিনার্ভার মালিক দিলওয়ার হোসেন সাহেবের মৃত্যু সংবাদ আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৬শে শ্রাবণ শনিবার ১৩৫২) প্রকাশিত হয়। বয়ানটি ছিল নিম্নরূপ :

থিয়েটার স্বত্বাধিকারীর আকস্মিক

মৃত্যু

মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী মহম্মদ দেলওয়ার হোসেন গত মঙ্গলবার শেষ রাত্রে রক্তের চাপ বৃদ্ধির ফলে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র চুয়ান্ন বৎসর হইয়াছিল।

পেতাম দৈনিক একশো টাকা। পরের বইয়ে অবশ্য একটু কম পাই—পঞ্চাশ টাকা।

মিনার্ভাতে 'বিষবৃক্ষ' সত্যিই দারুণ জমে গিয়েছিল। যার ফলে বাইরে অনেক জায়গা থেকে মিনার্ভার এই নাটকটির বায়না হত। পূর্ববঙ্গ থেকেও (নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা) তাদের ডাক এসেছিল।

'ধাত্রীপান্না'র নাট্যকার ছিলেন শচীন সেনগুপ্ত। ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় এই নাটকে ইন্দুবালার গানই ছিল সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এবং তাতে তিনি সকলেরই মন কেড়ে নিয়েছিলেন। এছাড়া এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন ছবি বিশ্বাস, সরযূবালা, শৈলেন, রতীন, সন্তোষ, কৃষ্ণধন, জীবেন, নীরদা ও ফিরোজা। এই নাটকের সুবর্ণজয়ন্তী, উৎসবে পৌরোহিত্য করবেন স্বয়ং ফজলুল হক (১১ই আগষ্ট ১৯৪৬) বলে বিজ্ঞাপিত হয়।

এছাড়া মিনার্ভায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুইপুরুষ' (১৯৪৮খৃঃ) নাটকে ইন্দুবালা বাঈজীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের এই নাটকের চরিত্রলিপি ছিল এইরকম ঃ

নুটবিহারী– ছবি বিশ্বাস, কল্যাণী—সরযূবালা
সুশোভন—জহর গাঙ্গুলী, বাইজী— সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা
শিবনারায়ন—শৈলেন চৌঃ

মিঃ হোসেন বন্ধু বৎসল এবং আশ্রিত পালক ছিলেন। বিপন্ন ও দুর্গত শিল্পীরা সর্বদাই তাঁহার সাহায্য পাইতেন। জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্যার্থে তিনি বার বার সাহায্য রজনীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ, আই. পি. টি. এ. যে যখনই তাঁহার সাহায্য চাহিয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার মঞ্চ ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে মিনার্ভা থিয়েটারই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হইল না, অভিনেতৃগণও একজন প্রকৃত হিতৈষী হারাইলেন। কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি লইয়া তিনি তাঁহার থিয়েটার পরিচালনা করিতেন না। তাঁহার বন্ধুত্বও সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বর্তমান বাঙ্গালার বহু বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার তাঁহার বন্ধুত্ব গৌরবজনক মনে করেন।

তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ক্যাপ্টেন বোস, ডক্টর মফিজুদ্দিন, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, সরযূবালা, রানীবালা, শান্তি গুপ্তা, সঙ্গীত সাম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা প্রভৃতি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আসেন। অপরাহ্ন চার ঘটিকার সময় তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ শবদেহ সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যায়।

[আনন্দবাজার পত্রিকা]

মহাভারত—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার গিন্নী—গিরিবালা

গুপী মিত্র—সন্তোষ সিংহ, সাতু—নীরদা

অরুণ—জীবেন বসু, মমতা—মুকুলজ্যোতি

দেবনারায়ণ—নরেন চক্র, শ্যামা—রাধারাণী

কমলাপদ—অরুণ চট্টোঃ, বিমলা—রাণীবালা

মিনার্ভায় 'অন্নপূর্ণার মন্দির' নাটকেও ইন্দুবালার মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত দর্শকদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল বলে জানা যায়। এই নাটকে ইন্দুবালা ছাড়া আর যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শান্তি গুপ্তা, ফিরোজাবালা, লাবণ্য দাস ও অমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিনার্ভাতে তাঁর এই পর্বের শেষ নাটক 'আত্মদর্শন'। এতে ইন্দুবালা 'বিবেকে'র ভূমিকায় অবতীর্ণা হন।

মিনার্ভাতে 'ধাত্রীপান্না'র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের মধ্যে সেকালের থিয়েটার কর্তৃপক্ষের মানসিকতার পরিচয় সুপরিস্ফুট ছিল। এ সম্পর্কে 'যুগান্তর' পত্রিকায় এই উৎসবের যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকেই সেকালের এইসব অনুষ্ঠানের সার্বিক চিত্রটি পাওয়া যায়।

—ধাত্রীপান্না—

কণক জয়ন্তী

গত শনিবার সন্ধ্যায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'ধাত্রী-পান্নার' কণক জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচিত সভাপতি মৌলবী এ. কে. ফজলুল হকের অনুপস্থিতিতে নাট্যকলা বিশারদ পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি মহাশয় মিনার্ভা কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানান এবং যাঁহারা এই নাটকে অভিনয়ের দ্বারা জনসাধারণকে আনন্দ পরিবেশন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। নাটককে উন্নত করিতে হইলে কি কি জিনিষের প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের উল্লেখ করেন। অবশেষে তিনি বিশিষ্ট নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া অভিভাষণ শেষ করেন। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত অসুস্থতার জন্য এই উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই।

মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ নাট্যকারকে রূপার দোয়াত কলম উপহার দেন। প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে একটি করিয়া স্বর্ণ অঙ্গুরী দান করেন। এমন কি ঐ নাটক সংক্রান্ত জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁহারা অঙ্গুরী উপহার দিয়া যথেষ্ট বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। এইভাবে প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষদের প্রত্যেককে সমভাবে উৎসাহিত করা উচিত।

সেদিনকার সভায় বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক অভিনেতা ও নাট্যকারের সমাগম হইয়াছিল। দর্শকবৃন্দ অতি আনন্দের সহিত এই উৎসব উপভোগ করেন। বিশিষ্ট অভিনেতা ছবি বিশ্বাস 'বনবীর' এর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া প্রচুর উপঢৌকন লাভ করেন।

সভানুষ্ঠান শেষ হইলে নাটক অভিনীত হয়। 'ধাত্রীপান্নার' ভূমিকায় 'সরযূবালা'র অভিনয় প্রত্যেক দর্শকের মনকে অভিভূত করে। বনবীরের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস নিজের কৃতিত্ব প্রমাণ করেন। সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা তাঁহার কণ্ঠের সঙ্গীত দ্বারা জনসাধারণকে তৃপ্তি দেন।

মিনার্ভা ছেড়ে আসার পর থেকে ক্রমশঃ ইন্দুবালা চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। মেতেও রইলেন এইভাবে বেশ কয়েক বছর। অবশ্য এই ফাঁকে ভবানীপুরের রাম চৌধুরীর কালিকা থিয়েটার থেকেও ডাক এল ইন্দুবালার। ফলে থিয়েটার ছেড়ে তাঁর চলে যাওয়া পুরোপুরি সম্ভব হল না। এবার মাইনে স্থির হল মাসে তিন'শ টাকা। নাটকের নাম 'বিল্বমঙ্গল'। ইন্দুবালা ইতিপূর্বে অজস্র রাত্রি এই নাটকে 'পাগলিনী'র চরিত্রে সুনামের সঙ্গে অভিনয় করে এসেছেন। কিন্তু কালিকা থিয়েটারে ইন্দুবালা পেলেন ভিক্ষুকের চরিত্র। পাগলিনী সাজলেন রাধারানী দেবী, মলিনাদেবী চিন্তামনি। থিয়েটারের মালিক স্বয়ং রাম চৌধুরী করলেন 'বিল্বমঙ্গল' চরিত্রে। কিন্তু প্রথম দু-রাত্রি অভিনয় করলেন তিনি নেহাৎই সখ করে। তৃতীয় রজনী থেকে ঐ চরিত্রে আনা হল নীতিশ মুখোপাধ্যায়কে। 'বিল্বমঙ্গল' নাটক চলবার সময় পবের নাটকেরও মহলা সুরু হল। মহলার এই নাটকের নাম 'তপোবন'।

ইন্দুবালার ভাষ্যানুযায়ী, রামবাবু একই সঙ্গে চালাতে লাগলেন তপোবনের রিহার্সাল। আমি 'সদানন্দ' মলিনা 'ব্রহ্মন্যদেব' আর রাধারাণী

বেদমাতা। মাস ছয়েক এইভাবে কাজ করার পর এক সামান্য ঘটনায় কালিকার কাজ ছেড়ে দিলাম। ঘটনাটা হল এই : আমাদের প্লে আরম্ভ হত সন্ধ্যে ছ'টায়। কিন্তু থিয়েটারে হাজিরা দিতে হত সকলকে বেলা তিনটেয়। যাবার সময় রাম চৌধুরী ভ্যান পাঠিয়ে সকলকে এক সঙ্গে তুলে নিয়ে যেতেন। কোন অসুবিধে হত না। কারন ভ্যানে অনেক লোক ধরত। কিন্তু আসার সময় হত মুস্কিল। ভেড়ার পালের মত একগাদা অভিনেত্রীকে তিনি মটরে করে চালান দিতেন। গাদাগাদি করে বসেও নিস্তার পেতাম না। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত আমার ছু পায়ের ওপর বসত ছুটো মেয়ে মানুষ। একে আমি মোটা তার ওপর সারাদিন খাটাখাটুনি করে এই মোট বইতে কি ভাল লাগে! দিনের পর দিন এই ভার বইতে বইতে শুরু হল আমার ভীষণ পায়ের যন্ত্রণা। একদিন বিরক্ত হয়ে কর্তাদের এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালাম বেশ একটু রূঢ় ভাষায়। প্রতিকার তো দূরের কথা. আমার মুখের ভাষায় কর্তাদের মুখ হল আরও ভার। ছুদিন চুপচাপ কাজ করলাম। মাইনে নিলাম। বাড়ীও ফিরলাম রামবাবুর সেই গাড়ীতে। মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করে। কিন্তু তৃতীয় দিন যখন ভ্যান এল আমায় নিতে তখন আর উঠলাম না সেই ভ্যানে। রামবাবু ছুটে এলেন। আমিও এক কথায় জানিয়ে দিলাম, 'অতদূরে গিয়ে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়'। কালিকা থিয়েটারে সেই থেকে তাঁর পাট চুকল।

এর পর থিয়েটার থেকে কিছুদিনের জন্যে আবার বিশ্রাম। মাঝে কিছুদিন ঘুরে ঘুরে এখানে ওখানে মেয়েদের নাটকে অভিনয় করেছেন ইন্দুবালা। ১৯৪২-৪৪খৃঃ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে মিনার্ভায় সুরু হল ইন্দুবালার দ্বিতীয় পর্বের অভিনয়। এই পর্বে যে সব নাটকে তিনি অভিনয় ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেগুলি হল—

(১) অন্নপূর্ণার মন্দির—কুয়াসা
(২) ধাত্রীপান্না—গায়িকা
(৩) ছুই পুরুষ—বাঈজী
(৪) আত্মদর্শন—বিবেক

প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই ইন্দুবালার অভিনয় জীবনে শুরু হয় 'খুচরো

নাটকে'র কাল। কেননা এই পর্ব থেকেই তিনি বহু জায়গায় জনপ্রিয় নাটকগুলিতে Combination Night বা সম্মিলিত অভিনয় রজনীর শিল্পী হিসেবে যোগ দিতে যেতেন। যেমন শিশিরকুমার ভাদুড়ী শ্রীরঙ্গমে 'বিল্বমঙ্গল' নাটক করলেই ইন্দুবালাকে পাগলিনীর চরিত্রে নির্বাচিত করতেন।

এই সময় থেকে প্রায় বছর দশেক তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাটকে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। সেকালে এইসব জনপ্রিয় নাটকগুলির মধ্যে মধ্যে ছিল—

(১) কারাগার—ধরিত্রী
(২) জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার—উন্মাদিনী
(৩) দেবদাসী—বাসর সঙ্গিনী
(৪) মন্ত্রশক্তি—বাঈজী।
(৫) সধবার একাদশী—কাঞ্চন।
(৬) বাঙালী—ভিখারিণী।
(৭) প্রফুল্ল—মাতালনী।
(৮) আলিবাবা—আলিবাবা।
(৯) বিষবৃক্ষ—দেবেন্দ্র।

এই সব নাটক প্রধানতঃ অভিনীত হত শ্রীরঙ্গম, রঙমহল ও মিনার্ভা থিয়েটারে। এর মধ্যে মূলতঃ 'বিল্বমঙ্গল' নাটকেই ইন্দুবালা অভিনীত রজনীর সংখ্যা প্রায় চারশ।

১৯৪৫ খ্রীঃ ইন্দুবালা কলকাতার হিন্দী পার্শী থিয়েটারে দুটি হিন্দী নাটকেও অংশগ্রহণ করেন। যেমন—

(১) ঘরকী লাজ—মুন্নী।
(২) জাসুস—লছমীবাঈ।

কালিকা থিয়েটারে অভিনীত ইন্দুবালার নাটক :—

(১) বিল্বমঙ্গল—ভিক্ষুক
(২) রামপ্রসাদ—মাধব
(৩) তপোবল—সদানন্দ

এর পর অভিনয় জীবনে পেশাদারী মঞ্চে শেষবারের মত ইন্দুবালা স্টার থিয়েটারে এসে যোগ দিয়েছিলেন (২৩ শে ডিসেম্বর ১৯৫০)। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই একদা বলেছিলেন,—এইভাবে কিছুদিন চলবার পর হাবুল স্পটারকে দিয়ে একদিন ডাক পাঠালেন মহেন্দ্রবাবু অর্থাৎ মহেন্দ্র গুপ্ত। এক বছরের জন্যে তিনশো টাকা মাস মাইনেতে চুক্তিপত্রে আমায় সই করালেন। পৃথ্বীরাজ বই নামাবার জন্যে স্টারে তখন রিহার্সাল চলছে। আমি পেলাম 'মেঘা' চরিত্র। রণজিত রায় ছিলেন সুরকার। ছ'মাস সমানে বই চলল। গান ও অভিনয়ে 'মেঘা' চরিত্রকে কতটা জীবন্ত করে তুলেছিলাম, তা ইদানীং কালের অনেকেই জানবেন। কিন্তু এত সুনাম সত্ত্বেও মহেন্দ্র বাবুর মন পেলাম না। বইটাকে তিনি একশো নাইটে পৌঁছতে দিলেন না। অর্থাৎ নিরানব্বই নাইটের মাথায় বইটা তিনি দিলেন বন্ধ করে। একশো নাইট পূর্ণ হলে আমার কপালে শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের পুরস্কার জুটে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এরপর তিনি ঠিক করলেন শকুন্তলা করবেন। আমাকে দিলেন শকুন্তলার সখীর পার্ট। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রিহার্সালে আর হাজির হলাম না।

এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে মহেন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে* জানিয়েছেন যে এমন কোন ঘটনার কথা তাঁর এখন মনে নেই। তবে তখনকার দিনে মহেন্দ্র গুপ্তের মতে থিয়েটারে টিকিট বিক্রী কমে এলেই নাটক তুলে নেওয়া হ'ত। হয়তো এই রকমই কোন কারণে তাঁর মতে 'পৃথ্বীরাজ' তুলে নেওয়া হয়।

কিন্তু ইন্দুবালার বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যই সঠিক। কেননা, 'পৃথ্বীরাজ' তুলে নেওয়ার সময় নাটকটির জনপ্রিয়তা অব্যাহত ছিল। 'মেঘা' চরিত্রে ইন্দুবালার বিস্ময়কর অভিনয় ও গান এই নাটককে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল বলে আজও অনেকের বিশ্বাস।

'পৃথ্বীরাজ' নাটকের রচয়িতা ও পরিচালক মহেন্দ্র গুপ্তও সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় (দেশ, বিনোদন ১৩৮৮) স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই নাটক সম্পর্কে লিখেছেন,—'স্টারে আমার লেখা পৃথ্বীরাজ যখন অভিনীত হয় তখন

* স্টার থিয়েটারে মহেন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ সন্ধ্যায়।

ইন্দুবালা "মেঘা" নামে এক ডাকিনীর চরিত্রে রূপদান করেন। আগাগোড়া কালো রঙের মেকআপ, মাথায় বড় জটা। গায়ে জড়ানো একটি ছেঁড়া কাঁথা। পায়ে রিক্সার ঘন্টির মত বড় বড় ঘন্টি বাঁধা। পৃথ্বিরাজ তাঁর দুই ছেলেকে বধ করেছে। আখেরী মাঠের গ্রীষ্মে পুত্র শোকাতুর মেঘা যখন ভেতর থেকে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে মঞ্চে আসে তখন প্রেক্ষাগৃহে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সব কেঁদে উঠত। মেঘা যখন গান ধরত 'ধূ ধূ ধূ ধূ আখেরী মাঠ / নাহি তৃণ তরু নাহি বাট / ধ্বক ধ্বক ধ্বক আলেয়া জ্বলিছে ঐ' তখন দর্শকেরা একেবারে কন্টকিত হয়ে উঠতেন। একদিন অভিনয়ের আগে দেখতে পেলাম ইন্দুবালা সারা দেহে কালো রঙ করেছেন, কিন্তু হাতের একটা আঙ্গুল রঙ করেন নি। আমি তাঁকে ডেকে বললাম, আপনি একটা আঙ্গুল রঙ করতে ভুলে গেছেন। ইন্দুবালা আমার কাছে এসে চুপি চুপি বললেন, ভুলিনি বাবা, আমার এমনি কুৎসিত চেহারা, তারপর আরো কুৎসিৎ ডাকিনী সেজেছি, দর্শক যদি মনে করে আমার গায়ের অরিজিনাল রঙ এই রকম, সেইজন্য একটা আঙ্গুল বাদ রেখেছি। রঙ করিনি। ইন্দুবালা নিজে বলেছেন এবং যাঁরা পৃথ্বিরাজ দেখেছেন তাঁদের সকলেরই অভিমত মেঘা চরিত্রাভিনয়ই ইন্দুবালার নাট্য জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়।'

কিন্তু দুর্ভাগ্য ইন্দুবালার, জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করা সত্ত্বেও নিরানব্বই রাত্রি অভিনীত হবার পর কোন এক রহস্যময় কারণে শততম রাত্রির মর্যাদা থেকে এই নাটকটি বঞ্চিত হয়। অবশ্য ইন্দুবালা আজও ব্যক্তিগত ভাবে মনে করেন, জনপ্রিয় তাঁর এই নাটকটি বন্ধ করে দেবার পেছনে ছিলেন জনৈক অসৎ চরিত্রের এক ব্যক্তি যার জঘন্য লালসা ওই নাটক চলাকালে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে এবং ইন্দুবালার প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে সেই ক্ষমতাবান ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করে মালিকপক্ষকে ভুল বুঝিয়ে নাটকটি বন্ধ করে দেন। পেশাদার থিয়েটারে শ্রেষ্ঠ অভিনয় সমৃদ্ধ চরিত্রের ওই নাটকটির বঞ্চনার স্মৃতি আজও ইন্দুবালার মনে গেঁথে আছে।

জানা গেছে, স্টার থিয়েটারে সর্বমোট চারটি নাটকে ইন্দুবালা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যেমন—

(১) পৃথ্বীরাজ—মেঘা।

(২) সাবিত্রী—পথিক।

(৩) দুর্গেশনন্দিনী—ওস্তাদ।

(৪) শকুন্তলা—বনদেবতা।

এর মধ্যে অবশ্য নিয়মিত অভিনয়ের পর্যায়ে একমাত্র এই পর্বে 'পৃথ্বীরাজ' নাটকের নামই করা যায়। অন্যান্য নাটকগুলি মাঝে মাঝে প্রয়োজন বা চাহিদা অনুযায়ী অভিনীত হ'ত।

পেশাদারী মঞ্চ ছেড়ে আসার পর তিনি যে সব নাটকে প্রায়ই অভিনয়ের আমন্ত্রণ পেতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'কারাগার' ও 'বিল্বমঙ্গল'। কারাগার নাটকে 'ধরিত্রী' চরিত্রে অভিনয় করে ও গান গেয়ে ইন্দুবালা যথেষ্ট প্রশংসা বা তারিফ কুড়িয়েছিলেন। এই নাটকের গানে সুর দিয়েছিলেন স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁরই সুরে ধরিত্রী চরিত্রে অভিনয় কালে ইন্দুবালা এই নাটকে ছ'খানি গান গেয়েছিলেন।

একদা স্টার থিয়েটারে 'শকুন্তলা' নাটকে সখীর অভিনয় ছেড়ে এলেও অন্য সংস্থার হয়ে ওই মঞ্চেই শকুন্তলা নাটকে ইন্দুবালা 'বনদেবতা'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন (১২ই জুলাই ১৯৫১)। যেমন ওই স্টারেই ইন্দুবালা পরে সাবিত্রী নাটকে 'পথিকের' ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন।

পেশাদারী নাটক থেকে সরে আসার আগে বা পরে ইন্দুবালা বহুবার বিভিন্ন নাটকে অংশ গ্রহণ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন বলে জানা যায়। যেমন মিনার্ভা থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' নাটকের (পরিচালনা—নির্মলেন্দু লাহিড়ী) পূর্বে 'রক্তকমল' নাটক থেকে ইন্দুবালার গান (শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীশ্রীগোপাল জিউর মন্দির সংস্কার কল্পে বিশেষ অভিনয়, ১৯শে জুলাই ১৯৪০ সন্ধ্যা ৬টায়), স্টারে নোয়াখালী দুর্গতদের সাহায্যকল্পে গিরিশ চন্দ্রের নাটক 'প্রফুল্ল'তে ইন্দুবালার অভিনয় ও গান (১লা ডিসেম্বর ১৯৪৬), গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতালের সাহায্যার্থে রঙমহলে 'নর ও নারী' নাটকের পূর্বে ইন্দুবালার গান (৯ই জুলাই ১৯৪৫) উল্লেখযোগ্য।

এর আগে মিনার্ভা থিয়েটার কর্তৃপক্ষ 'বিষবৃক্ষ' নাটকটি নিয়ে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ যাত্রা করেছিলেন চারদিনের জন্য। এই নাটকে ইন্দুবালাকে

দেবেন্দ্রের ভূমিকায় নির্বাচন করা হয়। এই সময় তাঁকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী 'শ্রীমতী ইন্দুবালা' বলে অভিহিত করা হ'ত। নারায়ণগঞ্জ 'হংস থিয়েটারে' এই নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় পর পর চারদিন এবং অতিরিক্ত আরও চারদিনের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষকে পরে করতে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞাপনটি ছিল নিম্নরূপ :

সদলবলে মাত্র ৪ দিনের জন্য নারায়ন গঞ্জে

আসিতেছেন

স্থান—হংস থিয়েটার (নারায়ণ গঞ্জ)

সুসংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !! সুসংবাদ !!!

বাংলার সর্ব্বসাধারণের অতিপ্রিয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের

শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সমাবেশ

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার ১১ই আষাঢ় ২৩শে জুন হইতে মঙ্গলবার ১৪ই আষাঢ়

২৯শে জুন পর্য্যন্ত

বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ স্থানাভাবে ফিরিয়া যাওয়ার এবং নারায়ণগঞ্জস্থিত সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধে এই অতিরিক্ত ৪ দিন অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যায় এবার সকলেই আনন্দ-সুন্দর অভিনয় দর্শন করিবার সুযোগ পাইবেন। সান্ধ্য অভিনয়ে গুরুগম্ভীর নাটক ও রাত্রি অভিনয়ে নৃত্যগীতি বহুল নাটক ও একাঙ্ক নাটিকা পরিবেশন করা হইবে। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী যাঁর সঙ্গীত সমগ্র ভারতকে মুগ্ধ করিয়াছে এবং বর্তমানে কলিকাতায় **বিষবৃক্ষ** নাটকে যাঁর অভিনয় সমগ্র কলিকাতা সহরকে মাতাইয়া তুলিয়াছে সেই সঙ্গীত সাম্রাজ্ঞী **"ইন্দুবালা"** বিষবৃক্ষ নাটকে অভিনয় করিবার জন্য নারায়ণগঞ্জ আসিতেছেন। (তাঁর অভিনয় ও ১৬ খানি গান বিষবৃক্ষ নাটকের বিশেষত্ব)। ছায়া ও মঞ্চের লব্ধ প্রতিষ্ঠ নট ভূমেন রায়ের পরিচয় দেওয়ার আর আবশ্যক কি ? এবার মিনার্ভার কলাকুশলি অভিনেতৃবর্গের তালিকা দেখুন :—

বঙ্গনাট্য জগতের মধ্যাহ্ন ভাস্কর নটরাজ শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, নট কুলরাণী শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা, সর্ব্বজন প্রিয় সুদর্শন নট শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়, লব্ধ প্রতিষ্ঠ নট শ্রীভূমেন রায় নানা রসাভিনয়ে দক্ষ অভিনেতা শ্রীবঙ্কিম দত্ত চরিত্র রূপায়ণে অদ্বিতীয় শ্রীগনেশ গোস্বামী শক্তিশালী নট শ্রীপশুপতি সামন্ত হাস্যার্ণব শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায় প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী লাবণ্য দাস, কিন্নরকণ্ঠী শ্রীমতী হরিমতী সুঅভিনেত্রী শ্রীমতী পদ্মাবতী নৃত্যগীত পটিয়সী শ্রীমতী রেনুকা

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ—অভিনেত্রী সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী
শ্রীমতী ইন্দুবালা

এছাড়া বালী (হাওড়া) নর্থ ক্লাব আয়োজিত স্থানীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্য কল্পে 'বিল্বমঙ্গল' যাত্রাভিনয়ে ইন্দুবালা একবার (১১ই ফাল্গুন রবিবার ১৯৪৫) অংশগ্রহণ করেছিলেন। গোস্বামীপাড়া ৺হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের প্রাঙ্গন, হরিসভা, বালীতে অনুষ্ঠিত এই যাত্রানুষ্ঠানে পাগলিনীর ভূমিকায় ইন্দুবালা অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গীতাচার্য কালীপদ পাঠক ছিলেন এর সঙ্গীতাংশে, দর্শনী ছিল মাত্র আট আনা। যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ পাতিপুকুর যক্ষা হাসপাতালের সাহায্যার্থে ইন্দুবালা মিনার্ভা থিয়েটারে 'বলিদান' নাটকে জোবী পাগলীর ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। এই নাটকে ইন্দুবালার মা রাজবালা ও কৃষ্ণ ভামিনী অভিনয় করেছিলেন (৯ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যা ৬৷৷ টায় ১৯৪৮)।

এছাড়া কলকাতার পাঁচটি থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সম্মেলনে মিনার্ভা থিয়েটারে আয়োজিত (৮ই জুন ১৯৪৫) 'প্রফুল্ল' নাটকে ইন্দুবালা অংশগ্রহণ করেন। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশ মিত্র (কালিকা), ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী (রঙমহল), রবিবার (স্টার), ভূমেন রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (শ্রীরঙ্গম), রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে (বহুদিন পরে) প্রভা (শ্রীরঙ্গম), শান্তি গুপ্তা (রঙ

মহল) সরযূবালা, উষাবতী (পটল), নীরদা সুন্দরী, অমল বন্দ্যোঃ (রঙ-মহল), মিহির ভট্টাচার্য (রঙমহল), সন্তোষ সিংহ, বিজয় কার্ত্তিক, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, শৈলেন চৌধুরী, আশু বোস ইত্যাদি।

কালী থিয়েটারের উদ্যোগে মিনার্ভা থিয়েটারে দেবালয় সংস্কারকল্পে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের যে অভিনয় হয় (৯ই আগষ্ট ১৯৪৬) তাতেও ইন্দুবালার গান ছিল অন্যতম আকর্ষণ। এতে নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী—সাধক, নরেশ মিত্র—দারোগা, জহর গাঙ্গুলী—বণিক, দুর্গাপ্রসন্ন বসু—সোমগিরি, বিপিন গুপ্ত—বিল্বমঙ্গল, শান্তি গুপ্তা—চিন্তামণি, মুকুল—অহল্যা।

১৯৫৩ খৃঃ মহাজাতি সদনে দিকপাল অভিনেতৃ সম্মেলনে ডি. এল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকেও ইন্দুবালা ভিক্ষুকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। চরিত্র-লিপি ছিল এইরকম ঃ—

চন্দ্রগুপ্ত

কাত্যায়ন ঃ নটশেখর নরেশ মিত্র
সেলিউকাস ঃ জহর গাঙ্গুলী
মুরা ঃ নাট্যাধিরাজ্ঞী মলিনাদেবী
ভিক্ষুক ঃ সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা
এন্টিগোনাস ঃ নীতিশ মুখার্জি
নন্দ ঃ জীবেন বসু
বাচাল ঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
চন্দ্রগুপ্ত ঃ তরুণ মিত্র (এই প্রথম)
চন্দ্রকেতু ঃ বীরেন চ্যাটার্জি
ছায়া ঃ লীলাবতী দেবী
হেলেন ঃ ছন্দা দেবী
চাণক্য ঃ মহেন্দ্র গুপ্ত

তৎসহ—সুনীত, সনৎ, নীরেন, সুস্মিতা, গোপীনাথ, ইন্দ্রজিৎ, ত্রিদিব, নির্মল অঞ্জলি।*

* আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসারে।

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত পরবর্তীকালে তাঁর সুদীর্ঘকালের নাট্য জীবনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে গিয়ে ইন্দুবালার কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। ‘বাংলার নাটক ও নাট্যশালা’ নামক গ্রন্থে তিনি ‘রক্তকমল’ নাটকের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন ‘.........কাজেই অহীন্দ্র নূতন ধরনের নাটক লিখতে বলায় যে নাটক লিখলাম, তা নতুন হোলো, কিন্তু ইউরোপীয় হোলো না, ভারতীয়ও হোলো না। সে-নাটক অহীন্দ্র অভিনয় করেন নি। করেছেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন থিয়েটারে.........মাত্র পাঁচটি দৃশ্যের নাটক, পাঁচটিই সেট। তারপর আবার একই সঙ্গে তিনটি ঘরে অভিনয় চলছে। কি করে অভিনয় করা যাবে? রিভলভিং স্টেজ তখন ছিল না, ওয়াগন স্টেজও কল্পনায় আসেনি। কর্ণার্জুনের দীর্ঘ-বিরতির কথা স্মরণ করে প্রতি দৃশ্যের পর যবনিকা ফেলা আমার কাছে ভীতির বিষয় হয়ে উঠেছিল। ঠিক করলাম প্রতি দৃশ্য অভিনীত হবার পর পরবর্তী দৃশ্যের মুড্ নিয়ে একটি গান দিলে সেট্ সাজাবার সময় পাওয়া যায়। সে-গান নাটকের কোন চরিত্র গাইবে না, গাইবে একটি কল্পিত নারী, নিয়ম মতো, অথচ নিয়মিত নয়। তার কাজ হবে অনেকটা সূত্রধরের মতো। নাটকের ইউনিট ওই করে বজায় রাখা যাবে, এবং একটানা সওয়া দুই ঘণ্টা অভিনয় করে নাটক শেষ করা যাবে। নজরুলকে বললাম গান বেঁধে দিতে হবে। নজরুল ওই নাটকের জন্য সাতখানা গান লিখে দিলেন; চারখানা গাইবে প্রতি-দৃশ্যের শেষে কল্পিত চরিত্রটি, আর তিনখানা গাইবে নাটকের দুটি চরিত্র। নজরুল নিয়ে এলেন সঙ্গীত-সাম্রাজ্ঞী ইন্দুবালাকে, কল্পিত চরিত্রটির গান গাইবার জন্য। ইন্দুবালার সেই চারখানি গান রক্তকমলের বড় আকর্ষণ হয়ে উঠল। রক্তকমলে অভিনয় করেছিলেন নির্মলেন্দু, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, গনেশ গোস্বামী শেফালিকা, সরযূবালা। নাটকে অতিরিক্ত আর একটি পরিচারিকা ছিল। শেফালিকা দু'খানি, আর সরযূবালা একখানি গান গাইতেন। রক্তকমলের এই সাতখানি নজরুল-গীতিই খুবই জনপ্রিয় হয়।......’

[বাংলার নাটক ও নাট্যশালা—শচীন সেনগুপ্ত
প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৬৪ পৃঃ ১৪৬-১৪৭,
প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা-৬]

মঞ্চে অভিনয় কালে অসংখ্য অভিনেত্রীর সংস্পর্শে এসেছিলেন ইন্দুবালা। বাংলা মঞ্চের ইতিহাসে তাঁদের অনেকের নামই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সমসাময়িক এই সমস্ত অভিনেত্রীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম শ্রীমতী নীহারবালা। সেকালে রূপে গুণে ও অভিনয়ে তিনি ছিলেন আকর্ষনীয় এক চরিত্র। এখনো ইন্দুবালা তাঁর স্মৃতি চারণার সময় যে কয়েকটি নাম প্রায়শঃই উল্লেখ করেন নীহারবালা তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

অন্যতমা এই অভিনেত্রী নীহারবালাকে ক্যালকাটা থিয়েটার্স ১৯৩৬ সালের ২রা অক্টোবর নাট্যনিকেতন মঞ্চে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে একটি সম্মান রজনীর আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে নীহারবালা স্বয়ং অভিনেত্রী ইন্দুবালাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যে পত্রটি লিখেছিলেন তা ছিল এই রকম :—

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ২রা অক্টোবর ক্যালকাটা থিয়েটার্স আমার জন্য একটি সম্মান-রজনীর আয়োজন করেছেন। মিনার্ভা ও রঙমহল তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁদের সহযোগ দিয়ে। **আপনিও স্নেহবশত আজকার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।**

আমার প্রার্থনা ওই রাত্রে আপনি নাট্য-নিকেতন মঞ্চে উপস্থিত থেকে আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন এবং প্রীতি-ভোজনে যোগ দিয়ে আমাকে অনুগৃহীতা করবেন। ইতি—

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ — বিনয়াবনতা

নাট্য-নিকেতন — শ্রীমতী নীহারবালা

সম্মান-রজনীতে ইন্দুবালা অংশ গ্রহণ করে নীহারবালাকে সম্মানিত করেছিলেন। সেই সূত্রেই নীহারবালা নাট্যনিকেতনের অনুষ্ঠানে ইন্দুবালাকে উপস্থিত থেকে তাঁকে আশীর্বাদ করতে এবং প্রীতিভোজে যোগ দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সম পেশায় নিযুক্ত সেকালের দুই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরস্পরের অন্তরঙ্গতার এবং সম্ভ্রম বোধের পরিচয় এখানে সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে।

সেকালে যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে মঞ্চে তিনি অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল :—

'মহুয়া'	হুমড়ো সর্দার—নির্মলেন্দু লাহিড়ী
মনোমোহন থিয়েটার	নদের চাঁদ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯	সুজন—প্রভাত সিংহ
রচনা—মন্মথ রায়	সন্ন্যাসী—গনেশ গোস্বামী
প্রথম রজনী)	মহুয়া—সরযূবালা
	রাধু পাগলী—ইন্দুবালা
	পালঙ্ক—ফুল্লনলিনী
	নৃত্য শিক্ষক—ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	গীতরচনা ও
	সঙ্গীত পরিচালনা—নজরুল ইসলাম

'উজ্জ্বলে মধুরে' (গীতিনাট্য)	সখ—পুলিনবিহারী চক্রবর্তী
পূর্ণ থিয়েটার	শোভা—ইন্দুবালা
২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮	মহিমা—চারুশীলা (খোদন)
রচনা—দেবকণ্ঠ বাগচী	
(সাধারণ অভিনয়)	

'জাহাঙ্গীর'	জাহাঙ্গীর—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
মনোমোহন থিয়েটার	সাজাহান—নির্মলেন্দু লাহিড়ী
১লা জানুয়ারী ১৯৩০	যশোবন্ত—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
রচনা-মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	মহাবৎ খাঁ—গনেশ গোস্বামী
(প্রথম রজনী)	সুন্দরলাল—মনীন্দ্রলাল ঘোষ
	শারিয়ার—বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত
	পারভেজ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	আসফ খাঁ—ফনীন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ
	হুঁসিয়ার—শ্রীমতী ইন্দুবালা
	আওরঙ্গজেব—আঙ্গুরবালা ।

নূরজাহান—শশীমুখী
লয়লী—শ্রীমতী সরযূ
জাহানারা—শেফালিকা
মহামায়া—আশালতা
পারভেজ পত্নী—নিরুপমা

'একলব্য'
জুপিটার প্যালেস
২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩০
রচনা—বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
(প্রথম রজনী)

ইন্দুবালা, কে. মল্লিক, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়, মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), নীরদাসুন্দরী, সুশীলাসুন্দরী প্রভৃতি।

'অন্নপূর্ণার মন্দির'
মিনার্ভা থিয়েটার
২০শে আগষ্ট ১৯৪৩
রচনা—নিরুপমা দেবী
(প্রথম রজনী)

নির্মলেন্দু লাহিড়ী, শান্তি গুপ্তা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গনেশ, নরেন, জীবন, পদ্মাবতী, লাবণ্য দাস, হরিমতী, ফিরোজাবালা, নীরদাসুন্দরী এবং ইন্দুবালা।
পরিচালনা—নির্মলেন্দু লাহিড়ী
নাট্যরূপ—বিধায়ক ভট্টাচার্য

'বিষবৃক্ষ'
মিনার্ভা থিয়েটার
১৯শে জুন ১৯৪৩
রচনা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(সাধারণ অভিনয়)

নগেন্দ্র—নির্মলেন্দু লাহিড়ী
কুন্দ—শান্তি গুপ্তা
দেবেন্দ্র—ইন্দুবালা
পরিচালনা—নির্মলেন্দু লাহিড়ী
নাট্যরূপ—অমৃতলাল বসু

'দুই পুরুষ'
মিনার্ভা থিয়েটার
২১শে ডিসেম্বর ১৯৪৪

নুটুবিহারী—ছবি বিশ্বাস
কল্যাণী—সরযূবালা
সুশোভন—জহর গাঙ্গুলী

রচনা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	বাঈজী—ইন্দুবালা
(বিশেষ অভিনয়)	শিবনারায়ন—শৈলেন চৌধুরী
	জমিদার গিন্নী—গিরিবালা
	মহাভারত—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
	গুপী মিত্র—সন্তোষ সিংহ
'ধাত্রীপান্না'	ছবি বিশ্বাস, সরযূবালা, শৈলেন চৌধুরী,
মিনার্ভা থিয়েটার	ইন্দুবালা, নীরদা, ফিরোজা, রতীন, সন্তোষ
২৭শে এপ্রিল ১৯৪৫	সিংহ, কৃষ্ণধন, জীবেন প্রভৃতি।
রচনা-শচীন সেনগুপ্ত	পরিচালনা—ছবি বিশ্বাস
(নবপর্যায়ে প্রথম অভিনয়)	(বাঈজীর ভূমিকার ইন্দুবালার অভিনয় ও গান।)
'তপোবন'	শ্রেঃ—ইন্দুবালা (বেদমাতা), মলিনা,
কালিকা থিয়েটার	রাধারাণী, বেলা বোস, তারা, কমলা,
৫ই আগষ্ট ১৯৫০	শান্তি, মেনকা, জ্যোতির্ময়, ভরত, নারাণ,
রচনা—গিরিশচন্দ্র	মণি, বিজয়নারায়ন, নরেন ও নীতিশ
(নব পর্যায়ে প্রথম রজনী)	মুখোপাধ্যায়।
	প্রযোজনা—শ্রীকালিদাস
	সুর সৃষ্টি —ভরত চৌধুরী
	মঞ্চ শিল্প—মনীন্দ্রনাথ দাস (নান্নুবাবু)
	নৃত্য শিল্প—বলাই দত্ত
	ব্যবস্থাপনা—প্রফুল্ল চৌধুরী।
'পৃথ্বীরাজ'	ঘোরী—মিহির
স্টার থিয়েটার	গোবিন্দ—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫০	জয়চাঁদ—সন্তোষ দাস
রচনা—মহেন্দ্র গুপ্ত	মেঘা—ইন্দুবালা
(প্রথম রজনী)	সংযুক্তা—ফিরোজাবালা
	সহেলী বাঈ—পূর্ণিমা দেবী

মলয়াবতী—বন্দনা দেবী
রাজমাতা—বীণা
পৃথ্বীরাজ—মহেন্দ্র গুপ্ত

'শকুন্তলা'
স্টার থিয়েটার
১২ই জুলাই ১৯৫১
রচনা—মহেন্দ্র গুপ্ত
(প্রথম রজনী)

শ্রেঃ—মহেন্দ্র গুপ্ত (দুষ্মন্ত), অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দাস, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সত্য, চন্দ্রশেখর, ম্যালকম গোপাল, ইন্দুবালা, ফিরোজাবালা, পূর্ণিমা দেবী, বন্দনা দেবী, কেতকী।
সুর—দুর্গা সেন
নৃত্য—পিটার গোমেশ
দৃশ্য—বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'মন্ত্রশক্তি'
শ্রীরঙ্গম
৭ই জুলাই ১৯৫২
কাহিনী—অনুরূপা দেবী
নাট্যরূপ—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(বিশেষ অভিনয়)

মোথরো—তিনকড়ি চক্রবর্তী
মৃগাঙ্ক—শিশির কুমার ভাদুড়ী
অম্বর—ছবি বিশ্বাস
আদ্যনাথ—জহর গাঙ্গুলী
রমাবল্লভ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
নবীন—রবি রায়
রমণী—তারা ভট্টাচার্য
জ্যোতিষী—আশু বোস
তুলসী—রাণীবালা
জহরা—ইন্দুবালা
কৃষ্ণপ্রিয়া—রাজলক্ষ্মী (বড়)
অজা—পূর্ণিমা
বাণী—সরযূবালা

'প্রফুল্ল'
শ্রীরঙ্গম
৬ই জুন ১৯৫৩

যোগেশ—শিশিরকুমার
রমেশ—অহীন্দ্র চৌধুরী
প্রফুল্ল—সরযুবালা

রচনা—গিরীশচন্দ্র ঘোষ	অন্যান্য ভূমিকায়—ইন্দুবালা, (মাতালনী)
(বিশেষ অভিনয়)	নিভাননী, নীরদা সুন্দরী ও রেবা দেবী।

'তুই পুরুষ' নাটকে মিনার্ভা থিয়েটারে (২০শে জুলাই ১৯৪৮) বিশেষ অভিনয় রজনীতে (Combination Night) এবং শ্রীরঙ্গমে (২৭শে মে ১৯৪৯) আয়োজিত 'তুই পুরুষ' নাটকের বিশেষ অভিনয় রজনীতে ইন্দুবালা যাঁদের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তারা হলেন—

মিনার্ভা	গুপী মিত্র—নরেশ চন্দ্র মিত্র
'তুই পুরুষ'	নুটু বিহারী—ছবি বিশ্বাস
	সুশোভন—জহর গাঙ্গুলী
	কল্যাণী—সরযূবালা
	বিমলা—রাণীবালা
	শিবনারায়ণ—নির্মলেন্দু লাহিড়ী
	বাঈজী—ইন্দুবালা
শ্রীরঙ্গম	নুটু বিহারী—ছবি বিশ্বাস
'তুই পুরুষ'	মহাভারত—রবি রায়
	গোপীনাথ—সন্তোষ সিংহ
	সুশোভন—জহর গাঙ্গুলী
	অরুণ—মিহির ভট্টাচার্য
	রাজেন—জীবন গোস্বামী
	দেবনারায়ণ—কালী সরকার (অ্যামেচার)
	কমলাপদ—তুলসী চক্রবর্তী
	কল্যাণী—সরযূবালা
	শ্যামা—ছায়া দেবী
	মমতা—রমা দেবী
	বিমলা—রাণীবালা
	শিবনারায়ণ—নির্মলেন্দু লাহিড়ী
	বাঈজী—ইন্দুবালা।

প্রায় ত্রিশ বছর এইভাবে মঞ্চে প্রায় একটানা অভিনয়ের গৌরব অর্জন করেছিলেন গায়িকা ইন্দুবালা। লক্ষণীয়, অধিকাংশ চরিত্রে তাঁকে অভিনয়ের পাশাপাশি গানও গাইতে হয়েছে। তখনকার দিনে মঞ্চে অভিনেত্রীদের স্ব-কণ্ঠে গান গাইবার রীতিই প্রচলিত ছিল। উপরন্তু নাটকের ক্ষেত্রে, গানের কদরও ছিল খুব বেশী। কেবলমাত্র গানের আকর্ষণেই তখনকার অনেক নাটক রাতের পর রাত অভিনীত হয়েছে। ফলে সেকালে শিল্পীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে গান জানার গুণটি অবশ্যই রপ্ত করতে হ'ত। এমনকি, অভিনয়ের মধ্যে গান জানা চরিত্র তাই বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রায়শঃই রাখা হত। দর্শকবৃন্দও নাটক দেখতে গিয়ে সেই সব গান খুবই উপভোগ করতেন। এই সব গানের মধ্যে রাগ-রাগিনী তথা কালোয়াতি ঘরানার প্রাধান্য ছিল বেশী। দেশের সঙ্গীত জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীর দল তখন থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত থাকতেন। স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত গুণী শিল্পী না হলে থিয়েটারের গানে প্রবেশের সুযোগই পেতেন না। ঠিক এই কারণেই অনেক সময় কোন কোন নাটকে বিশেষ কোন কোন গান দর্শকদের আগ্রহে উৎসাহে এবং অনুরোধে একাধিকবার মঞ্চে গাইতে হয়েছে। বিশেষ করে ইন্দুবালার মত প্রতিষ্ঠিত গায়িকাদের এই জাতীয় অনুরোধে প্রায় নিয়মিত সাড়া দিতে হত।

বলা বাহুল্য, ইন্দুবালা তেমন রূপবতী ছিলেন না। সে ক্ষেত্রে অভিনয়ের প্রসাদ গুণে এবং গানের সাফল্যকে অবলম্বন করেই দীর্ঘকাল তাঁকে মঞ্চের দর্শকদের কাছে টিঁকে থাকতে হয়েছে। নিজের চেহারা ও রূপ সম্পর্কে তিনি প্রথম থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই নিজস্ব ক্ষমতার নৈপুণ্য প্রদর্শনে তিনি গোড়া থেকেই যত্নশীল।

প্রধানতঃ কমিক চরিত্রে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হ'ন। হাসিতে, গানে ও অভিনয়ের চাতুর্যে দর্শকদের তিনি মঞ্চে মুগ্ধ করে রাখতেন। এ বিষয়ে তিনি প্রায়ই সিরিও-কমিক অভিনয়ের পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। হাস্যরসের ভেতর দিয়ে দর্শকদের নজর কেড়ে নিয়ে ক্রমশঃ গান এবং জোরালো অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রটিকে সাফল্যের সঙ্গে দাঁড় করাতে সমর্থ হতেন।

সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ নট-নটীদের সাহচর্যে এসে তাঁর অভিনয় শিক্ষা ক্রমশঃ

উৎকর্ষতার চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে হাতে কলমে ইন্দুবালার অভিনয় শিক্ষার সূচনা মা রাজবালার কাছে। কিন্তু ক্রমশঃ দানীবাবু, যোগীনবাবুর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে তাঁর অভিনয় ক্ষমতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই কারণেই একই সময়ে মঞ্চে এবং চলচ্চিত্রে দুটি ভিন্নধর্মী অভিনয় শৈলীর সঙ্গে ইন্দুবালা নিজেকে যথাযথভাবে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন।

একদা রামবাগানে যে পরিবেশ এবং বিরুদ্ধতার সঙ্গে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে, সেই পরিবেশ আবহাওয়া এবং সামাজিক তথা অর্থনৈতিক চিত্রটিকে সামনে রেখে ইন্দুবালাকে এবং তাঁর অভিনয় পর্বের রূপরেখাটিকে বিচার করতে হবে। মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের যুদ্ধ পূর্ববর্তী জীবন এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবমূল্যায়নের পাশাপাশি এটি যেন রামবাগানের অসহায় একটি পরিবারের অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়ার বদলে, আলোতে উত্তরণের কাহিনী। তাঁর অভিনয় চর্চা গোড়ার দিকে মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণে হলেও আসলে এটা ছিল সদর্থে এক ধরনের জেহাদ। শহরের বাঙালী বাবু সমাজের কাছে এরা সামাজিক সংজ্ঞায় নেহাৎই নটী হিসেবে গোড়ার দিকে পরিচিত হয়েছিলেন। এঁদের বলা হত ‘রামবাগানের মেয়ে’। বলাবাহুল্য থিয়েটারে প্রথম যুগ যাত্রা শুরু করেছিল এঁদেরই শ্রমে, স্বেদে, প্রতিভায় এবং অশ্রুতে।

ইন্দুবালার সৌভাগ্য এই যে, সঙ্গীতের আসরে তাঁর প্রতিষ্ঠাই তাকে অভিনয়ের জগতে ভিন্ন মর্যাদা দান করেছিল। তাই গানের ইন্দুবালা যখন মঞ্চে এসে যোগ দিলেন তখন প্রাথমিক বাধাগুলো তাঁর কাছে বড়ো হয়ে ওঠেনি। শিশির ভাদুড়ীর মত ব্যক্তিত্ব তাঁকে চিনতে ভুল করেন নি। থিয়েটারের মালিকরা অবশ্য অনেকেই তাঁর সঙ্গীত জগতের প্রতিষ্ঠাকে ব্যবসায়িক স্বার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁদের তিনি হতাশ করেন নি। কিন্তু তাঁর অভিনয় প্রতিভা এরই ফলে অনেক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য বিকশিতও হতে পারেনি বলা যায়। কেননা, প্রায়শঃই তাঁকে নাটকে টাইপ চরিত্রের গণ্ডীতে আটকে রাখা হত। এই সব চরিত্রে তাঁর সাফল্য তখনকার দিনে প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পার্শ্ব-

চরিত্রের মধ্যে তাঁকে অধিকাংশ নাটকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। ইন্দুবালা তা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। কিন্তু জনপ্রিয়তার দোহাই দিয়ে তাঁকে সে সুযোগ থেকে প্রায়শঃই বঞ্চিত রাখা হয়েছে। জনপ্রিয়তার শিকার হয়ে এইভাবেই অনেকে শিল্পী যোগ্য মূল্যায়ন হতে বঞ্চিত হয়েছেন। চলচ্চিত্রে এসে ইন্দুবালার সে আক্ষেপ অনেকখানি দূর হয়েছিল বলা যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চলচ্চিত্রে ইন্দুবালা

ভারতবর্ষে সবাক ছবির গোড়ার দিকের পর্বে ইন্দুবালা বাংলা ছবির জগতে প্রবেশ করেছিলেন এবং বিভিন্ন ভাষায় তোলা প্রায় পঞ্চাশেরও অধিক ছবিতে পরবর্তীকালে তিনি অভিনয় এবং সঙ্গীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন। সাইলেণ্ট বা নির্বাক যুগ যখন প্রায় শেষ সেই সময় অর্থাৎ তিরিশের গোড়ায় ইন্দুবালা প্রথম চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। মাত্র বছর দশেকের মধ্যে তখনকার দিনে এতগুলি ভাষার ছবিতে তিনি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। পাশাপাশি মঞ্চের জগৎ এবং বিশাল সঙ্গীতের ক্ষেত্রকে একসঙ্গে সামাল দিয়ে তিনি কিভাবে তাঁর জনপ্রিয়তাকে অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একই সঙ্গে তিনি বাংলা, হিন্দী, উর্দু পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু ভাষায় নির্মিত ছবিতে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে গিয়েছেন। তাঁর নিজের কথায়, বলতে গেলে—'বাংলার চেয়ে হিন্দী ছবিতেই আদর পেয়েছি বেশি। লোকে খুব নিয়েছিল, আমার হিন্দী উচ্চারণ খুব ভালো ছিল কিনা। ছবিতে অনেক কাজ করেছি—মান, সম্মান, পয়সাও জুটেছে। কিন্তু তাই বলে যে রাতারাতি কেল্লা মাত করে দিয়েছিলাম তা নয়। অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। তবে একটু সুযোগ পেয়েছিলাম। আর একটা কথা, আমরা পুরনো দিনের লোক বলে কেউ যেন না ভাবেন যে, 'সাইলেণ্ট' ছবিতে কাজ করেছি। যেখানে গলার কোন কাজ নেই, কেবল রূপের চটক দেখিয়ে বাজী জিততে হবে, সেখানে কি আমার মত হতভাগিনীর ঠাঁই জোটে! এই তো পোড়া রূপের ছিরি। যাক, কাঁদুনি গেয়ে আর লাভ কি! আসল কথাটা বলি। আমাদের কালে প্রথম 'টকি' এল ম্যাডান থিয়েটার্সের দৌলতে। প্রথম প্রথম ছবি বলতে কেবল কিছু নাচ-গান হৈ-হল্লা, অল্প-স্বল্প কথা-বার্তা—ব্যস। না ছিল কোন গল্প, না কোন বাহাদুরি। কিন্তু তখন ঐতেই বাজার একেবারে সরগরম। 'টকি' দেখতে দেখতে কি আহ্লাদই যে না হত! দেখতাম আর ভাবতাম কি করে

'টকি'তে নেবে গান গাওয়া যায়। ভাবনাটা ক্রমে ক্রমে এমন পেয়ে বসল যে আর স্থির থাকতে পারলাম না। ধরলাম গিয়ে আমার বন্ধু গীতাকে। গীতা দু-চারটে সিনেমায় নেমে-টেমে তখন একটু নাম করেছিল। আমার সাধের কথা শুনে উৎসাহ দিল বটে, তবে তেমন যেন গা করল না। তবে তখন আমার অতো বিচার করার মতো মনের অবস্থা নয়। মুখের কথা শুনেই আমি আহ্লাদে একেবারে ডগমগ। কিছুদিন পরেই আমার সঙ্গে আলাপ হল জ্যোতিষ বাবুর। জ্যোতিষ বাঁড়ুজ্যে। ম্যাডানের অনেক ছবির পরিচালক ছিলেন উনি। ঠিক হল একখানা ছবিতে কাজীদার একটা গান দেওয়া হচ্ছে। আমায় সেটি গাইতে হবে। আমি তো হাতে চাঁদ পেলাম। শুনে অবধি ছটফট করতে লাগলাম। এদিকে দিন যায়, কিন্তু ডাক আর আসে না। শেষে নিজেই একদিন জ্যোতিষবাবুকে ফোন করলাম। জ্যোতিষবাবুর উত্তরে আমি একেবারে মুষড়ে গেলাম। কবি নাকি ওনার গান ব্যবহারে অনুমতি দেন নি। অতএব আমার ঠাঁই পাবার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। ঠারে ঠারে গীতাও বুঝিয়ে দিল যে, গান বাদ দিলে আমার আর আছে কি! দুঃখ পেলাম বটে, তবে ভেঙ্গে পড়লাম না। সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। জুটেও গেল সুযোগ।

সে সময় কলকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম নাম দিয়ে নতুন এক কোম্পানী চালু হয়েছিল। কোম্পানীর সব কিছু দেখাশোনা, তদারকি করতেন যিনি তাঁর নাম প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। প্রিয়বাবু উদার মানুষ ছিলেন। নতুন বলে কারোকে অবজ্ঞা করতেন না। বরং কারোর মধ্যে কোন প্রতিভার সন্ধান পেলে সাধ্যমত সুযোগ দেবার চেষ্টা করতেন। এই প্রিয়বাবুর কাছে গাইয়ে ধীরেন দাস আমায় একদিন নিয়ে গেলেন। ওনাদের কোম্পানী তখন 'যমুনা পুলিনে' বলে একটা ছবি তুলছিল। সেখানে 'কুটিলা' চরিত্রে অভিনয় করার জন্যে ওনারা মেয়ে খুঁজছিলেন। আমায় প্রিয়বাবু পরীক্ষা করলেন। পাশ করে গেলাম আমি। ব্যস, আমায় আর পায় কে! যদিও অত আহ্লাদ ছবি তোলার প্রথম দিনেই শুকিয়ে গেছল'। স্টুডিওর ভেতর চাপা ঘরে পেল্লাই পেল্লাই আলো ঝাঁ ঝাঁ করে জ্বলছে, তার মধ্যে অভিনয়— উঃ গা যেন জ্বলে যাবার যোগাড়। মানে পোড়া অঙ্গ আরও পুড়ল।

পরদিন তো আর যেতেই চাইছিলাম না। মা অনেক করে বুঝিয়ে সুজিয়ে পাঠালেন। দিনে দিনে অবশ্য সবই সয়ে এল।*

জীবনে এইভাবে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে থিয়েটারের ইন্দুবালা ক্রমশঃ চলচ্চিত্রের পর্দায়ও নিজের আসনটি পাকা করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ওই 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ার' হয়ে পর পর প্রায় ষোলখানা ছবিতে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়ে যান। সুরু হয় ইন্দুবালার বৈচিত্র্যময় জীবনে আর এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

বস্তুত সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার জীবনে চলচ্চিত্র নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি যেমন সাফল্যলাভ করেছিলেন, সেই কৃতিত্বের সুবাদেই বাংলা চলচ্চিত্র-জগত থেকে তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। মঞ্চাভিনয়ের বছর সাতেকের মধ্যে যখন তাঁর সুনাম রীতিমতো সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই পর্বে তিনি নিজেই উৎসাহী হয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে আগমন করেন (১৯৩১ খ্রীঃ)। বাংলা চলচ্চিত্রের সেটা ছিল প্রথম যুগ। চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় সুরু হয়েছিল বি. এল. খেমকা নিবেদিত গীতিবহুল সবাক চিত্র 'যমুনা পুলিনে' চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। চলচ্চিত্রে ইন্দুবালা মোট বাটটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন, অথচ ছবির জগতে তিনি মাত্র বছর পাঁচেক যুক্ত ছিলেন। এছাড়া আরও পাঁচটি ছবিতে তিনি অভিনয় না করলেও গান গেয়েছিলেন, অর্থাৎ আজকাল যাকে বলা হয় নেপথ্য গায়িকা, তাই। অবশ্য সেখানে তাকে বলা হত ব্যাকগ্রাউণ্ড সঙ্ বা নেপথ্য সঙ্গীত।

ইন্দুবালা অভিনীত প্রথম ছবিটির কাজ সুরু হয় উনিশ শো তিরিশ সালের মাঝামাঝি। প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি পরিচালিত এই ছবিটির নাম ছিল প্রথমে 'রাধাকৃষ্ণ'। অবশ্য প্রথম পর্যায়ে ইন্দুবালা এই ছবির শিল্পী ছিলেন না। গোড়ায় এই 'রাধাকৃষ্ণ' ছবিটি অর্ধসমাপ্ত হয়েই বেশ কিছুকাল পড়েছিল। ১৯৩১ খ্রীঃ ছবিটি অবশেষে শেষ হয় এবং 'যমুনা পুলিনে' নামে ১৯৩২ খ্রীঃ ২১শে জানুয়ারী রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে। প্রথম পর্যায়ে ছবিটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ এই যে, পরিচালক প্রিয়নাথ কোন

* অতীত দিনের স্মৃতি—ইন্দুবালা (আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৯)

কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী ছেড়ে কিছুকাল চলে গিয়েছিলেন। ফলে ছবিটিও অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। প্রিয়নাথবাবু পরে আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়াতে ফিরে আসার পর এর চিত্রগ্রহণ সুরু হয় এবং সহরের কয়েকজন নামজাদা গায়িকাকে এই ছবির ভূমিকালিপিতে গ্রহণ করা হয়।

সপ্ত-তারকাযুক্ত সৌন্দর্য্যময়, আকৃষ্টময়, মনোময় ছবি এই 'যমুনা পুলিনে'র অভিনয়াংশে ছিলেন সবিতা দেবী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, বীণাপাণি, কমলা, সন্তোষ সিংহ, রেনুবালা, প্রকাশমণি ইত্যাদি।

ছবিটি মুক্তি পাবার পূর্বে 'আজকাল' পত্রিকার খবর (শনিবার ১৬ই পৌষ, ১৩৩৯ সাল):

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের প্রথম অবদান 'যমুনা পুলিনে' (রাধাকৃষ্ণের অন্য নাম) ক্রাউনে মুক্তিলাভ করবে বলে প্রাচীর বিজ্ঞাপন পড়েছে। ছবিখানির আকর্ষণ আছে বিস্তর। যথা—প্রসিদ্ধা গায়িকাদ্বয় শ্রীমতী আঙ্গুরবালা ও শ্রীমতি ইন্দুবালা, শ্রীমতী বীণাপাণি, সবিতা দেবী ও সুদর্শন নট ধীরাজ ভট্টাচার্য্য একত্রে এই সবাক চিত্রে দেখা দেবেন। গানের দিক দিয়ে ছবিখানা নিশ্চয় চিত্রামোদীদের হৃদয় জয় করবে। এই প্রতিষ্ঠানে আর কোন বাংলা সবাক চিত্র উঠছে বলে এখনও খবর পাইনি। তেলেগু ভাষায় "রামায়ন" উঠছে। প্রসিদ্ধ শিল্পী নরেশচন্দ্র মিত্র এতে প্রয়োগশিল্পী রূপে কাজ করছেন।

এর আগের খবরে প্রকাশ: অর্ধসমাপ্ত 'রাধাকৃষ্ণ'-কে সমাপ্ত করবার জন্য প্রিয় গাঙ্গুলী মহাশয় পুনরায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ায় ফিরে এসেছেন এবং পূর্ণোদ্যমে কাজ চালাচ্ছেন। উদীয়মান চিত্রনট শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন এবং রাধাকৃষ্ণে কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য মনোনীত হয়েছেন বলে জনৈক সহযোগী সংবাদ দিয়েছিলেন। আমরা শুনেছিলুম, শ্রীমতী ডলি দত্ত নাকি কৃষ্ণরূপে দেখা দেবেন। (৯ই পৌষ ১৩৩৯, ২৪শে ডিসেম্বর)।

ছবি মুক্তি পাবার আগে 'নাচঘর' জানিয়েছেন: বড় খবর, "রূপবাণী"তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর প্রথম বাংলা সবাক চিত্র 'যমুনা পুলিনে' সাধারণের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। চিত্রামোদীদের আদরের দুলালী সবিতা দেবী 'যমুনা পুলিনে' বসে কেবল কথাই কন্‌নি, গানও গেয়েছেন।

ইঙ্গ-বঙ্গ মহিলার মুখে বাংলা গান কেমন শোনায়, তা' জানতে আমাদের আগ্রহ আছে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে।

'যমুনা পুলিনে'র প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে, তার মধ্যে ছড়ানো গানের মালা। কম ক'রে অন্ততঃ আঠারোখানি গান এই বইখানিতে আছে এবং এগুলি যাঁরা গেয়েছেন, তাঁদের চাইতে বড় ও নামকরা গাইয়ে কলকাতায় কমই আছেন। আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা (ঝরিয়া), বীণাপাণি (বেতারের), ধীরেন দাস—গাইয়ে হিসেবে এঁদের নাম কতখানি, তা কাউকে বলে দিতে হবে না নিশ্চয়ই। 'যমুনা পুলিনে' আমাদের খুসি ক'রতে পারলেই ভাল (নাচঘর, ২৯শে পৌষ ১৩৩৯)।

'আজকাল' পত্রিকার ভবিষ্যৎবাণী ছিল এই যে, এই ছবিতে একটি গীতি-বহুল ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা শ্রীমতী ইন্দুবালা অভিনয় করছেন। একা তাঁর অপূর্ব্ব সঙ্গীতেই দেখছি 'রাধাকৃষ্ণ' জমে উঠবে।*

প্রথম ছবি 'যমুনা পুলিনে'র আলোকচিত্রশিল্পী বা ক্যামেরাম্যান ছিলেন শ্রীযতীন দাস। শ্রী বি. এল. খেমকা নিবেদিত (An EIF Bengali Production) এই ছবির রেকর্ডিং হয়েছিল RCA PHOTOPHONE systemএ। ছবির নায়িকা রাধাবেশী সবিতা দেবীর আসল নাম ছিল Iris Gasper ; এটি বাংলায় তাঁর প্রথম ছবি।

'যমুনা পুলিনে' মুক্তি পাবার পর পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে তা আলোচিত হয়। 'নবশক্তি' পত্রিকার মতামত হল :

রূপবাণীতে—"যমুনা পুলিনে"

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে যে ভাব-মাধুর্য্য আছে বাঙালীর অন্তরে তার আবেদন চিরন্তন। এই আবেদনের ব্যবসায়গত সম্ভাবনায় আকৃষ্ট হয়েই সম্ভবতঃ নবগঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী তাঁদের প্রথম বাংলা ছবি 'যমুনা পুলিনে'র গঠনকার্য্যে হাত দিয়েছিলেন। তাই গানকেই তাঁরা ছবিখানির প্রধান বাহন করেচেন। কেননা সাধারণের মনে রসাবেশ সৃষ্টি করবার এর চেয়ে আর কোন সহজতর উপায় নেই। এইসব গান যাতে চিত্তাকর্ষক হয় সে জন্যেও চিত্র-নির্মাতারা যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন। 'যমুনা

* আজকাল ২রা পৌষ ১৩৩৯

পুলিনে'র বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁরা শ্রীমতী আঙ্গুরবালা, শ্রীমতী ইন্দুবালা, শ্রীমতী কমলা, শ্রীমতী বীণাপাণি ও শ্রীযুক্ত ধীরেন দাসের মত নামকরা গায়ক-গায়িকার সমাবেশ করেচেন। উপরন্তু নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী সবিতা দেবী ও শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্য্যকেও তাঁদের এই প্রথম সবাক চিত্রে গান গাইতে হয়েছে। এর ফলেও ছবিখানির আকর্ষণ অনেকাংশে বেড়ে গেছে। (শুক্রবার ১৪ই মাঘ ১৩৩৯)।

আবার 'ভগ্নদূত'এর মতে, 'যমুনা পুলিনে' হয়েছে নামভারি গায়ক-গায়িকাগণের সম্মিলিত এক জলসা। প্রযোজকের সূক্ষ্ম রসবোধের অভাবে যে এরূপ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। এঁদের মতে, কুটিলার ভূমিকায় শ্রীমতী ইন্দুবালার অভিনয় হয়েছে 'অতি' দোষে দুষ্ট। পাশাপাশি আর একটি পত্রিকার প্রতিবেদকের মত হল, কুটিলার অংশে শ্রীমতী ইন্দুবালার অভিনয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (রং-বে-রং, বুধবার ১২ই মাঘ ১৩৩৯)। এ প্রসঙ্গে সেকালের বিখ্যাত সিনেমা পত্রিকা 'দীপালী', 'নাচঘর'এর মতামতও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনাযোগ্য।

'দীপালী' পত্রিকার ১৩ই মাঘ ১৩৩৯ বৃহস্পতিবার, শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল 'যমুনা পুলিনে' ছবির ভালোমন্দ সম্পর্কে দীর্ঘ এক আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, কেবলমাত্র সঙ্গীতের আকর্ষণ ছাড়া 'যমুনা পুলিনে' উল্লেখ করিবার মত "বস্তু" আর কিছুই নাই। "কুটিলার" ভূমিকায় শ্রীমতী ইন্দুবালার সব কটি গান চমৎকার। তাহার ভিতর একখানি "চৌতালে" গাহিয়াছেন। পাখোয়াজ সঙ্গতে খাঁটী রাগিনী বজায় রাখিয়া এই গানটি জমাইয়াছিলেন সুন্দর। শ্রীমতীকে মানাইয়া ছিলও ভাল।

চিত্রপ্রিয় 'নাচঘর' পত্রিকায় লিখলেন : 'যমুনা পুলিনে'র প্রধান সম্পদ হচ্ছে তার গান, এবং একমাত্র এই গানের গুণেই 'যমুনা পুলিনে' চিত্র-প্রিয়দের মন হরণ করবে—করবে কি, ইতিমধ্যেই করেছে। প্রায় অধিকাংশ গানই এমন চমৎকার ভাবে গাওয়া হয়েছে যে, বার বার শুনেও আশ মিটবে না। আবার ওরই মধ্যে বিশেষ ক'রে শ্রীমতী ইন্দুবালা ও শ্রীমতী কমলার (ঝরিয়া) গান! শ্রীমতী ইন্দুবালার দু'খানি "রঙের" গানের প্রথমখানি—"এদের রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়"—আমাদের পর্যন্ত খুসি করেছে, যথাযথ

ভঙ্গি-সহকারে খুব ভাল চালে গাওয়া হয়েছে ব'লে। তাঁর কণ্ঠের শ্যামা-সঙ্গীত "কিঙ্করী পদে শরণ যাচে" (মালকোষ রাগিনীতে গাওয়া) আমাদের কানকে তৃপ্তি দিয়েছে অতি মাত্রায়।...(নাচঘর ১৪ই মাঘ ১৩৩৯)।

এমন কি সেকালে বাংলা 'অমৃতবাজার'ও লিখেছিলেন : শ্রীমতী ইন্দুবালা কুটিলার ভূমিকায় তাহার অভিনয়নৈপুণ্য ও সঙ্গীতসুধায় সকলকে তৃপ্ত করিয়াছেন। সেকালের খেয়ালী, লিবার্টি, বাংলা, দুন্দুভি পত্রিকাতেও ইন্দুবালার অভিনয় ও সঙ্গীতের বিপুল প্রশংসা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য 'ভগ্নদূত' অভিনয়ের সমালোচনা করলেও ইন্দুবালার গানের প্রশংসা করতে কাতর হননি !

যাই হোক, 'যমুনা পুলিনে' প্রথম ছবি হিসেবেই ইন্দুবালার গানকে ব্যাপক ভাবে জনসমক্ষে প্রচার করতে সক্ষম হয়। ইন্দুবালার জনপ্রিয়তার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী এর পর আরও পনেরোটি ছবিতে ইন্দুবালাকে অভিনেত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। এমন কি 'যমুনা পুলিনে' হিন্দী ভার্সানেও (১৯৩২) তাঁকে রাখা হয়।

ইন্দুবালার পরের ছবি হিন্দীতে তোলা দেবকীকুমার বসুর 'সীতা'। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার 'সীতা' ছবিতে অশোকার ভূমিকায় ইন্দুবালা গানে আরও মাতিয়ে তুললেন দর্শকদের। দেবকী বসুর পরিচালনায় এই ছবি সেকালে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র বলা হয়েছিল। সীতার চরিত্রলিপি ছিল এইরকম :

প্রযোজক—ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী, পরিচালনা—শ্রীদেবকীকুমার বসু, ফটোগ্রাফী—শ্রীযতীন দাস, রেকর্ডিং—মিঃ নিগম, সঙ্গীত পরিচালনা—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে; ভূমিকায় : সীতা—শ্রীমতী দুর্গাবাঈ খোটে, রাম—মিঃ পৃথ্বীরাজ, লক্ষ্মণ—মিঃ গুল হামিদ, মাতা পৃথিবী—শ্রীমতী মুক্তার বেগম, বাল্মিকী—মিঃ জি. আর. তাম্বে, লব—মিঃ ত্রিলোক কাপুর, কুশ—শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য, উর্ম্মিলা—শ্রীমতী রাধা, বৈতালিক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, অশোকা—শ্রীমতী ইন্দুবালা। একশো মিনিটের এই হিন্দী ছবিটি সেকালে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল। 'সীতা' সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায়ও যথেষ্ট প্রশংসা-বাণী প্রকাশিত হয়। 'রূপতরঙ্গ' শিরোনামায় 'খেয়ালী' পত্রিকা লিখেছিল, 'সীতা' হয়েছে সর্বাঙ্গসুন্দর সবাক ছবি। এর প্রশংসা অতি সূক্ষ্মদৃষ্টি

সমালোচকও করবেন শতমুখে। হিন্দী-চিত্রজগতে 'সীতা' যে আরেকটি চিরস্মরণীয় ছবি তাতে আর আমাদের সন্দেহ নেই। সব দিক দিয়ে এত নিখুঁত ছবি 'পূরণ ভকত'-এর পর হিন্দীতে আমরা আর দেখিনি বললেও চলে। (শনিবার ১৫ই বৈশাখ ১৩৪১)।

'আজকাল' পত্রিকার মতে, 'রামচন্দ্রকে যে-নারী শিশু থেকে মানুষ করে এসেছে, সেই নারীর ভূমিকায় মিস ইন্দুবালার অভিনয় সুন্দর হয়েছে।' 'নিউ সিনেমা'য় মুক্তিপ্রাপ্ত (২০শে এপ্রিল ১৯৩২) এই ছবিতে মোট পনেরোখানি গান ছিল। ইন্দুবালার গান তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হতে দেখা যায়। যার ফলে 'সীতা' ছবির গান ইন্দুবালার কণ্ঠে গ্রামোফোন কোম্পানী বাইরে প্রকাশ করেন (রেকর্ডের নং N6603)। ইন্দুবালার সেই গান দুটি ছিল—Banse Laute Hue ও Kanha Hai Seeta, অর্থাৎ 'বন্‌শা লৌটে হুয়ে' ও 'কান্‌হা হ্যায় সীতা'।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দেই 'যমুনা পুলিনে' ছবিটির হিন্দী ভার্সান 'রাধাকৃষ্ণ' (পরিচালনা—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী) মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। হিন্দী ভার্সানেও ইন্দুবালার গাওয়া গানগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অবশ্য বাংলা 'যমুনা পুলিনে'র তুলনায় হিন্দী 'রাধাকৃষ্ণ' ছিল ম্লান।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দুবালার আরও দুটি ছবি মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। যেমন উর্দু কথাচিত্র 'কিং ফর এ ডে' (King for a day) ও হিন্দী ধর্মচিত্র 'নল দময়ন্তী'।

'কিং ফর এ ডে' এর রচয়িতা ছিলেন বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার শ্রীনিরঞ্জন পাল। এ্যালফ্রেড থিয়েটারে মুক্তিপ্রাপ্ত এই উর্দু সবাক চিত্রটির পরিচালক ছিলেন নবাগত B. S. Rajhans, যাঁর পূর্ববর্তী দুটি ছবি 'কৃষ্ণবর্ণ তীরন্দাজ' ও 'গুপ্তধন' তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু এই ছবিতে মিঃ আখতার নাওয়াজ ও মজাহার খাঁ, সবিতা দেবী, মিঃ এস. আথার এবং মিঃ বাচনের মত শিল্পীদের সমাবেশে দর্শকদের কাছে তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি এই ছবিতে ইন্দুবালার গান যথেষ্ট প্রাণস্পর্শী ছিল বলে ছবিটি বেশ কিছু দর্শককে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই ছবির অন্য এক উল্লেখযোগ্য অভিনেতা ছিলেন মিঃ আখতার আলী।

অন্যদিকে এঁদেরই পরবর্তী ছবি 'নল দময়ন্তী'তে ইন্দুবালা দময়ন্তীর মাতার ভূমিকায় আশ্চর্যসুন্দর অভিনয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। হিন্দী চিত্র এই দময়ন্তীও রাজহংসের পরিচালনায় নির্মিত এবং তা সর্বপ্রথম এ্যালফ্রেড থিয়েটারেই মুক্তি পায়। এই ছবি সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা হলেও 'আজকাল' পত্রিকা দীর্ঘ সমালোচনার মধ্যেও ইন্দুবালা সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'প্রসিদ্ধা গায়িকা শ্রীমতী ইন্দুবালা নেমেছেন দময়ন্তীর মাতার ভূমিকায়। দেখে আশ্চর্য হলুম যে, তার একটিও গান নেই এই চিত্রে।'

সত্যিই এই ছবিতে ইন্দুবালাকে সর্বপ্রথম কোন গান গাইতে দেখা যায়নি। এই ছবির রেকর্ডিং ছিল উচ্চশ্রেণীর। স্বচ্ছ ফটোগ্রাফীর জন্যে আলোকচিত্রশিল্পী যতীন দাস যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

১৯৩২ সনে ইন্দুবালার 'সীতা' ছাড়াও আরও বেশ কয়টি ছবি মুক্তি পায়। যেমন, মীরাবাঈ (বাংলা), রাজরাণী মীরা (হিন্দী), রাধাকৃষ্ণ (হিন্দী) ও দুলারী বিবি (উর্দু)।

ইন্দুবালার সর্বাধিক আলোচিত ও প্রশংসাধন্য চিত্রের নাম ছিল 'মীরা-বাঈ'। বাংলা ও হিন্দীতে তোলা এই ছবিতে চরিত্রলিপির পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছিল। কিন্তু বাংলা ও হিন্দী দুটি ভার্সানেই ইন্দুবালা 'পাগলিনী'র চরিত্র কখনোই পরিবর্তিত হয় নি। কলকাতার বড়ুয়া স্টুডিওটির আমূল সংস্কার করে এখানেই হিন্দী ও বাংলা মীরাবাঈ ছবিটি তোলা হয়।

মীরাবাঈ ছবির পরিচয়লিপি* ছিল নিম্নরূপ :

গল্প—শ্রীহীরেন বসু (শ্রীবসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের "মীরাবাঈ" থেকে স্থানে স্থানে ঘটনা সংগৃহীত)।

বাংলা কথোপকথন—শ্রীদেবকী বসু

হিন্দী কথোপকথন—শ্রীপণ্ডিত নরোত্তম ব্যাস

পরিচালক—শ্রীদেবকী বসু (হিন্দী ও বাংলা সংস্করণ)

'মীরাবাঈ' ছবির ইন্দুবালার বাংলা রেকর্ডের নং P11787 মধু যামিনী / মধু চন্দ্র তলে

'রাজরাণী মীরা' (হিন্দী) ছবির ইন্দুবালার রেকর্ড নং P10669

১) পিয়া মিলন কী আশ ২) চন্দর কলসী সয়াত রাত থী

আর্ট ডাইরেক্টর—শ্রীনীতীন বসু
শব্দযন্ত্রী—শ্রীমুকুল বসু
সহকারী—শ্রীরনেণ লাহিড়ী

হিন্দী (রাজরাণী মীরা)	বাংলা (মীরাবাঈ)
রানা কুম্ভ—শ্রীপৃথ্বীরাজ	রানা কুম্ভ—শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মীরাবাঈ—শ্রীমতী দুর্গাবতী খোটে	মীরাবাঈ—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী সাহু
অভিরাম—মিঃ আনসারি	অভিরাম—শ্রীঅমর মল্লিক
ভানু সিংহ—মিঃ সিদ্দিক্	মন্দার কুমার—শ্রীজিতেন গোস্বামী
মন্দার কুমার—শ্রীচুণিলাল	রূপ গোস্বামী—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
চাঁদ ভট্ট—শ্রীপাহাড়ী সান্যাল	বৃদ্ধ সভাসদ—শ্রীইন্দু মুখোপাধ্যায়
লালবাঈ—শ্রীমতী নাসির জান	সুনন্দা—শ্রীমতী মলিনা
পাগলিনী—শ্রীমতী ইন্দুবালা	পাগলিনী—শ্রীমতী ইন্দুবালা
সুনন্দা—শ্রীমতী মলিনা	লালবাঈ—শ্রীমতী নিভাননী
অলকা—শ্রীমতী সুরমা	চাঁদভট্ট—শ্রীপাহাড়ী সান্যাল
রূপ গোস্বামী—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	অলকা—শ্রীমতী সুরমা
বৃদ্ধ সভাসদ—শ্রীইন্দু মুখোপাধ্যায়	

ইন্দুবালা ছবি দুটিতে পাগলিনীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে একাই তিনখানি একক সঙ্গীত ও দ্বৈতকণ্ঠে আরও তিনটি গান করেন এবং গানগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

একই সময়ে ইন্দুবালার উর্দু ছবি 'দুলারী বিবি' বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৩২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত উর্দু ছবি মাত্র তিন রী:লের এই ছবিটি বাংলার বাইরে প্রথমে দেখান হয়। বিশ্ববিখ্যাত কমেডিয়ানদ্বয় লরেল ও হার্ডির একখানি ছবির ওপরে ভিত্তি করে নির্মিত এই ছবির মধ্যে পরিচালক দেবকীকুমার বসু নির্মল ও বুদ্ধিদীপ্ত একটি হাসির ছবিকে পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। এই ছবিতে লরেল ও

'খেয়ালী' (৯ই আষাঢ় শুক্রবার ১৩৪০)
* 'বাতায়ন' (১৬ই আষাঢ় শুক্রবার ১৩৪০)

হাড়ির মত দুটি চরিত্র ছিল, যাতে রূপদান করেছিলেন স্বয়ং সায়গল ও মিজ্জান। এই ছবির অন্যতম আকর্ষণ ছিল, নায়িকা দুলারী বিবির চরিত্রে ইন্দুবালার অভিনয় ও গান। ছবির আলোকচিত্র গ্রহণে শ্রীইউসুফ মুলজী ও শব্দগ্রহণের দায়িত্বে শ্রীলোকেন বসু ছাড়াও ছবিতে আনুষঙ্গিক সঙ্গতে অংশগ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। হাসির ছবির ক্ষেত্রে ছোট্ট এই ছবিটি সেকালে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী ছিল। ছবিটি কলকাতায় প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত 'ইহুদী কা লেড়কী'র সঙ্গে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে জানা যায়।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দুবালা অভিনীত ছবির সংখ্যা পাঁচটি। এর মধ্যে সে বছরে তোলা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে D. G. বা ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী পরিচালিত বাংলা হাসির ছবি **Excuse Me Sir** (মুক্তি ৩০শে মার্চ ১৯৩৪) খুবই জনপ্রিয় হয়। এই ছবির চরিত্রলিপি ছিল নিম্নরূপ :

যমরাজ—শ্রীনির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়
Mrs. Jana—নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী
চিত্রগুপ্ত—শ্রীললিত সেন
Dentist—শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য (ভবানী পাঠক)
ঐ Assistant—শ্রীসরোজ বাগচী
শ্রীসাবিত্রী রায়—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
তারিণী রায় (ঐ স্ত্রী)—শ্রীমতী ইন্দুবালা
বেবী রায় (ঐ কন্যা)—শ্রীমতী মলিনা
বন্ধু—শ্রীঅহিভূষণ সান্যাল
কলেজ ডাক্তার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

নিউ থিয়েটার্সের এই ছবিটিকে সেকালের দেশীয় হাস্যরসাত্মক শ্রেষ্ঠ ছবির পর্যায়ে ফেলা হয়েছিল। 'খেয়ালী'র মতে, ছবিখানির গল্পটি যেমন চিত্তাকর্ষক, শব্দ স্থিরীকরণ ও সঙ্গীতও তেমনই উচ্চাঙ্গের হয়েছে।[১] 'চিত্রা'য় মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি সম্পর্কে বলা হয়েছিল, এই ছবিখানি দেখে হাসি চাপবার চেষ্টায় যাঁরা তাদের আভিজাত্য সাধারণত বজায় রাখবার

---

১ খেয়ালী, ২২শে চৈত্র ১৩৪০

চেষ্টা করেন, তাঁরাও সাধারণ লোকের মতন না হেসে থাকতে পারেননি। এ থেকে মনে হয়, ছবিখানির আসল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।...মিসেস তারিণী রায়ের ভূমিকায় শ্রীমতী ইন্দুবালার অভিনয়ের প্রতি পরিচালক মশাই যে দৃষ্টি রেখেছিলেন তা বুঝা গেল। †ইন্দুবালা সম্পর্কে 'বাংলা' পত্রিকা বলেছিলেন, "**Excuse Me Sir**"এর স্ত্রী রূপে সুগায়িকা ইন্দুবালা এই ছবিতে সচলা হওয়ায় তাঁহার অভিনয়ও বেশ হইয়াছে। সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়ালের নির্দেশনায় এই ছবির সঙ্গীত হয়ে উঠেছিল এর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ফলে পত্রপত্রিকায় ধীরেন্দ্রনাথ ও এর সঙ্গীতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছিল। যেমন 'ভগ্নদূত' লিখেছিলেন :

'নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর দৌলতে বাংলা আজ সমস্ত ভারতের ফিল্ম জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে—একথা নিউ থিয়েটার্স-এর অতিবড় শত্রুরও অস্বীকার করার উপায় নাই।'

নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর ব্যঙ্গ-চিত্রনাট্য "এক্সিউজ মি স্যার" একখানি নূতন ধরনের কৌতুক নাট্য। বাংলা চিত্রজগতে কৌতুক নাট্যের প্রতি এ যাবৎকাল কেউ দৃষ্টি দেননি। নিউ থিয়েটার্স লিঃ এই বিভাগের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে চিত্রপ্রিয় দর্শকদের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। ইতিপূর্বে নিউ থিয়েটার্সই "চিরকুমার সভা" "পুনর্জ্জন্ম" "মাসতুতো ভাই" রচনা করে কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন। কিন্তু "এক্সকিউজ মি স্যার" ব্যঙ্গ-চিত্রাবলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে একথা যিনিই দেখবেন তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য। বাংলা চিত্রজগতে যে "এক্সকিউজ মি স্যার"এর মত ছবি জন্মাতে পারে একথা "এক্সিউজ মি স্যার" না দেখলে সহজে কারও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হবে না। "এক্সিউজ মি স্যার" যে কোন বিদেশী কৌতুক চিত্রের সঙ্গে তুলনীয় হ'তে পারে, একথা আমরা বেশ স্পর্দ্ধা সহকারেই বলতে পারি।

"এক্সিউজ মি স্যার"এর পরিচালনা পরিচালককে অনেক উর্দ্ধে তুলে দিয়েছে। এর সেটিং-এর মিউজিক এক কথায় অনিন্দ্যসুন্দর।

ধীরেন গাঙ্গুলীর ভাষায় বলতে বাধ্য হচ্ছি, "এক্সিউজ মি স্যার"এর

† বাতায়ন—২৩শে চৈত্র ১৩৪০

মত মিউজিক, বাংলা সবাক ছবিতে এর পূর্বে খুব কমই দেখেছি এক মিউজিকেই দর্শককে আত্মহারা করে দেয়। রাইচাঁদ বড়ালকে এর জন্য আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্চি (২৩শে চৈত্র ১৩৪০)।

কমেডি চরিত্রে এই ছবি থেকেই ইন্দুবালার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল বলা চলে। এই বছরই (১৯৩৩) পণ্ডিত সুদর্শন ও প্রফুল্ল রায় পরিচালিত Bharat Laksmi Talking Picturesএর হিন্দী পৌরাণিক চরিত্র 'মন্থরা'র রূপদান করেছিলেন ইন্দুবালা 'রামায়ন' ছবিতে। সম্পূর্ণ বিপরীত এই কূটিল চরিত্র মন্থরার অভিনয়ে সেকালে ইন্দুবালা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছিলেন।

নরোত্তম ব্যাস লিখিত 'বলিদান'ও এই সময়েরই ছবি। হিন্দীতে তোলা এই ছবিতে দুই ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে ইন্দুবালা ও ও আর. পি. কাপুর। ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'বলিদান' তুলনামূলক ভাবে একটি অনুল্লেখ্য ছবি। এর চরিত্রলিপিতেও অবশ্য দাদাভাই সরকারী (যাঁকে 'হিন্দীর দানীবাবু' বলা হত), অহীন্দ্র চৌধুরী, কে. শর্মা, আবদুল্লা কাবুলি, দেববালা ও পার্বতীর ন্যায় উল্লেখযোগ্য নাম যুক্ত ছিল। তবে এ ছবির সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করেছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে ইন্দুবালা অভিনীত 'সর্দারনী' চরিত্রটি নিঃসন্দেহে অবশ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিভূতি দাসের ফটোগ্রাফীও আকর্ষণীয়।

কিন্তু ঐ বছরই (১৯৩৩) ইন্দুবালার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বহুল প্রচারিত চিত্র 'বিল্বমঙ্গল' মুক্তি পায় (৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৩)। এই ছবিতে ইন্দুবালা অভিনীত 'পাগলিনী' চরিত্র তাঁকে খ্যাতির শীর্ষদেশে পৌঁছে দিয়েছিল। Indian Film Industries-এর দ্বিতীয় ছবির (R. C. A. যন্ত্রে তোলা) প্রযোজক—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, পরিচালনা—জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী ও প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আলোকচিত্র—ননী সান্যাল, শব্দগ্রহণ—তরুণ বৈজ্ঞানিক শ্রীমধুসূদন শীল এম. এস-সি., সম্পাদনা—জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়। সম্পূর্ণ বাঙালী প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ইনঃ ইতিপূর্বে ম্যাডান ষ্টুডিও ভাড়া নিয়ে 'সাবিত্রী' নামে একটি ছবি করেছিলেন বটে, কিন্তু এবার এই গোষ্ঠী নিজেদের ষ্টুডিওতে 'বিল্বমঙ্গল'

তুললেন এবং অসাধারণ সাফল্যলাভ করেছিলেন বলা যায়। বিশেষতঃ এতে ইন্দুবালার অভিনয় ছিল অসাধারণ। পত্রিকার মতে, 'গানের দিক দিয়ে পাগলিনীর ভূমিকায় বিখ্যাত গায়িকা মিস্ ইন্দুবালা আসর মাৎ করেছেন। যেটুকু অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন সেটুকুও ইনি যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করেছেন। বাস্তবিক ইন্দুবালার মধুর সঙ্গীত এখনো আমাদের কানে বাজছে। 'মীরাবাঈ' ছবিতে ইন্দুবালা তেমন করে দর্শকদের মনে রেখাপাত করতে পারেননি বটে, কিন্তু বিল্বমঙ্গলে পাগলিনীর ভূমিকাভিনয় এঁকে চিত্রজগতে অমর করে রাখবে। (দুন্দুভি, ১লা পৌষ শনিবার ১৩৪০)।

বিল্বমঙ্গল-এর চরিত্রলিপি ছিল নিম্নরূপ :

ভিক্ষুক—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী
সাধক—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
বণিক—শ্রীশৈলেন চৌধুরী
বিল্বমঙ্গল—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চিন্তামণি—শ্রীমতী রানীবালা
থাক—শ্রীমতী শান্তবালা
পাগলিনী—শ্রীমতী ইন্দুবালা
অহল্যা—শ্রীমতী মায়া মুখার্জী
সোমগিরি—শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বসু

শহরে বিল্বমঙ্গল বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে চলেছিল। কারো কারো মতে, ছবিটি বাংলা ছায়াছবির এ পর্যন্ত তৈরী ছবিগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট একটি স্থানের অধিকারী। অন্যদিকে কোন কোন পত্রিকার মতে, এটি 'বাংলা ছায়াছবিতে যৌন আবেদনের (sex-appeal) প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।* অবশ্য এই পত্রিকা অজস্র অভিযোগ সত্ত্বেও স্বীকার করেছেন, পাগলিনীর গান সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই, ইন্দুবালার গান সর্বজনপ্রিয়। ইন্দুবালার গান সম্পর্কে সকলেই সেই সময় এইভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেতে উঠেছিলেন। যেমন 'বাতায়ন'এর মতে, পাগলিনীর ভূমিকায় ইন্দুবালা তাঁর মুখের বীভৎসতাকে অকারণে প্রাধান্য দেননি। এর জন্য তাঁর অভিনয় বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তাঁর গানগুলিও বেশ শ্রুতিমধুর হয়েছে এবং তাঁকে যে পরিচালক মশাই এতটা control করতে পেরেছেন, এর জন্য সত্যিই আমরা তৃপ্তি অনুভব করেছি। (১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৩)।

* আজকাল, শনিবার ২৯শে পৌষ ১৩৪০ সাল।

DIPALI ইংরেজী পত্রিকাও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন। প্রতিবেদক **Chandrasekhar** লিখেছিলেন, **Indu Bala in the role 'Pagalini' sings in her usual charming and after my experience about her act in "Mirabai". I am glad to say that it is possible to watch her act without feel tired. (14th Dec, Thursday 1933)** এরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে 'বাংলা' পত্রিকা বললেন, শ্রীমতী ইন্দুবালার গানগুলি গাওয়া হয়েছে ভাল, চেহারাও এর ঠিক আগেকার ছবির তুলনায় ভাল হয়েছে।*

১৯৩৪ সনে মুক্তিপ্রাপ্ত ইন্দুবালার প্রথম ছবির নাম 'চাঁদ সদাগর'। ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের এই ছবিটির মুক্তি ঘটে ক্রাউন সিনেমায় ১৭ই মার্চ ১৯৩৪। এই ছবিতে চরিত্রলিপি ছিল এইরকম :

চাঁদ—অহীন্দ্র চৌধুরী, লখীন্দ্র—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, বেহুলা—শেফালিকা, সনকা—পদ্মাবতী, মনসা—দেববালা, নেতা—নীহারবালা এবং ইন্দুবালা। এই ছবিতে ইন্দুবালা একটিমাত্র গানই গেয়েছিলেন। তবু পত্রপত্রিকায় তাঁর পক্ষে-বিপক্ষে লেখা হল। 'খেয়ালী' লিখলেন, শ্রীমতী ইন্দুবালার একখানা গান আমাদের ভাল লাগেনি। সামান্য একখানা গান যিনি গেয়েছেন, বিজ্ঞাপনে তাঁকে এত প্রচার করবার কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য কী তা বুঝতে পারলুম না, (৮ই চৈত্র ১৩৪০ বৃহস্পতিবার)।

অন্যদিকে 'সোনার বাংলা' এই ছবির আলোচনা শেষে জানালেন, ইন্দুবালার পালাগান সত্যিই আসর জমানো বটে। ছবির সমস্ত গানগুলি রচনা ও সুরনৈপুণ্য সবাইকে মুগ্ধ করেছে। (১০ই চৈত্র ১৩৪০ শনিবার)।

সুতরাং এ থেকে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে আসা খুবই কষ্টসাধ্য। তবে ইন্দুবালার গানের সমাদর ছিল জেনেই অনেক পরিচালক যে তাঁকে রাখতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক।

এই সময় আগের বছরে তোলা ডি. জি'র হাসির ছবিটি মার্চের শেষে মুক্তি পায়। এ বছর (১৯৩৪) শেষ দিকেও আর একটি ইন্দুবালা অভিনীত ছবি 'শুভ ত্র্যহস্পর্শ' মুক্তি (২৯শে ডিসেম্বর) ঘটে।

* বাংলা, শুক্রবার ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০ সাল।

'শুভ ত্র্যহস্পর্শ' চল্লিশ মিনিটের ছোট্ট একটি ছবি। অখিল নিয়োগীর গল্প থেকে নাট্যকার মন্মথ রায় এই ছবির চিত্রনাট্য ও পরিচালনার মাধ্যমেই প্রথম চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে যুক্ত হন। ২৯শে ডিসেম্বর 'ছায়া' চিত্রগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবির চরিত্রলিপি নিম্নরূপ :

কর্তা—চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, গিন্নী—ইন্দুবালা,

ওড়িয়া ভৃত্য—আশু বসু, প্রেমিক—অমর গঙ্গোপাধ্যায়

মন্মথ রায়ের এই হাসির ছবিটির মাধ্যমে প্রথম চিত্র পরিচালনার হাতে-খড়ি হলেও মোটা দাগের হাসির উপাদানে ভরা এই ছবিটির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কর্তা ও গিন্নী এবং তাদের তেরোটি সন্তানের অভিনয়। যুক্তিবিহীন কেবলমাত্র হাসির ছবি হিসেবেই এটি কোন কোন মহলকে তৃপ্ত দিয়েছিল বলে জানা যায়। তবে এর অভিনয়-সম্পদের কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ ইন্দুবালার গিন্নী চরিত্রটি অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল। এ ছাড়া আশু বসুর ভৃত্য চরিত্রটিও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে।

১৯৩৫ খ্রীঃ মুক্তি পেল নবপ্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল টকিজের প্রথম হিন্দী ছবি **One Fatal Night**। ইতিপূর্বে এর পরিচালক মধু বসু উর্দু ছবি 'সেলিমা' পরিচালনা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মসের প্রসিদ্ধ উর্দু ছবি 'সেলিমা' প্রথমে ঢাকার পিকচার হাউসে মুক্তি পায় (২১শে ভাদ্র ১৩৪২)। এর গল্প ও পরিচালনার গুণে ছবিটি মধু বসুর শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। জাঁকজমকপূর্ণ ছবি সেলিমার অভিনয়াংশে ছিলেন মাধবী, নীহারবালা, গুল হামিদ, মজাহার খাঁ ও ইন্দুবালা। 'সেলিমা'তে ইন্দুবালার গান ও অভিনয় অনেক দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই ছবির জন্যে পরিচালক মধু বসু ফৈজাবাদ থেকে শ্রীমতী ভাগীরথীকে নিয়ে এসে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করান। 'সেলিমা' কলকাতার প্যারাডাইস সিনেমায় ১৯৩৬ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর মুক্তি পায়। ঐদিন **Amrit Bazar Patrika**-য় খবর বেরোয়—**To day we will mark the release of East India's long awaited spectacular talkie "SELIMA" directed by Modhu Bose. A highly romantic story well blended with dance and**

music, "SELIMA" has all the elements of popular appeal. The last represents well known screen celebrities including Madhabi, Athar, Radhabai, Gul Hamid, Matahar & Indubala.

বেঙ্গল টকীজের 'ওয়ান ফেটাল নাইট' ছবিতেও মধু বসুর সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে। এই ছবিতে ইন্দুবালা বিজলীর চরিত্রে অভিনয় করেন। হিন্দী ভাষায় তোলা One Fatal Night ছবিতে ইন্দুবালা ছাড়া আর যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নায়িকা বৃন্দার ভূমিকায় সুন্দরী তন্বী অভিনেত্রী জারিনা খাতুন, প্রেমিক নায়কের ভূমিকায় মিঃ সিকান্দর, কূট ললিতকুমারের চরিত্রে আর. পি. কাপুর, লক্ষ্মীদাস—মণিলাল, বসন্ত কুমার—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, মণিলাল, গামা, আজমত বিবি ইত্যাদি। ইন্দুবালা বিজলীর চরিত্রে এই ছবিতে অসাধারণ অভিনয় প্রদর্শন করেছিলেন। এই ছবির ফটোগ্রাফীতে ছিলেন শ্রীগীতা ঘোষ ও মণি সান্যাল, শব্দ সংযোজনায় ছিলেন সুপরিচিত মিঃ এ. গফুর। ভয়ঙ্কর বা বীভৎস রসের ছবি হলেও সেকালে এই ছবিটি দর্শকদের কাছে কেবলমাত্র এর পরিবেশনার গুণে এবং অভিনয়ের চাতুর্যে যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চার করেছিল।

'সেলিমা' ছবির কাজ পরিচালক মধু বসু যখন সুরু করেন, তার মাত্র কিছুদিন আগে রাঁচীতে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছিল (২৭শে এপ্রিল ১৯৩৬)। পরবর্তীকালে এই ছবির প্রসঙ্গে মধু বসু আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন—কলকাতায় ফিরে 'সেলিমার' শুটিং-এর বন্দোবস্ত করলাম। বিভিন্ন ভূমিকায় যাদের নির্বাচন করলাম, তখনকার দিনে তাদের মধ্যে দুজনের নামডাক যথেষ্ট ছিল। একজনের নাম হলো মজহর খাঁ—সে অনেক ছবিতে এর আগে নেমে রূপদক্ষ অভিনেতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল এবং পরে বোম্বাইয়ে প্রযোজক হিসেবেও প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিল। অপরজনের নাম হলো গুল হামিদ। গুল হামিদ জাতিতে পাঠান। এমন সুদর্শন চেহারা আমি চিত্রজগতে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি—যেমন লম্বা তেমনি দেহের গঠন

…the sound were not gold except the songs of Gama & Indubala—Forward Monday, March 23, 1936 (One Fatal Night).

আর তেমনি মুখশ্রী। এরা ছাড়া আর যারা এই ছবিতে অংশ নিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল সুগায়িকা ইন্দুবালা, নীহারবালা, আখার আলি, রাধাবাঈ, নাজির প্রভৃতি।

নায়িকার জন্য কিছুদিন থেকেই সন্ধান করা হচ্ছিল, একথা আগেই বলেছি। অনেক সন্ধানের পর শেষে ফৈজাবাদ থেকে একটি মেয়েকে ঠিক করা হলো। তার চেহারাটি সুশ্রী, আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি তখনও। নায়িকার চরিত্রটি হচ্ছে একটি গ্রাম্য মেয়ের। সুতরাং চেহারাটি চরিত্রের সঙ্গে ভালই মিলে গেল। আমি তাকেই নায়িকার জন্য নির্বাচন করলাম। তার নামকরণ করলাম মাধবী।...[আমার জীবন—মধু বসু। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৭ পৃঃ ১৯৬-১৯৭]।

'সেলিমা'র একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছিল আজকের দিনের এক বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক। এই ভূমিকাটি ছিল এক ভিখারীর। এই সঙ্গীত পরিচালক তখন গাইয়ে হিসেবে সবে নাম করেছে এবং সাধনাকে গান শেখাত। তাকে একদিন কথায় কথায় বললাম: একটি ছোট ভিখারীর ভূমিকা আছে, কাজ বিশেষ কিছুই নেই—শুধু বসে থেকে একটি গান গাইতে হবে, আর কিছু নয়।

শুনে প্রথমে সে চমকে উঠল, বলল: 'বলেন কি মিঃ বোস? আমি ফিল্মে নামব কি? জানেন' তো আমার পরিবারকে। আমি যদি ফিল্মে নামি তাহলে তারা নির্ঘাত আমায় একঘরে করবেন। আমি গান করি, রেকর্ড করি, তাতেই কত লোক কত কথা বলে।'

আমি বললাম: 'তোমায় এমন করে মেক-আপ করে দেব দাড়িগোঁপ লাগিয়ে যে, কেউ চিনতেই পারবে না। তারপর অনেক করে বোঝানোতে শেষটায় সে রাজী হলো। গানটি সে খুবই ভাল গেয়েছিল। এই ব্যক্তিটি হলো আজকের বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক কুমার শচীনদেব বর্মন। (পৃঃ১৯৮)।

...সবাক চিত্রজগতে আমার এই প্রথম পদার্পণ এবং বলতে বাধা নেই, 'সেলিমা' দিল্লী ও পাঞ্জাবে, বিশেষ করে পাঞ্জাবের জনসাধারণ কর্তৃক বিপুল ভাবে অভিনন্দিত হয়। পাঞ্জাবে তো রীতিমত box-office hit ও অন্যান্য স্থানের জনগণ এবং সমালোচকদেরও খুশী করতে পেরেছিল। (ঐ পৃঃ ২০০)।

১৯৩৫ সালে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে মধু বসু ও অন্যান্যরা 'বেঙ্গল টকীজ' প্রতিষ্ঠা করলেন। এই ফিল্ম কোম্পানীর ডিরেক্টর মধু বসু স্বয়ং। মঞ্চে সাফল্যমণ্ডিত নাটক 'আলিবাবা'র চলচ্চিত্রায়নের কথা প্রথমে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত পরিচালক মধু বসুকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদে'র একটা গল্পের প্লটকে ডেভেলাপ করে দাঁড় করাতে হল আজাদ সাহেবকে দিয়ে। মধু বসু এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর গল্পই মনোনীত হলো। অবশ্য এজন্য দক্ষিণাও ভালই দিয়েছিলাম তাঁকে। ছবির নাম হলো One Fatal Night বা 'বলা-কি-রাত'। ছবিখানা হয়েছিল উর্দুতে।

এই ছবির বিষয়ে যত কম বলি ততই ভাল। মনে হয়, কি অশুভক্ষণেই এই ছবিটির কাজে হাত দিয়েছিলাম। আমার জীবনের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা এই ছবিটা—এর শোচনীয় ব্যর্থতার কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় যে, অন্যান্য অংশীদারদের পরামর্শ নিলেই ভাল হতো, এতগুলো টাকা এভাবে জলে যেত না।

"One Fatal Night"—'বলা-কি-রাত' চিত্রটি এরকম শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবার পর ফিল্মের ওপর আমার কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেল। আমি তখন আবার মঞ্চের দিকে নজর দিলাম (ঐ পৃঃ ২০২)।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছবিটি সেকালে সাফল্যের স্বাদ থেকে মোটেই বঞ্চিত হয়নি। বিশেষ করে প্রথম ছবি 'সেলিমা'র আশ্চর্য সাফল্যের তুলনায় One Fatal Nightএর তুলনা করতে গিয়ে মধু বসু হয়ত কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন। তাছাড়া অন্যান্য অংশীদারদের সকলেরই ইচ্ছে ছিল, ওই গল্পের বদলে প্রথমে 'আলিবাবা' নিয়ে ছবি করা।

অন্যদিকে মধু বসুর ONE FATAL NIGHT সম্পর্কে Amrita Bazar Patrika (Tuesday, March 24, 1936) লিখেছিলেন :

ONE FATAL NIGHT

A Successful Production of Bengal Talkies

"One Fatal Night" or 'Bala-Ki-Rat' a special preview of which

was held on Saturday morning, and is now running at the Paradise, is a production of Bengal Talkies.

The story opens with Lakshmidas being discoverd bending suspiciously over the dead body of Kailash by Pratap (deceased's son) and Brinda (Lakshmidas's daughter). Pratap suspects him as his father's murderer and phones to the police, but on Brinda's pleadings, whom he loves, he connives at his escape, Lalit Kumar was at first suspected by the police but he cleverly manages to divert this suspicion from himself to Lakshmidas, who has absconded. Furthermore, he wins over Brinda's mother to his own side and causes a deep misunderstanding between Brinda and Pratap with a view to ruin Brinda. He ultimately manages to secure Lakshmidas's property to himself. Pratap's servant Durbal and Brinda's maid servant Bijli try their best to dissipiate the misunderstanding between Pratap and Brinda but fails. Lalit with the help of Dulari a fashionable woman of the town tries to widen the breach between them. He cleverly manages to abduct Brinda and to lock her up in a room of a Restaurant. She is ultimately rescued by Daleep but they are chased by Lalit. The story ends with the death of Lalit and Daleep, the discovery of the real culprit, the marriage of Pratap and Brinda, and the return at home of Lakshmidas.

It is an enjoyable show in which all the parts have been well acted, and it is free from the usual defect of the Hindusthani Films in which the actors shout at each other. The acting is very realistic and the tone quite natural. Miss Zarina Khatoon appears in the main role and throughout conducts herself admirably. Indubala plays the role of Bijli and Lilabati Dulari successfully. Kapoor impersonates the modern upto date Crook to a nicety. Dhiraj Bhattacharya represents Daleep and his acting is splendidly realistic just when the real culprit is discovered. The music is

excellent especially the songs of Bijli and Dulari. On the whole, the show is good and does credit to the maiden production of the Bengal Talkies.

Maulana Abul Kalam Azad who is such a well-known personality in India edited the dialogues of the story which was written specially for Bengal Talkies by a learned Pandit.

'ওয়ান ফেটাল নাইট' সম্পর্কে শেষ ছত্রে লেখা এই মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পণ্ডিত এবং মহান রাজনীতিবিদের সম্পাদিত এই গল্পের ডায়ালগ নিঃসন্দেহে এই ছবিটির মর্যাদা যথেষ্ঠ পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল বলা যায়। এইদিক থেকে ইন্দুবালা অভিনীত ছবিটি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক।

এছাড়া এই ছবি সম্পর্কে এবং বিশেষ করে ইন্দুবালার অভিনয় এবং গানের প্রশংসা করে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয় সুভাষ বসু সম্পাদিত সেকালের Forward পত্রিকায় (Monday, March 23, 1936) এবং ইংরেজী DIPALI (Friday, March 27, 1936) ও 'VARIETIES' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় (Vol VI. No. 22 March 27, 1936)। ADVANCE পত্রিকা দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে এক জায়গায় লিখেছিলেন, The duet songs of Indubala in the part of maid-servant Bijli of the heroine and of Master Gama impersonating the servant of the hero are simply charming. (Thursday, March 26, 1936).

পরবর্তী পর্যায়ে ইন্দুবালা অভিনীত ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, উর্দুতে তোলা সুলতানা (Sultana Daku), নাইট বার্ড (হিন্দী), বিদ্রোহী (বাংলা) ও বিদ্রোহী (হিন্দী), মিষ্টার ডব্লু (Mr. W) উর্দু এবং হিন্দী ছবি 'মার্ডারার' ও 'স্টেপ মাদার'। এছাড়া এ সময় আরও দুটি উর্দু ছবি

এছাড়া 'দুন্দুভি', 'কেশরী' ও 'বাঙালী' পত্রিকার এই ছবি প্রসঙ্গে ইন্দুবালার অভিনয় ও গান উচ্চ প্রশংসিত হয়।

'দেশ' পত্রিকার মতে, সঙ্গীত এই ছবির প্রধান আকর্ষণ। গামা এবং ইন্দুবালা তাঁহাদের সুমধুর কণ্ঠস্বরে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন। (শনিবার, ১৫ই চৈত্র ১৩৪২)।

'খাইবার পাস' (Khaibar Pass) ও 'বাগী সিপাহী' এবং হিন্দী ছবি 'কুমারী বিধবা'-তেও ইন্দুবালা অভিনয় করেন। এই পর্বেই ইন্দুবালা অভিনীত অন্যান্য ছবির নাম ডাকু-কা-ল্যাড়কা (উর্দু), আঁখ কা তারা (হিন্দী), রি জেনারেশন (হিন্দী), উর্দু ছবি 'নুরী' ও 'আহ-ই-মাজলুমান' ও 'ফোর টুয়েন্টি' (হিন্দী)। উপরন্তু কলকাতায় তোলা বাংলা ছবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' ও 'স্বয়ংসিদ্ধা' (হিন্দি), 'সমাজ' (হিন্দী), 'স্বস্তিক' (বাংলা) ছবিতেও ইন্দুবালা উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

উর্দু ছবি 'সুলতানা' (পরিচালনা এ. আর. কারদার) ছবিটি পরিবেশন করেছিলেন বি. এল. খেমকা। ইন্দুবালা এই ছবিতে বেদুইন রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ইন্দুবালার পরিবারের দীর্ঘকালের পরিচিত হিতৈষী খেমকার এই ছবির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, গুল হামিদ, মজহার, জারিনা ও পহেলওয়ান। R. C. A. শব্দযন্ত্রে গৃহীত এই ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন শৈলেন বোস।

হিন্দী ডিটেকটিভ চিত্র 'নাইট বার্ড' (পরিচালনা—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) ছবিতে বারের (Bar) মেয়ের একটি চরিত্রে ইন্দুবালা অসাধারণ সাফল্য প্রদর্শন করেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরবর্তী ছবি হিন্দী ও বাংলায় তোলা ডবল ভার্সানের চিত্র 'বিদ্রোহী'। দুটি ভার্সানেই ইন্দুবালা অভিনয় করেছেন। 'বিদ্রোহী' চারু ঘোষের গল্পাবলম্বনে নির্মিত। ইন্দুবালাকে ডি. জি. এই ছবিতে 'নাগরিক পত্নীর' ভূমিকায় সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাগরিক চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দুবালার যোগাযোগ তথা হাস্যরসের অংশবিশেষ অসাধারণ উপভোগ্য হয়েছিল। ইন্দুবালাও এই চরিত্রে চরিত্রোচিত অভিনয় করেছিলেন এবং গানগুলিও চমৎকার ভাবে তাঁর কণ্ঠে উতরে গিয়েছিল।

'বিদ্রোহী'র বাংলা ভার্সানে অভিনয় করেছিলেন ভূমেন রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ডলি দত্ত, জ্যোৎস্না গুপ্তা, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ দাস ও ইন্দুবালা। বি. এল. খেমকা প্রযোজিত এই ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন প্রবোধ দাস এবং শব্দযন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন সি. নিগম। এই ছবির হিন্দী ভার্সানে ইন্দুবালা ছাড়াও ভূমিকালিপিতে

ছিলেন বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় নটী সুলতানা, সুদর্শন নট গুল হামিদ, মজহার খাঁ। নবীন গল্পকার হলেও চারু ঘোষের গল্পাবলম্বনে ছবি দুটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'বিদ্রোহী' মূলতঃ কমিক ছবি। ডি. জি.'র প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি হিসেবেও এর গুরুত্ব ছিল অনেকখানি। ইন্দুবালাও ভিন্ন চরিত্রে দুটি ভার্সানেই যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শনে সমর্থ হন। এর সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে ও হিমাংশু দত্ত।

'মিঃ ডব্লু' (Mr. "W") নামে এই সময় একটি হাসির ছবি তুলেছিলেন শ্রীযতীন দাস। শ্রীযতীন দাস আলোক চিত্রশিল্পী হিসেবেই পরিচিত। ইন্দুবালার মা রাজবালাকে নিয়ে তিনি একদা 'রাতকানা' নামের ছবিটি তুলেছিলেন। যতীন দাসের এই উর্দু ছবি 'মিঃ ডব্লু'-তেও ইন্দুবালা একটি কমিক চরিত্রে অভিনয় করেন।

এই পর্যায়ের ছবি হিন্দীতে 'মার্ডারার' (পরিচালনা—জি. আর. সেট্টি, G. R. Setti) ও 'স্টেপ মাদার' (পরিচালনা—সোরাবজী কেরাওয়ালা, Sorabji Kerawalla) ছবিতেও ইন্দুবালার অভিনয় স্মরণযোগ্য। 'স্টেপ মাদার' ছবিতে ইন্দুবালা বাঈজীর মা 'নাঈকা বাঈ'-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং ইন্দুবালার সঙ্গীত গুরু পণ্ডিত গৌরীশংকর মিশ্র স্বয়ং এই ছবিতে সারেঙ্গী বাদকের চরিত্রে অবতীর্ণ হন। ইন্দুবালার সঙ্গে একই দৃশ্যে তাঁর গুরু গৌরীশংকরজীকে এর আগে বা পরে কোন ছবিতে দেখা যায়নি। 'মার্ডারার' নামক হিন্দী ছবিটির পরিচালক সেট্টি এটিকে ক্রাইম ছবি করতে চেয়েছিলেন এবং সেই কাজে তিনি আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখেননি। ইন্দুবালা এই ছবিতে 'লখিয়া' চরিত্রে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর কণ্ঠে 'সো যা আই প্যারে' গানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।*

পরবর্তী ছবি 'খাইবার পাস' (Khyber Pass) উর্দুতে তোলা সেকালের অন্যতম সেরা ছবি হিসেবে পরিচিত। এই ছবিতেও ইন্দুবালা মরিনার চরিত্রে অত্যন্ত সাফল্যলাভ করেন। ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ শনিবার প্যারাডাইস সিনেমায় এই ছবির মুক্তি উপলক্ষে The Amrita Bazar Patrika জানিয়েছিলেন :

* রেকর্ড হিসেবেও গানটি খুব চলেছিল (Record No. N6847)।

The Paradise to-day presents East India Films ambitious production, 'Khyber Pass'. It is a romantic story of the fighting Frontier, keyed to heartpounding excitement and we are told, has been well presented on the screen by a galaxy of noted screen artistes including. Gul Hamid, Mazhar Khan, Pahelwan, Patience Cooper, Lalita Devi, Purnima and Indubala. Rustic revelry, typical dances of the Frontier amidst a panorama of duzzling splendour, with touches of occasional thrills, humour, pathos and suspense are some of the outstanding features of this fast-moving melo-drama. This picture is presented on the eve of the great Bakri-Idd.

কলকাতায় তোলা এই ছবির নায়ক গুল হামিদ জাতিতে আফগান (পাঠান) ছিলেন। ফলে দুর্দান্ত পাঠান জাতির প্রেম ও প্রতিহিংসার বিশ্বাসযোগ্য রূপায়ণ ঘটেছে 'খাইবার পাস'এ। এই ছবির নায়ক, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার বোম্বাইয়ের এই সুদর্শন তারকা গুল হামিদের প্রশংসায় সেকালের সমস্ত পত্রপত্রিকা প্রশংসামুখর হয়েছিল। সকলের মতেই 'খাইবার পাস' ছিল সর্বাঙ্গসুন্দর একটি ছবি। মরিনার চরিত্রে ইন্দুবালার অভিনয় ও গান সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছিল।

পরের ছবিও উর্দুতে তোলা 'বাগী সিপাহী'। এ. আর. কারদার পরিচালিত এই উর্দু ছবিতে ইন্দুবালা হাসনা'র চরিত্রে রূপদান করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং পরিবেশিত এই ছবির ভূমিকালিপিতে ছিলেন, গুল হামিদ, ললিতা দেবী, প্যাসেন্স ক্যুপার, মজহার খান, বিমলা, পাহলেওয়ান, এ্যানিস্, হাসান দীন, ইশাক্, কামরান, শ্রীমতী আজুরী (AZURIE) ও সিকান্দার।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৬ খ্রী: এই ছবি সম্পর্কে DIPALI, Friday, October 16, 1936 সংখ্যা থেকে জানা যায়:

"Baghi Sipahi" is a story of a soldier who rebelled against his chief. The story, though lacking in dramatic intensity and climax, has been narrated quite intelligibly on the screen, with enough mass appeal in it.

The songs are well-tuned to popular notes and very well sung. Settings are magnificent and costly and artistically laid up in every minute detail. The locations are also very well-chosen. Such costly sets are hardly seen in Indian pictures. The palm is taken by Md. Ishaq by his superb and restrained acting. Gul Hamid, Mazhar Khan, Sikandar, Hasan Din and others have all rendered good accounts or themselves. Patience Cooper easily scores over the female artistes. Lalita Debi, Bimala Kumari, Indu Bala and others have acted well. Indu Bala's songs are charming. The dialogues which are unusally long are in pure Urdu.

The photography is excellent and is as good as the best that may be found in foreign films. My hat off to Sailen Bose. The recording is also very good and there can be nothing more to be desired.

'বাগী সিপাহী' ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তে পূর্বের ছবি 'খাইবার পাস'এর মতই জনপ্রিয়তার সঙ্গে দীর্ঘকাল চলেছিল। এমন কি দক্ষিণ ভারতের দর্শকগণও এই ছবিকে ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার অর্থাৎ মাদ্রাজ বা বাঙ্গালোরের তামিল, তেলেগু, বা মাদ্রাজী ভাষার পত্রপত্রিকায় বাগী সিপাহী সম্পর্কে অজস্র প্রশংসাসূচক আলোচনা ও সংবাদও প্রকাশিত হয়। ইন্দুবালার গান ও অভিনয় সম্পর্কে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশংসাসূচক মন্তব্য এই সব আলোচনায় লক্ষ্য করা গেছে। ইন্দুবালা অভিনীত জনপ্রিয় উর্দু ছবিগুলির মধ্যে এটিকে অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হাসান দীনের সঙ্গে এই ছবিতে ইন্দুবালার হাসনা'র চরিত্রে অভিনয় সেকালে সত্যিই যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল।

এই সময় ইন্দুবালা অভিনীত 'কুমারী বিধবা' বা '**Kunwari or Widhawa**' নামে একটি হিন্দী ছবি মুক্তি পায়।

এই ছবিতে ইন্দুবালা 'রাধা' নামক একটি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেন। ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের হয়ে এটিই ছিল ইন্দুবালার দ্বিতীয় ছবি। ইতিপূর্বে এই ভারতলক্ষ্মীর 'শুভ ত্র্যহস্পর্শ' নামে একটি হাসির ছবিতে তিনি প্রথম

অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'কুমারী বিধবা' ছবিটির পরিচালনায় ছিলেন মিঃ পি. সুদর্শন।

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের হয়ে ইন্দুবালা আরও দুটি ছবি করেছিলেন। একটি উর্দু 'ডাকু-কা-ল্যাড়কা', অন্যটি পাঞ্জাবী ভাষায় তোলা 'ঢোলক-কী-ঢোলকী'।

'ডাকু-কা-ল্যাড়কা' ছবির বিজ্ঞাপনে (মুক্তি ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৫) লেখা হয়েছিল, **'A picture with a wide variety of interest. It has many attractive scenes. The cast includes Indubala, Raziuddin, Abdul Ratim, Bilaitoo Hossain, Gama and Meera Dutt.**

এই ছবিতে (পরিচালনা—চারু রায়) ইন্দুবালা 'সুরানী' নামে একটি ভয়ঙ্কর চরিত্রে রূপদান করেন। এই ছবির অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন মিস মীরা দত্ত, মিস পান্না, মিস কমলা, বিজয় শংকলা ইত্যাদি। ছবি হিসাবে এই ছবিটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে 'স্বদেশ' পত্রিকা লিখেছিলেন, পরিচালনায় চারু রায় খুব নাম কিনতে পারবেন না, তাহলেও তার কাজ তেমন খারাপ হয়নি। নায়কের জন্য যে অভিনেতা মনোনীত হয়েছেন তার চেহারা অতি বিশ্রী। এর অভিনয়ও তথৈবচ। নায়িকার অংশে মীরা দত্ত মন্দ নন। তাঁর পিতার ভূমিকাভিনেতা সব চেয়ে সুঅভিনয় করেছেন। ইন্দুবালাও তাঁর জুরী গানে আমাদের সব চেয়ে আনন্দ দিয়েছেন। আর কারো অভিনয়ই তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

আলোক চিত্র তুলেছেন পঞ্চানন চৌধুরী। আলোর কাজ অবশ্য মন্দ নয়। শব্দযোজনা করেছেন মিঃ গফুর, একটু মেটালিক ধ্বনি স্বরে শোনা গেছে, নচেৎ তাঁর কাজ প্রশংসনীয় হয়েছে। এ ছবির বিষয়ে আর কিছু বক্তব্য নেই। (স্বদেশ, শুক্রবার ২৫শে পৌষ ১৩৪২)।

পাঞ্জাবী ছবি 'ঢোলক-কী-ঢোলকী'-তে ইন্দুবালা 'যোগিনী' চরিত্রে রূপদান করেছিলেন। এটিও ভারতলক্ষ্মীর ছবি এবং এটি পরিচালনা করে ছিলেন মিঃ আর. ডি. আজাদ।

ম্যাডান থিয়েটারের মোট দুটি হিন্দী ছবিতে ইন্দুবালা অভিনয়

করেছিলেন। প্রথম ছবি 'আঁখ কা তারা'য় 'মালিনী' চরিত্রে। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিটিই ইন্দুবালা অভিনীত প্রথম হিন্দী চিত্র। 'যমুনা পুলিনে' ছবিটি করবার সময়ই তিনি এই ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন। এই ছবি সম্পর্কে ইন্দুবালা লিখেছিলেন, 'আমার প্রথম হিন্দী ছবি কিন্তু 'আঁখ কা তারা'। 'যমুনা পুলিনে' কাজ করতে করতেই ঐ ছবি খানায় সুযোগ পেয়ে গেলাম। আর আশ্চর্যের বিষয়, ছবিটা তুলেছিলেন ম্যাডান থিয়েটার্স, আর পরিচালক ছিলেন স্বয়ং জ্যোতিষবাবু। 'যমুনা পুলিনে' অভিনয়ের ফাঁকে প্রিয়বাবু একদিন পাশেই ম্যাডান স্টুডিওতে ধরে নিয়ে গেলেন আমায়। গিয়ে দেখি জ্যোতিষবাবু বসে আছেন। 'আঁখ কা তারা' স্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত। প্রিয়বাবু আমায় দিয়ে ঐ বইয়ে গান গাওয়াবার পরামর্শ দিলেন। যে চরিত্রে আমায় অভিনয় করতে হবে সেটা খুবই ছোট। শুধু গানটুকুই যা আকর্ষণ। জ্যোতিষবাবু এবার কেন জানি না, রাজী হয়ে গেলেন। 'যমুনা পুলিনে' আমার জীবনের হাতেখড়ি হয়ে থাকলেও, দর্শকদের কাছে আগে মুক্তি পেয়েছিল 'আঁখ কা তারা'।' (অতীত দিনের স্মৃতি—ইন্দুবালা)

'ম্যাডান'-এ ইন্দুবালার দ্বিতীয় এবং শেষ ছবি হিন্দীতে তোলা 'রি জেনারেশন'। এই ছবিতে তিনি 'লক্ষ্মী'র চরিত্রে রূপদান করেন। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন ম্যাডানের মিঃ এজরা মীর।

লক্ষ্মৌ পিকচার্সের হয়ে এরপর ইন্দুবালা যে উর্দু ছবিখানিতে একখানি উদ্বোধনী গানের দৃশ্যে অভিনয় ও সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন, তার নাম 'নুরী'। এই ছবিতে তাঁর গান ভিন্ন অন্য কোন ভূমিকা ছিল না।

পরবর্তী ছবি New Tone Film Production নিবেদিত উর্দু কাহিনীচিত্র 'আহ-ই-মাজলুমান' (Ah-E-Mazluman)। ১৯৩৫ খ্রী: ১৭ই সেপ্টেম্বর নিউ সিনেমায় মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি সেকালে দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। N. G. Bulchandani পরিচালিত এই উর্দু ছবিতে ইন্দুবালা 'রহিমন'এর চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ছবিটির অভিনয়াংশে ছিলেন আজমৎ বিবি, আবদুল্লা কাবুলী, রাজেশ্বরী, দামোদর এবং ইন্দুবালা। এই ছবিটি সম্পর্কে ইংরেজী DIPALI পত্রিকা জানিয়েছিলেন :

The picture portrays the woe and hardship which befell a devoted wife on account of the sudden profligacy of a previously virtuous husband. The later died a miserable death, and the wife finding no other means to support her daughter and son married a demonish old husband. The union as was to be expected, was not a happy one and both the young son and daughter expired under tragic circumstances before the very eyes of the unfortunate mother, whose wailings only came to an when mother earth took her into her tender bosom to soothe her burning heartache.

The theme is very tragic with little relief in its treatment. It is also wanting in conviction as the author has preferred to portray his characters in only two extreme colours—good and bad. Thus the essential human touch goes to make for the success of any play, is lacking. Long dialouges and slow action also make the film a little bit stagey.

The characterizations are only ordinary. Abdullah Kabuli makes a passable kamar. Rajeshwari acts well as a siren, but is a hopeless failure as a songtrees. Azmat Bibi, in the role of Ezra, plays more consistently, and in the role of her maid-servant, Rahiman, Indu Bala sings superbly ...

(DIPALI, 20th. Sept. 1935) ।

পরবর্তী পর্যায়ে ইন্দুবালা 'ফোর টুয়েন্টি' নামে একটি হিন্দী ছবি, উর্দু 'লক্ষ্ণৌ কী মুশায়েরা', হিন্দী 'জলজলা', বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা', বাংলা ও হিন্দীতে তোলা ডবল ভার্সান ছবি 'স্বয়ং সিদ্ধা', বাংলা ছবি 'স্বস্তিক' ও হিন্দী 'সমাজ' নামে আরও সাতটি ছবিতে অভিনয় করেন।

'ফোর টুয়েন্টি' ও 'জলজলা' এই দুটি হিন্দী ছবি Star Film Co. পরিবেশিত এবং দুটি ছবিই পরিচালনা করেছিলেন সোরাবজী কেরাওয়ালা। ইতিপূর্বে ইন্দুবালা এই পরিচালকের নির্দেশনায় 'স্টেপ মাদার' নামে হিন্দী ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। 'ফোর টুয়েন্টি' ছবিতে সন্ন্যাসিনীর ভূমিকায় এবং 'জলজলা' ছবিতে ইন্দুবালা 'রাণী'র চরিত্রে রূপদান করেন।

'আদর্শ চিত্র' নিবেদিত উর্দু ছবি মুক্তির সময় 'লক্ষ্ণৌ কী মুশায়েরা' নামের বদলে পরিবর্তিত নাম 'মুশায়েরা কা সায়রা' নামে আত্মপ্রকাশ করে। উর্দু এই 'Mushairon Ka Shaira' চিত্রটি পরিচালনা করেন মিঃ এম. এল. ট্যাণ্ডন। ইন্দুবালা এই বহুল প্রচারিত ছবিতে 'লালার গিন্নী' চরিত্রে রূপদান করেছিলেন। জমজমাট হাসি-গানে ভরা এই ছবিটি বক্স অফিসের ব্যাপক আনুকূল্য লাভে সমর্থ হয়। এই ছবিতে ইন্দুবালা ছাড়া আর যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন, বিঠলদাস পান্‌চোটিয়া, এম. গামা, বিলায়টো, ডব্লু সিদ্দিকী, লতিফ বি. এ, মোহনলাল মিশ্র ও কানিজ।

এই সময় দেবদত্ত ফিল্মস (জি. পি. টকীজ) নিবেদিত বাংলা ছবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'তেও ইন্দুবালা স্ত্রীর (গিন্নী) ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তড়িৎ বসু পরিচালিত 'প্রেম ও বিরহ সুখ ও দুঃখের অমর আলেখ্য' নামে বিজ্ঞাপিত 'ইন্দিরা' ছবির অভিনয়াংশে ছিলেন ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, লক্ষ্মী সোম, পদ্মাবতী, হরিসুন্দরী, কুসুম কুমারী, ফণি রায়, ললিত মিত্র, বেচু সিং, জ্যোৎস্না গুপ্তা, বিনয়, অহীন্দ্র চৌধুরী ও শেফালিকা। 'ইন্দিরা'র ভূমিকায় ছিলেন জ্যোৎস্না গুপ্তা। (সূত্র : 'সাহানা' পত্রিকা ১৩ই ফেব্রু, শনিবার ১৯৩৭)।

আই. এন এ. পিকচার্সের ছবি (ডবল ভার্সান) বাংলা ও হিন্দীতে তোলা ছবি 'স্বয়ং সিদ্ধা'-তে ইন্দুবালা অভিনয় করে শেষদিকেও অভিনয় জীবনে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছিলেন। বাংলা ও হিন্দী দুটিতেই ইন্দুবালা 'ধাইমা'র চরিত্রে অবতীর্ণ হন। এর পরে আর কোন ছায়াচিত্রে তাঁকে অভিনয় করতে দেখা যায় নি। শান্তা আপ্তে (এস্. এ. কন্‌সার্ন) ও সমর রায় নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় এই ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া এই ছবিতে অভিনয়াংশে ছিলেন মলিনা দেবী, বিপিন গুপ্ত, গীতশ্রী, অমরনাথ, হীরালাল, বি. এস. কাপুর (এন্. টি.), শেখর রায় ও ইন্দুবালা। মধ্য চল্লিশে তোলা এটিই তাঁর শেষ ছবি। তারপর স্বেচ্ছায়

---

* রচনা—পণ্ডিত ব্যাসজী। মিঃ হীরালাল—কিশোর, মিঃ আর. এন. কাপুর—রামনারায়ণ, মিস ইন্দুবালা—মুন্নী, মিস্ পার্ব্বতী—চামেলী, দেববালা—চামেলীর মা। (সূত্র : আজকাল, শনিবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১)।

তিনি ছবির জগত থেকে সরে আসেন।

'স্বয়ং সিদ্ধা'র ঠিক আগে 'সমাজ'* নামে একটি হিন্দী চিত্রে (পরিচালনা প্রফুল্ল রায়) এবং 'স্বস্তিক' নামে একটি বাংলা ছবিতে তাঁকে অভিনয় করতে দেখা যায়। ভারতলক্ষ্মী নিবেদিত 'সমাজ' তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলা কাহিনীচিত্র 'স্বস্তিক' সেই তুলনায় কিছুটা আলোড়ন আনতে সক্ষম হয়েছিল। নরোত্তম দাসের কাহিনী অবলম্বনে তোলা এই বাংলা ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন, বাণী, ইন্দুবালা, জীবেন ইত্যাদি। ছবিটি প্রথম 'রূবী' চিত্রগৃহে মুক্তি পায়।

কলকাতায় বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও পাঞ্জাবী ছবিতে অভিনয়ের প্রশংসা ইন্দুবালাকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুপরিচিত করে তুলেছিল। এরই ফলস্বরূপ সুদূর বোম্বাই থেকেও ছবিতে অভিনয়ের জন্য ইন্দুবালার ডাক আসে। তাছাড়া বাংলা ছবির থেকে হিন্দী ও উর্দু ছবিতেই তিনি অপেক্ষাকৃত বেশী সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাই বোম্বাই-এর রণজিৎ মুভিটোন থেকে যখন ইন্দুবালা অভিনয়ের আমন্ত্রণ পেলেন, তখন সেখানে তিনি যোগ দিতে আর বিলম্ব করেন নি। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রণজিৎ মুভিটোনের সঙ্গে বারো হাজার টাকার একটি চুক্তি করে মাত্র চার মাসের জন্যে বোম্বাই গিয়েছিলেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে মুক্তি পেল ইন্দুবালার বোম্বেতে তোলা প্রথম হিন্দী ছবি 'ভোলা রাজা রিক্সাওয়ালা'। ১৪ই মে, ১৯৩৮ বোম্বের West End Cinema-তে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিতে একটি কমিক চরিত্রে অভিনয় করে তিনি অস্বাভাবিক সাফল্য অর্জন করলেন। এজরা মীর'এর পরিচালনায় ও জ্ঞান দত্তের সঙ্গীত পরিচালনায় এই ছবিতে ইন্দুবালার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন মনোহর, ইলা দেবী, চার্লি, ওয়াস্তি, ওয়াহিদী, দীক্ষিত, ঘোরী প্রভৃতি শিল্পীরা। এই ছবিতে ইন্দুবালার গানও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। এরই সুবাদে তিনি সেখানে আরও তিনটি ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। এগুলি সবই হিন্দীতে তোলা। যেমন, নদী কিনারে, হোলী, দিওয়ালী। রণজিৎ মুভিটোনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ 'নাদি কেনারে' বা নদী কিনারে (On the River) নামক ছবিতে অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে মাঃ কুমার, সিতারা, মিস সুনীতা, ইন্দুবালা, সুশীলা, ঘোরী ও রাম মরাঠে। এছাড়া এই

ছবির অন্যতম আকর্ষণ ছিল সিতারার অপূর্ব নৃত্যকৌশল।

'দেওয়ালী' ছবিটি ছিল মূলতঃ 'ন্যায় অন্যায়ের গভীর যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ'। ইন্দুবালা এই ছবিতে চাঁদকুমারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ছবির অন্যান্য শিল্পীরা ছিলেন শ্রীমতী মাধুরী, মতিলাল, ঈশ্বরলাল, কে. দাঁতে, দীক্ষিত, ইন্দুবালা, সুরেশ, কেশরী ও বসন্ত।

এই ছবিতে মতিলালের সঙ্গে ইন্দুবালার অভিনয় অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল। এই ছবির আলোচনায় 'যুগান্তর' লিখেছিলেন :

নিউ সিনেমা : "দেওয়ালী"

শ্রী রণজিৎ মুভিটোনের সামাজিক হিন্দী চিত্র 'দেওয়ালী' গত ৩০শে মে হইতে নিউ সিনেমায় দেখান হইতেছে।

পিতা ধন্না অসুস্থ, উপায়ান্তর না দেখিয়া কন্যা তুলসী কাজের সন্ধানে বাহির হয়। কিন্তু কাজকর্ম কিছুই যোগাড় করিতে না পারায় চুরি করিয়া বসে। ধন্না রুগ্ন শরীর লইয়াই যার টাকা তাকে ফেরৎ দিতে গিয়া পুলিশ কর্তৃক ধৃত ও কারাদণ্ডিত হয়। কৈলাস নামে এক নবীন ডাক্তার তুলসীকে নিজ গৃহে লইয়া আসে। এই ডাক্তারের ধারণা, মানুষের রক্ত যদি অশুদ্ধ হয়, তবেই সে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়, কিন্তু এই রক্তকে যদি শুদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহার মনের পাপপ্রবৃত্তি বিদূরিত হইবে। এই গবেষণায়ই ডাক্তার আত্মনিয়োগ করিয়াছে। রেখা কৈলাসের ভাবী পত্নী তুলসীকে লইয়া উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। কৈলাসের ছোট ভাই সুধীরের সঙ্গিনী হয় তুলসী। ভাল ছেলের সংস্পর্শে থাকিলে তার চরিত্রের সংশোধন হইবে, কিন্তু পুনরায় তুলসী চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়। শেষে দেখা যায়, সুধীরকে বাঁচাইতে গিয়া নিজের ঘাড়ে দোষ লইয়াছে। কিন্তু সুধীরের স্বীকারোক্তির ফলে তুলসীর ত্যাগ-মহিমা প্রকাশ পায়। রেখা পর্যন্ত তাহার এই মহত্ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হয়। শেষে তাহাদের মিলন হয়।...

কৈলাসের ভূমিকায় মতিলাল সুঅভিনয় করিয়াছেন। ঈশ্বরলালের রঙ্গীলালও যথাযোগ্য। সুরেশের ('বন্ধন' খ্যাত) সুধীর সুন্দর, কেশব দাঁতের ধন্না ও দীক্ষিতের পহুমূলও প্রশংসনীয়। মাধুরীর রেখা সুঅভিনীত।

খ্যাতনামা গায়িকা ইন্দুবালার চাঁদকুমারী উপভোগ্য হইয়াছে। তাঁহার গান গুলিও শ্রুতিমধুর। [যুগান্তর, রবিবার ১২ই ভাদ্র ১৩৪৪]।

'দেওয়ালী'র সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন খেমচাঁদ প্রকাশ, শব্দগ্রহণ—সি. কে. ত্রিবেদী, আলোকচিত্র—জি. জি. গোগ্‌টে। পরিচালনা করেছিলেন জয়ন্ত দেশাই।

কলকাতার দর্শক সমাজের কাছে বোম্বের মতই ছবিটি সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তুলনামূলক ভাবে 'হোলী' ছবিটি অবশ্য বোম্বাইতেই অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বোম্বাইতে চারমাসের চুক্তিতে (মাসিক ৩০০০৲ টাকা) মোট বারো হাজার টাকার চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর মাদ্রাজের United Artists Corporation নিবেদিত 'নবীন সাথারাম' (Noveena Satharam) ছবির আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ইন্দুবালা মাদ্রাজে চলে আসেন। বলা বাহুল্য বোম্বাইতে ইন্দুবালার অভিনীত ছবির সাফল্যের সংবাদে মাদ্রাজের চলচ্চিত্র মহল তাঁকে ছবিতে নেবার ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিলেন।

United Artists Corporation-এর পক্ষ থেকে কলকাতার East India Film Co.-কে পরিবেশনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এতে অভিনয় করেছিলেন এস. ডি. শুভলক্ষ্মী, আর. শঙ্করালিঙ্গম, জলি কিট্টু আয়ার, এস. এস. মনি বগাভাথর, জি. পট্টু আয়ার, ইন্দুবালা ও কে. কে. পার্বতী বাঈ। ইন্দুবালা সাথারামের মায়ের চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এই সংস্থার হয়ে ইন্দুবালা এই সময় মাদ্রাজে একটি ডবল ভার্সান ছবিতেও অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধা হন। তামিল ভাষায় তোলা 'ইন্দ্র-সাগর'এর হিন্দী-রূপ 'প্রেম সাগর' চিত্রে তিনি এই চুক্তি অনুযায়ী অভিনয় করেন। হিন্দী সংস্করণে ইন্দুবালা অভিনীত চরিত্রটির নাম 'চঞ্চলা'। এটিও একটি কমিক চরিত্র এবং এই জাতীয় অভিনয়ে তখন তাঁর নৈপুণ্য ছিল অবিসম্বাদিত।

এতে অভিনয় করেছিলেন রামপ্যারী, কোকিলা, ইন্দুবালা, পরেশ ব্যানার্জী, হাসান দীন এবং আরও ১০০০ হাজার শিল্পী। কলকাতার গনেশ টকী হাউসে ২১শে অক্টোবর (১৯৩৮) ছবিটির হিন্দীরূপ 'প্রেম সাগর' মুক্ত পায় এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মোট একমাস মাদ্রাজে থেকে ইন্দুবালা আরও একটি তেলেগু ছবিতে অভিনয় করেছিলেন, তার নাম 'নবীনা সারংধরা'।

মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসার পর কলকাতায় নির্মিত আরও দুটি উর্দু ও তামিল ছবিতে ইন্দুবালা অভিনয় ও সঙ্গীতে অবতীর্ণ হন। এই দুটি ছবির নাম যথাক্রমে 'শের-ই-কাবুল' (উর্দু) ও 'মিস্ সুন্দরী' (তামিল)। দ্বিতীয়টিতে তিনি প্রধানতঃ গানই গেয়েছিলেন।

অবশ্য এর পরও কলকাতায় তিনি একের পর এক ছবিতে অভিনয়ের কাজ শেষ করেছিলেন এবং আগেই বলা হয়েছে, ডবল ভার্সান ছবি (হিন্দী ও বাংলা) কলকাতায় তোলা I. N. A. Picturesএর 'স্বয়ং সিদ্ধাই' এ পর্যন্ত তাঁর সর্বশেষ ছবি হিসেবে চিহ্নিত।

ইন্দুবালা এছাড়া আরও চারটি ছবির সঙ্গে অন্যভাবে জড়িত ছিলেন। এগুলিতে তিনি অভিনয় করেন নি, কিন্তু ছবিগুলির গানে তাঁর নেপথ্য-সঙ্গীত যুক্ত হয়েছিল। নেপথ্য-সঙ্গীত বা Background song হিসাবে আজকাল যা পরিচিত, এক কথায় সেটাও ছিল ঠিক তাই; যদিও তখন এর তেমন একটা রেওয়াজ ছিল না। কেন না অধিকাংশ শিল্পীই তখনকার ছবিতে নিজেরাই গান গাইতে সক্ষম হতেন। যে চারটি ছবিতে তিনি কেবলমাত্র নেপথ্য গায়িকা ছিলেন, সেগুলি হল East India Film Co. নিবেদিত 'চন্দ্রগুপ্ত' (হিন্দী) ও 'আবে হায়াৎ' (উর্দু) এবং ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স নিবেদিত 'দিল-কী-পিয়াস' (উর্দু) ও 'আলিবাবা' (বাংলা)।

ইন্দুবালা অভিনীত বিভিন্ন ভাষায় তোলা ছবির সংখ্যা নিম্নরূপ :

কাহিনীচিত্র	বাংলা···	১০
„	হিন্দী···	২৪
„	উর্দু···	১২
„	পাঞ্জাবী···	১
„	তামিল···	২
„	তেলেগু···	১
মোট ছবির সংখ্যা···		৫০

এই পঞ্চাশটি ছবির প্রায় শতকরা নব্বই ভাগই মাত্র বছর আটেকের মধ্যে তোলা। বিশেষতঃ ১৯৩৬ খ্রীঃ ইন্দুবালা যখন চলচ্চিত্রজগতে খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছেন, সে বছরই তিনি ছোট-বড় প্রায় কুড়িটি বিভিন্ন ভাষার ছবিতে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজে একই সঙ্গে ছবির কাজে ইন্দুবালাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, ইন্দুবালা অভিনীত প্রথম সবাক চিত্র 'যমুনা পুলিনে' ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি যখন 'রাধাকৃষ্ণ' নাম নিয়ে চিত্রগ্রহণ সুরু হয় তখনই বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক চলচ্চিত্ররও পাশাপাশি যাত্রা শুরু হয়। 'যমুনা পুলিনে' অবশ্য মুক্তি পায় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী। এর আগেই প্রথম সবাক চলচ্চিত্র তিন রীলের ছবি 'জোর বরাত' মুক্তি পায় ২৭শে জুন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। এ প্রসঙ্গে 'ভারতে সবাক চিত্রের জন্মরহস্য' নামক রচনায় প্রবীণ অভিনেতা শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নির্বাক যুগে বাংলার সব চেয়ে পুরানো প্রযোজক ছিলেন ম্যাডান এ্যাণ্ড কোং (১৯১৩/১৪ খ্রীঃ)। আমি সেই কোম্পানীতে একজন কর্মী ছিলাম। ১৯৩০ সালে এঁদের উদ্যোগে এলো সবাক চিত্রের সরঞ্জাম। এলো R. C. A. Recording machine—Sound Engineer এলেন Mr. Armound. ১৯৩০-এর শেষাশেষি ম্যাডান কোং সবাক চিত্রের উদ্বোধন করলেন ১টি ৩ রীলের ছবি 'জামাই ষষ্ঠী' (সঙ্গীত-বিহীন)। পরিচালক—অমর চৌধুরী। এঁদের দ্বিতীয় অবদান সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুতির পথে এগিয়ে চলে। এটির নাম ছিল 'জোর বরাত' ৪রীলের। এটি একটি গতিবহুল প্রেম-প্রহসন। পরিচালক—৺জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালক—শ্রীহীরেন বসু, নায়ক ছিলাম আমি, নায়িকা ছিলেন শ্রীমতী কানন দেবী। সবাক চিত্রের প্রথম নায়ক হলাম আমি। কিন্তু আমার মুখের গানের উৎস উঠেছিল হীরেনবাবুর কলি হ'তে গাওয়া গান। আমি শুধু গানের কথার সঙ্গে ঠোঁট নেড়েছিলাম। এই প্রথারই আজকের নাম Play back system'এরজন্যে হীরেনবাবুকে আজও আমি সারা বাংলার হয়ে অভিনন্দিত করি, যিনি সারা ভারতে সর্ব প্রথম এই পদ্ধতির প্রচলন করে সারা গায়কগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করেছেন দামে ও নামে। এই ছবিতে হীরেনবাবু এক ভিখারির ভূমিকায় আরও দু-

খানি গান গেয়েছিলেন। 'জোর বরাত' মুক্তি পায় ২৭শে জুন ১৯৩১ সাল, ক্রাউন সিনেমায় (এখনকার উত্তরা)।

গত জুন ২০শে ১৯৭৯, ৫ম বর্ষের আনন্দলোক পত্রিকায় পড়লাম, বিদগ্ধ গুণী শ্রীরাইচাঁদ বড়াল মহাশয় তাঁর 'যে জন আছি মাঝখানে' সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ১৯৩৪।৩৫ সালে তিনি ভারতে সর্বপ্রথম প্লে-ব্যাকের সৃষ্টি করে বাঙালীর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আরও দেখলাম, তিনি কি নির্বাক কি সবাক বা Play back, Re-recording, Background Musicএর যে ইতিহাস নিজের নামে বলে গেছেন তা সবই এক স্মৃতিভ্রমের অভিব্যক্তি মাত্র। তাই মৃত্যুর পূর্বে আমার এ উপ-যাজনা, পাছে ভবিষ্যতে চিত্রাধ্যায়ীরা প্রকৃত পথিকৃৎদের অবজ্ঞাকার অপাত্রকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়ে বসেন।

১৯৩০ সালেই শুরু হয় পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণ দীর্ঘ সবাক চিত্র 'ঋষির প্রেম' (১২,০০০ ফিট)। লেখক—কবি কৃষ্ণধন দে। সঙ্গীত পরিচালক—হীরেন বসু ও ধীরেন দাস। সম্পাদনা—৺জ্যোতিষ মুখুজ্যে। আবহসঙ্গীত—হীরেন বাবু। গীতিকার—কবি কৃষ্ণধন ও হীরেনবাবু। এ ছবির নায়কও ছিলেন হীরেনবাবু। নায়িকাদ্বয়—শ্রীমতী কানন দেবী ও শ্রীমতী সরযূবালা। বিপরীত নায়ক আমি। অহীনদা, গনেশ গোস্বামী, ধীরেন দাস প্রভৃতিরাও অভিনয়াংশে ছিলেন। ক্যামেরা—Mr. Marcony এবং যতীন দাস। রেকর্ডিং—Mr. Armound.

সবাক চিত্রে সত্যিকারের প্রথম গায়ক-নায়ক বলতে হীরেনবাবুকেই বোঝায় এবং সবাক চিত্রে প্রথম গায়িকা-নায়িকা বলতে শ্রীমতী কানন দেবীর নাম করতেই হবে। হীরেনবাবু এই ছবিতে আবহ-সঙ্গীত Re-recording করান, কারণ Re-recordingএর ব্যবস্থা ম্যাডান কোং-তে ছিল, এবং এর আবহ-সঙ্গীতে হীরেনবাবু এক অভিনব তারের যন্ত্র ভারতীয় সঙ্গীতে (সর্বপ্রথম ভারতে) ব্যবহার করেন তার নাম হচ্ছে, হাওয়াইয়ান গীটার। বাজিয়ে ছিলেন Mr. Marcony (ক্যামেরাম্যান) ও তারকনাথ দে (আজকের বিখ্যাত অলোক দের পিতা)।

পূর্ণাঙ্গ সবাক চিত্র "ঋষির প্রেম" ৩রা অক্টোবর ১৯৩১ সালে ক্রাউন সিনেমায় মুক্তিলাভ করে। কিন্তু তার ক'দিন আগেই বোম্বাই-এর

Imperial Co-র মিঃ আরদেশী ইরাণী তাঁর পূর্ণ দৈর্ঘ্য "আলমারা" চিত্রখানিকে মুক্তি দিয়ে বাংলার প্রথম স্থান ছিনিয়ে নেন। বোম্বের সবাক চিত্রের এই প্রথমাধিকার হচ্ছে একটি রহস্য, কারণ তার বহু পূর্বেই ৩ রীলের-৪ রীলের সবাক চিত্র ম্যাডান কোম্পানী দিয়েছিলেন, কিন্তু ভারত-চিত্র পরিষদের মতে ৩।৪ রীলের ছবি পূর্ণাঙ্গ নয়, কাজেই আলমারাই ভারতের সর্বপ্রথম পূর্ণ সবাক চিত্র।

১৯৩১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর নিউ থিয়েটার্সের প্রথম সবাক চিত্র 'দেনা-পাওনা' আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীরাইচাঁদ বাবু কি করে যে সর্ববিষয়ে প্রথম স্থানকে অবরোধ করে বসেন তাও আমার কাছে আর এক রহস্য।'

[নব কল্লোল ২০শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা মার্চ ১৯৮০ চৈত্র ১৩৮৬]

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে, সবাক পূর্ণাঙ্গ বাংলা চিত্রের সুরু থেকেই ইন্দুবালা তাঁর অভিনয় ও সঙ্গীতের মাধ্যমে এর সঙ্গে জড়িত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর পর একটানা প্রায় ষাটটি চলচ্চিত্রে অভিনয় সাফল্যের মাধ্যমে তাঁর অভিনয় প্রতিভারই যোগ্যতা স্বীকৃত হয় এবং মাত্র পাঁচ বছর কাল এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত থেকেও বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক পর্বের সূচনা থেকেই তিনি তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে যেতে সমর্থ হন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিল্পীর জীবনে সংগ্রাম ও ব্যক্তিত্ব

ইন্দুবালার শিল্পীজীবন প্রকৃতপক্ষে নিরন্তর সংগ্রামের এক দীর্ঘ ইতিহাস। সঙ্গীতে, নাটকে, চলচ্চিত্রে তাঁর সাফল্য নিঃসন্দেহে উদাহরণযোগ্য। সুদীর্ঘ ষাট বছরেরও অধিককালের শিল্পীজীবনে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পেয়েছেন অজস্র সম্মান, শ্রদ্ধা, অর্থ এবং দেশবাসীর ভালবাসা। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, বর্তমান শতাব্দীর চেয়েও বয়সে কিঞ্চিৎ বড়ো এই শিল্পী এখনও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত এবং উদ্দীপিত করে চলেছেন।

ব্যক্তিজীবনে নিরহঙ্কারী প্রবীণা এই শিল্পীর জীবনের আর একটি দিকও আছে যা জনসাধারণের কাছে এখনও প্রায় অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তাঁর জীবনের প্রারম্ভ থেকে অস্তিত্ব রক্ষার যে সঙ্কট তীব্র হয়ে উঠেছিল, পারিবারিক অভাব-অনটন ও নিরাপত্তার অভাব ও অন্যান্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ইন্দুবালা যে-সংগ্রাম চালিয়ে অবশেষে সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিলেন, তার বাইরেও তাঁর জীবনের আর একটি দিক ছিল। সেই জগতের উন্নতির জন্যেও তিনি পাশাপাশি আজীবন বিদ্রোহীর মতই সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। সেই সংগ্রামের কাহিনী না বললে, বা জানতে পারলে তাঁর জীবনী অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য।

দুর্ভাগ্য জীবনের সূচনায় ইন্দুবালাকে যে অবস্থায় বা পরিবেশে স্রোতের মত ভাসিয়ে এনেছিল তার ইতিহাস আমাদের একেবারে অজানা নয়। একদা চট্টোপাধ্যায় বংশসম্ভূত কন্যা এবং মুখোপাধ্যায় বংশের বউ পুঁটি-রানী কলকাতার জনারণ্যে দুর্ভাগ্যের টানে পরিবেশের যে পঙ্কস্রোতে পথ হারাতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার কথা কিঞ্চিৎ আভাসিত হয়েছে এই গ্রন্থের প্রাক্-কথনে। তারপর অদৃষ্টের নানা অলিগলি পেরিয়ে রামবাগান অঞ্চলে কিভাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই হতভাগ্য পরিবার, তার বৃত্তান্ত আজও

ইন্দুবালার স্মরণে আছে। তবু পঙ্কে প্রস্ফুটিত পবিত্র পদ্মের মতই পরিবেশের মলিন চিত্রকে মুছে দিয়ে অবশেষে সাফল্যের কোরককে প্রস্ফুটিত করতে মা রাজবালা কসুর করেন নি। অবশেষে ইন্দুবালা শিল্পের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে নিজেকে পরিবেশের ঘৃণ্য পরিচয়ের উর্ধ্বে স্থাপন করে একদিকে যেমন জয় করেছেন অতীতের মালিন্য, অপরদিকে এই সামাজিক অভিশাপের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মন্ত্রও গ্রহণ করেছিলেন এই মহীয়সী রমনী।

কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলটি আমরা জানি বহুকাল ধরে জনমানসে বিশেষ একটি পেশার পরিচয় বহন করে চলেছে। কয়েক হাজার মানুষ আজও এই অঞ্চলে মানবজাতির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অভিশপ্তময় আদিম পেশায় নিযুক্ত। এই বৃত্তি থেকে নানা কারণে এবং প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথা নিরাপত্তার কারণে ভাগ্যকে এই এলাকার হাতে এঁরা সঁপে দিতে বাধ্য হন। দেহ-ব্যবসার মধ্যে মূলতঃ পেটের ক্ষুধাই এদের ক্রমশঃ ঘৃণ্য এই জীবনযাত্রার ঘেরাটোপে ঠেলে দেয়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একবার এই জীবনে প্রবেশ করলে ফেরার পথ প্রায় চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের পথ এদের কাছে খোলা থাকে না। সোনাগাছির অন্যতম পরিচিতির দুর্ভাগ্যের টীকা কপালে নিয়ে ক্রমশঃ বিস্মৃতি এবং বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যান এঁরা। নিজের অভিজ্ঞতার কথাকে স্মরণে রেখে ইন্দুবালাই সর্বপ্রথম সমাজে উপেক্ষিতা এইসব নারীদের সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিলেন। সোনাগাছির পাশেই রুপোগাছি নাম পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে রামবাগান হয়। পেশা বা বৃত্তির দিক থেকে রুপোগাছি ছিল মূলতঃ সোনাগাছিরই সহযাত্রী। এই রামবাগানেই বাসিন্দা হয়ে প্রথমে এসেছিলেন ইন্দুবালার বড় মাসি হরিমতী দাসী। স্বয়ং মুটুবিহারী ঘোষ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর হরিমতীর কাছেই বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন কিশোরী ভগিনীদ্বয় মতিবালা ও রাজবালা এবং একমাত্র ভাই তিনকড়ি দাস। এখান থেকেই একদা তিনটি বালক-বালিকা সার্কাসের দলে নাম লিখিয়ে ভাগ্যের পরিবর্তনে বেরিয়ে পড়েছিলেন। অমৃতসর শহরে ইন্দুবালা জন্মগ্রহণের কয়েক বছরের মধ্যেই মায়ের সঙ্গে এই রামবাগানে

এসেই বসবাস করতে থাকেন। পিতা মাকে দূরে ঠেলে রাখলেও রাজবালা তাঁকে সেই কষ্ট বা অভাব বুঝতে দেননি। তাছাড়া, সামাজিক প্রতিষ্ঠার বাসনায় রাজবালা মেয়েকে স্কুলেও ভর্তি করিয়েছিলেন। সেই থেকে ইন্দুবালা কখনো নার্সিং, কখনো গান শেখার বাসনায় সব ছেড়ে মনোযোগী হয়েছিলেন। এইভাবে ইন্দুবালার ব্যক্তিজীবন হয়ে উঠেছিল পরিবেশকে জয় বা পরিবেশের নীচতা থেকে উত্তরণের উজ্জ্বল এক উদাহরণ।

এই বোধ থেকেই জীবনে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে 'সমাজে উপেক্ষিতা পতিতা নারীদের সম্মেলন' আহূত হয়েছিল কলকাতায় ১৯৫৮ সালে। ইন্দুবালার তখন বয়স প্রায় ষাট ছুঁই ছুঁই। পতিতা নারীদের নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গের যে সম্মেলন কলকাতায় সেবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার হ্যাণ্ডবিলটি ছিল এই রকম ঃ

—ঃ সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী ঃ—

সমাজ উপেক্ষিতা পতিতা নারীদের সম্মেলন

স্থান ঃ—৬৬ ডি, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের সম্মুখের খোলা মাঠ।

(মধ্য কলকাতা মুচিপাড়া থানা এলাকা)

তারিখ ঃ—২৮শে জুলাই, ১৯৫৮ "সোমবার"।

প্রতিনিধি সম্মেলন ঃ—সকাল ১১ ঘটিকা।

সভাপতি ঃ— ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র।

প্রকাশ্য অধিবেশন ঃ—সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায়।

সভাপতি ঃ—কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন

(সম্ভব হইলে পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইবে)

প্রতিনিধি সম্মেলনে বিভিন্ন এলাকার সমাজ-উপেক্ষিতা পতিতা নারীদের ও ঐ জাতীয় সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ও যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয়। জেলা-প্রতিনিধি বা বহিরাগতা মহিলা-প্রতিনিধিদের থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করিয়া প্রতিনিধি কার্ড সংগ্রহ করুন ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যা হউন।

দলে দলে পতিতা নারীগণ সম্মেলনে যোগদান করুন।

—ঃ আলোচ্য বিষয় ঃ—

কেন্দ্রীয় পতিতা উচ্ছেদ আইন ও পতিতাদের কর্ত্তব্য।

৯।৭।৫৮ — নিবেদিকা :

ফোন নং ৩৪-২৫০৭ — **সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী ইন্দুবালা**

১৬ নং নবীনচাঁদ বড়াল লেন — সভানেত্রী

কলিকাতা-১২ — সম্মিলিত নারী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ

এই সম্মেলন শেষে এঁদের সংগঠন 'সম্মিলিত নারী সমিতি'র কার্য্যকলাপ নানাদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে এই সমিতির (প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, হাড়কাটা, ব্যানার্জী লেন ও রাধামোহন পাল লেন) প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২২শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ শনিবার বৈকাল ৪ ঘটিকায়। স্থান :—প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট ও ব্যানার্জী লেন সংযোগস্থল। এ সম্মেলনে বন্যাপীড়িত ভাইবোনদের সহায়তার জন্য ভিক্ষায় সংগৃহীত সহস্রাধিক অর্থ ও বহু পরিচ্ছদ এবং খাদ্যবস্তু মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা, উদ্বোধনে—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, সভাপতি—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র। এছাড়া সম্মেলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, কাউন্সিলার শ্রীকিষণচাঁদ বড়াল। ব্যুরো সদস্য শ্রীনিতাইচাঁদ বড়াল।

এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি ছিল :

● দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজবহির্ভূতাদের পুনর্বাসন করিবার যে পরিকল্পনা জাতীয় ভারত সরকার কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ডের দ্বারা কার্য্যকরী করিবার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, উক্ত পরিকল্পনার "আশ্রম-শ্রমা-শ্রমাদি" পরিকল্পনা যাহাতে "সহর-কেন্দ্রীক" ভাবে কার্য্যকরী হয় তাহার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া এই অধিবেশন করুণভাবে আবেদন জানাইতেছেন।

● এই সম্মেলন উক্ত প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাইয়া এই প্রার্থনা জানাইতেছেন যে, সমাজবহির্ভূতা নারীগণ অনুন্নত জীবনযাত্রার পথ উন্নত পরিবেশের মধ্যে থেকে সেবা, শান্তি ও মুক্তির আদর্শে নিজেদের

মানসিক, শারীরিক, আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সমস্যা সমাধান করিতে পারেন—এই উদ্দেশ্য লইয়া সহযোগিতা করিবার জন্য সম্মিলিত নারী সমিতির দুইজন প্রতিনিধিকে কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ডে যাহাতে গ্রহণ করেন, তাহার জন্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্র সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ডের শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিবর্গকে এই সম্মেলন বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছেন।

* সম্মিলিত নারী সমিতি সমাজবহির্ভূতা নারীগণ লইয়া গঠিত। সম্মানিত শ্রদ্ধেয় জননেতাদের উপদেষ্টা বোর্ডে রাখিয়া এই সমিতি সমাজ সেবামূলক সর্বোদয় আদর্শে বিশ্বাসী অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজ-সেবায়, দুঃস্থ যক্ষ্মা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগীর সেবায়, ধর্মোৎসাহে তীর্থযাত্রীর সেবায়, কুটিরশিল্পের মাধ্যমে জীবিকার্জনের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করিবার জন্য, সর্বোদয় সমাজব্যবস্থা ও খাদি প্রচারে ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিজেদের জীবনের মান উন্নয়ন করার সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য এই অধিবেশন জাতীয় ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ ভারতীয় জনগণের নিকট, তথা সারা পৃথিবীর নিকট সাহায্য, সহায়তা ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছেন।

কিন্তু এইসব আবেদন সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে নারী সমিতির কোন উপকার শেষপর্যন্ত হয়নি। বরং নারী সমিতির শ্রীমতি ব্রজবালা দাসী, অবৈতনিক সাঃ সম্পাদিকার বক্তব্য অনুযায়ী, 'আইন জারী হইল, অথচ আমাদের 'প্রকৃত বন্দোবস্ত' প্রাদেশিক পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা জাতীয় ভারত সরকার কিছুই করেন নাই। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে পতিতাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে। এমনকি বহু রকমের হুমকি ও অন্যায় অত্যাচারও সুরু হইয়াছে।'

অন্যদিকে 'সম্মিলিত নারী সমিতি'র সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে ২৭শে জুলাই রবিবার ১৯৫৮ ইন্দুবালার এই বিবৃতিটি যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সম্মিলিত নারী সমিতির

সম্মেলন

শ্রীমতী ইন্দুবালার বিবৃতি

শ্রীমতী ইন্দুবালা এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইতেছেন: "বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে ২৭শে জুলাই রবিবার প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে সম্মিলিত নারী সমিতির সম্মেলনের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমাকে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী বলা হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন নাকি সভাপতিত্ব করিবেন। কিন্তু আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। উক্ত সম্মেলনের উদ্যোক্তারা একদিন আমার সঙ্গে দেখা করিয়া একজন সদস্য হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন মাত্র। যাহা হউক, আরও সংবাদ পাইলাম, উদ্যোক্তাগণ সম্মেলনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যোগ করিয়া দরিদ্র পতিতা মা-বোনদের নিকট প্রবেশপত্র বিক্রি করিতেছেন। ইহা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অবৈধ। আজ ভারত সরকার যে আইন প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে পতিতা বোনদের ভিতরে খানিকটা ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ লইয়া কতকগুলি সমাজবিরোধী লোক এক প্রকার ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। আমাকে উদ্যোক্তাগণ অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী বলিয়া হ্যাণ্ডবিল এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে যেরূপ প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে দুঃখের সহিত আমি পতিতা বোনদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তাহারা যেন ঐসব প্রচারে ভুলিয়া এই দুর্দিনে তাহাদের অর্থের অপব্যয় না করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিই সকল প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানায় এবং সম্মেলনের মূল সভাপতিকে তিনিই নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা আমার কোন অনুমতি নেন নাই। অধিকন্তু আমি স্বয়ং কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর বাসভবনে গিয়া দেখা করিয়া জানিতে পারি যে, তিনিও এ বিষয়ে কিছুই অবগত নন এবং উক্ত সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে যোগদান করিতে কোনও সম্মতি দেন নাই। এই দুঃসময়ে পতিতা বোনদের সাহায্য করিতে আমরা পশ্চিমবঙ্গ নারী কল্যাণ সমিতি নামে একটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছি। সমিতির বর্তমান কার্য্যালয় ৩২নং যতীন্দ্র মোহন এভিনিউয়ে অবস্থিত। পতিতাদের সমাজে সুষ্ঠু পুনর্বাসন বিষয়ে এই সমিতি ইতিমধ্যে কার্যসূচী গ্রহণ করিয়া সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।"

এই বিবৃতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসীকে সম্মিলিত নারী সমিতি থেকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করা হয়। সমিতির সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির কার্যনির্বাহক পরিষদের এক জরুরী সভায় প্রতিবাদ শেষে উক্ত সুপারিশ এবং প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর ফলে এই সংস্থার সঙ্গে ইন্দুবালার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। আসলে এই নারী সমিতি তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফাঁদে পড়ে মূল উদ্দেশ্য থেকে চ্যুত হয়ে পড়েছিল। এরই ফলস্বরূপ অবৈতনিক সাঃ সম্পাদিকা শ্রীমতি ব্রজবালা দাসী এর পরেই পূর্বে উল্লেখিত বিবৃতি, সমিতির ব্যর্থতা এবং আশঙ্কার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন।

পতিতা নারীদের নিয়ে এরকম সমিতি বহু পূর্বেই গঠিত হয়েছিল কলকাতার রামবাগান অঞ্চলে। সমিতি গঠন করারও আগে কাঙ্গালিনী থিয়েটার এবং ভিখারিনী থিয়েটারই এই কর্মের সূচনাপর্ব। 'দি রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটার' ছিল রামবাগান নারী সমিতির একটি অংশবিশেষ। তাই যখন 'ফিমেল কালী থিয়েটার' উঠে গেল তখন সেই বিশের দশকেও রামবাগান নারী সমিতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রধানতঃ সেবামূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই ছিল এর পরিচয় বা খ্যাতি। ইন্দুবালার মা রাজবালার উদ্যোগেই সেকালে রামবাগান নারী সমিতি গঠিত হয়। সুদীর্ঘ কাল ধরেই এই সমিতির উন্নয়নমূলক কার্যাকলাপ অব্যাহত ছিল। এই সময় অর্থাৎ এর জন্মলগ্ন থেকেই ইন্দুবালাও এর কার্য্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনোত্তর কালে ভারত সরকারের পতিতাবৃত্তি নিরোধ বিষয়ক কেন্দ্রীয় নূতন আইনের পরিপ্রেক্ষিতেই নারী সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠনের দায়িত্ব অনুভূত হয়। গোড়ায় (১৯৫৬-৫৮) এর বিস্তার ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য হলেও ক্রমশঃ এই সংগঠন প্রকৃতপক্ষে অবাঞ্ছিত লোকদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বলি হয়ে পড়ে।

বাধ্য হয়ে ইন্দুবালা পতিতা নারীদের সপক্ষে দাঁড়িয়ে একটি বিবৃতি যৌথ-ভাবে প্রকাশ করে তা ছাপিয়ে বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিবৃতি বা আবেদনটি হল এইরূপ :—

"স্নেহের বোন, বাংলাদেশে আমাদের মত দুঃখের জীবন আর কাদেরও

আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের দুঃখে দুর্দিনে একটা "আহা" বলবার লোকের অভাব আমরা যতটা বোধ করি এতটা বোধহয় আর কাদেরও কোরতে হয় না। আমাদের পৃষ্ঠপোষক যাঁরা, তাঁরা সময়ের বন্ধু মাত্র, অসময়ের বড় কেউ নন্। তাঁদের কাছ থেকে বেশী আশা করা অন্যায়, কারণ আমরা দেহের ব্যবসা করে থাকি, প্রাণের নয়। শুধু মানুষ কেন, সময় সময় মনে হয়, ভগবানও বুঝি আমাদের প্রতি বিমুখ। সমস্ত জীবনটা আমাদের নিতান্ত পরের, অত্যন্ত অচেনার মুখ চেয়ে কাটাতে হয়।

দেহ বেচা ছাড়া ইচ্ছে করলে যে আমরা অন্যান্য কাজ কোরেও খেতে-পরতে পারি, একথা আমরা বড় একটা ভাবি না। আমরা কোন কাজে মন দিলে যে অসাধ্য সাধনও করতে পারি একথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার কোর্‌বে।

এমন একটা সময় এসে পোড়েছে যখন সকলেই নিজের পায়ের ওপর ভর কোরে দাঁড়াবার চেষ্টা কোরছে। আমরা কোরবো না কেন?

দেশের সমাজে যখন আমাদের কোন স্থান নেই, তখন আমাদের নিজেদের সমাজ আমাদেরই গড়ে তুল্‌তে হবে। বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় পাঠাগার, দরিদ্র ভাণ্ডার—এক এক কোরে এই সমস্তগুলি স্থাপন কোরতে হবে। এই শুভ ইচ্ছা কাজে পরিণত কোরতে লোকবল, অর্থবল ও মনের বলের দরকার। তুমি আমাদেরই একজন হোয়ে, যাতে আমাদের এই চেষ্টা ফলবতী হয়, তার জন্য সামান্য অর্থ ও সময় দেবে না কি?

রাধারানী দাসী (সাহেব পুঁটী	শান্তমনি দাসী
নানুমনি দাসী	লীলাবতী দেবী
কৃষ্ণভাবিনি দেবী	জুঁইবালা দাসী
শরৎকুমারী দাসী	মিস গুল্‌নার
বিভাবতী দাসী	ইন্দুবালা দাসী (গাইয়ে)
মাণিকরানী দাসী	মিস্ বেলা দাসী।"

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে এই হ্যাণ্ডবিল প্রচার করা হয় এবং পতিতা ভগিনীবৃন্দ ক্রমশঃ এই পথে গঠনমূলক কাজে অগ্রসর হতে থাকেন।

ইন্দুবালার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পূর্বোক্ত সম্মেলনের পরিণতি

সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই পতিতা ভগিনীদের উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি সতর্কবানী উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলা যায়। অন্যদিকে বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে তিনি পতিতা নারীদের উপর ভণ্ড দেশপ্রেমিকদের অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এর ফলে সুবিধা-বাদী দলের মুখোস খুলে যায়। অন্যদিকে তাঁর নেতৃত্বে পতিতা নারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে টেনে এনে জীবনের অস্থিরতা থেকে মুক্তির প্রয়াসে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই বোধ থেকেই তিনি নিজের নাম বা ঠিকানা পরিবর্তনের কথা কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করেন নি।

লক্ষণীয়, ইন্দুবালার চরিত্রে কোনরকম ভণ্ডামী বা লুকোচুরি কখনো ছিল না, আজও নেই। একদা একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন : তোমাদের তুলনায় আমার ধরনধারণ মেজাজ কি মিল হতে পারে মা ? না না, নিজেকে কোন দিক থেকে আমি ক্ষমা করতে পারি না আজ পর্যন্ত। কেন, কেন আমি ভদ্রঘর থেকে ইন্দুবালা হতে পারিনি ! কিসের জন্য এই পল্লীর মেয়ে আমি ? জানো মা গৌরী ! ত্নিয়া সুদ্ধ সকলে বলে যে আপনি ভদ্রপল্লীতে যান, স্কুল করুন, আপনার জিনিস সব দান করুন, শেখান, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা কি হয় নাকি ? দিদিমা বনবিষ্ণুপুর হতে এসেছিলেন, চাটুজ্জেদের বাড়ির মেয়ে ও মুখুজ্জেদের বাড়ির বৌ হয়ে। পরে বিধবা হয়ে এই পাড়ায়, তিন পুরুষের বাস কি ভাঙতে পারি ! পারবো না। কারণ ভগবান যে শাস্তি দিয়েছেন মাথা পেতে নিয়েছি, উল্টোরথের "আষাঢ় সংখ্যায়"* কিছু তো লুকুইনি মা। ভাদ্রের সংখ্যায় আরো খুলে দিয়েছি। মানা অর্থাৎ প্রণব, সেও জানে যে তার জীবনে সে যখন অভিজাত পাড়ায় বাড়ি করবে তখন তার এই মা কোনদিন যাবে না। শেষ জীবনে কোথায় মরব জানি না, তবু এই পাড়ায় মরবার আশা রাখি।†

নিজের পরিচয়কে কোন মোড়কে ঢেকে রাখা বা অতীতকে অস্বীকার করবার কৃত্রিম চেষ্টা ইন্দুবালা কখনোই করেননি। এমন কি যখন অজস্র অর্থ উপার্জন করেছেন, ত্'হাতে অর্থ খরচ করেছেন, তখনও ওই পাড়া ছেড়ে

* 'উল্টোরথ' আষাঢ় ১৩৭৩ সংখ্যা ও ভাদ্র ১৩৭৩ সংখ্যার সন্ধ্যা সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

† নৈহাটিতে লেখক সমরেশ বসুর স্ত্রী ৺গৌরী বসুকে লেখা পত্র, ২রা অক্টোবর ১৯৬৬।

আসার প্রলোভন বা প্ররোচনাকে তিনি নির্দ্বিধায় জয় করেছেন। প্রায়ই তিনি বলেন, আমি রামবাগানের ইন্দু, এখানে থেকে আমি গান শিখেছি, প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, সম্মান পেয়েছি, সবাই আমাকে জানেন আমি রামবাগানের সেই ইন্দু। আমি রামবাগান ছেড়ে উঠে যাব কি জন্যে, আর কীসের আশায় আমি রামবাগানকে ছেড়ে যাবো ?

*　　　*　　　*

শিল্পীজীবনে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিত আসরে গান গেয়ে এসেছেন ইন্দুবালা। তার পরেও বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়মিত আকাশবানী কলকাতা কেন্দ্র থেকে পুরাতনী গান এবং নজরুলগীতি তিনি পরিবেশন করেছেন। সত্তর সালের পর থেকে একটি চোখ অপারেশনের ফলে বেতারে যাওয়াও তিনি বন্ধ করে দেন। ইতিপূর্বে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে ও বেলেঘাটায়, নজরুল একাডেমির নজরুল জয়ন্তীতে মহাজাতি সদনে তিনি পুরাতনী গান ও নজরুলগীতি গেয়ে শ্রোতাদের বিস্ময়ে হতবাক্ করে দেন। ভারত-চীন যুদ্ধের সময় জাতীয় ত্রাণ ভাণ্ডারের জন্যে বেশ কয়েকবার সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন ইন্দুবালা। বছর কয়েক আগে চোখের দৃষ্টিশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে ইচ্ছে থাকলেও আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি কোথাও গাইতে যেতে পারেন না। তাছাড়া প্রায় বছর পাঁচেক ধরে বিছানায় অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকার ফলে তাঁর পক্ষে কোথাও সঙ্গীত পরিবেশন করা এখন রীতিমত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও ১৯৮১খ্রীঃ ১০ই জুলাই কলকাতা শিশির মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি কয়েকখানি সঙ্গীত পরিবেশন করে দেশবাসীকে বিস্মিত করে দিয়েছেন। যদিও তখন তিনি পুরোপুরি শয্যাশায়ী এবং বিরাশি বছরের বৃদ্ধা। ১৯৮৩ সালের নজরুল জন্মজয়ন্তীতে ইন্দুবালাকে প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায়ও (মহাজাতি সদন) তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। সম্ভবতঃ সেটিই তাঁর জনসমক্ষে সর্বশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত।

ইতিমধ্যে নয়াদিল্লীর সঙ্গীত নাটক একাডেমি তাঁকে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্গীত নাটক একাডেমি প্রদত্ত পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। এছাড়া গত ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমি ইন্দুবালাকে নজরুল পুরস্কার

দান করে সম্মান জ্ঞাপন করেছেন। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তাঁকে কলকাতায় শিশির মঞ্চে সম্বর্ধনা দান করেছেন। হিজ মাষ্টার্স ভয়েস কোম্পানী প্রদত্ত গোল্ডেন ডিস্ক ইন্দুবালা লাভ করেন ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। দি গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে এইচ. এম. ভি'র শ্রদ্ধাঞ্জলি (রবীন্দ্র সদন, কলকাতা ৬ই এপ্রিল ১৯৭৬) অনুষ্ঠানে শ্রীমতী ইন্দুবালা সহ শ্রীমতী আঙ্গুরবালা, পঙ্কজকুমার মল্লিক, কমলা দেবী (ঝরিয়া), কানন দেবী ও যুথিকা রায়কে সম্বর্ধিত করা হয়। এই উপলক্ষে প্রকাশিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' শীর্ষক পুস্তিকাটিতে শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী শীর্ষক শিল্পী পরিচিতি লিখেছিলেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। তাতে লেখা ছিল, 'প্রাচীন যে কজন শিল্পী আজও জীবিত আছেন শ্রীমতী ইন্দুবালা তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি এখন আর বিশেষ গান করেন না। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর ও আবেগপূর্ণ গায়নপদ্ধতি চিরদিন মনে থাকবে। তিনি নানারকম গানে রীতিমত পারদর্শিনী ছিলেন। সাধনা ও নিষ্ঠা সহকারে বাল্যকাল থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অভ্যাস করেছিলেন বলেই তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল অতি সহজেই।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিশেষ জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন শ্রীমতী ইন্দুবালা। সারা প্রেক্ষাগৃহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তার গান শুনে। একযুগ ধরে তিনি ছিলেন রসিক শ্রোতাদের পরম প্রিয় শিল্পী। শুধু বাংলাদেশ নয়, বাংলার বাইরেও হিন্দী, উর্দু গান গেয়ে তিনি বহু রাজা-মহারাজা-নবাবদের দরবারে এবং জনসাধারণের কাছে প্রশংসা পেয়েছেন অজস্র। ঘরে ঘরে থাকত তাঁর রেকর্ড। আমরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছি একই গান বারবার।

সঙ্গীত নাটক একাডেমী এ বছরে শ্রীমতী ইন্দুবালাকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, শ্রীমতী ইন্দুবালার মত প্রতিভাময়ী শিল্পীর প্রতি দেশ ও জাতির কর্তব্য এখনও বাকী রয়ে গেছে অনেক।'—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

তুষারকান্তি যথার্থই লিখেছিলেন, 'ইন্দুবালার মত প্রতিভাময়ী শিল্পীর প্রতি দেশ ও জাতির কর্তব্য এখনও বাকী রয়ে গেছে অনেক।' ভারত সরকার ইন্দুবালার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট বা তুলনামূলকভাবে কম

উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মশ্রী' বা অনুরূপ সম্মানে ভূষিত করেছেন। কিন্তু ইন্দুবালার প্রতি চুরাশি বছর বয়সেও সরকারের দৃষ্টি পড়েনি। এমন কি, দাদাভাই ফাল্‌কে পুরস্কার যা বর্তমানে রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান হিসেবে মান্য, তা থেকেও আজ পর্যন্ত তাঁকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

পাশাপাশি এইচ. এম. ভি. প্রকাশিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' গ্রন্থ বা রেকর্ড তালিকা প্রণয়নেও প্রবীনা শিল্পী ইন্দুবালাকে এই গ্রন্থের প্রথম শিল্পী হিসেবে না দেখানোটাও দৃষ্টিকটু ঠেকে। বয়সের বিবেচনা করলেও তো এই তালিকায় প্রথমে ইন্দুবালারই স্থান পাওয়া উচিত ছিল। ওই অনুষ্ঠানে অসুস্থতাবশত তিনি নিজে সশরীরে উপস্থিত হতে পারেননি। গেলে সর্বোজ্যেষ্ঠা এই শিল্পী এতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠাবোধ করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে পুত্রবধূ ছবি ঘোষ সেই গোল্ডেন ডিস্‌কটি সেদিন গ্রহণ করেছিলেন।

ঐ 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' গ্রন্থে ইন্দুবালার পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল :

"আকাশে তখন নক্ষত্রেরা
নিস্তব্ধ শিশির লগ্নে :
আঁখিতে অশ্রুর স্রোত বয়
বিষণ্ণ পথটি এসে
শেষ হয় নিদ্রিত শ্মশানে…"

আপন সংগীতজীবনের সর্বোত্তম প্রেরণাদাত্রী মাতার মৃত্যুতে শ্রীমতী ইন্দুবালা সহসা এই কবিতাটি লিখেছিলেন। আগে বা পরে আর কখনো লেখেননি। বোধহয় তাঁর রুদ্ধ কাব্য-প্রতিভাই সংগীতে ললিতকলায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।'

এই তথ্যটি সঠিক নয়। কেন না ইন্দুবালার মা রাজবালার মৃত্যু হয়েছিল ২৭শে ভাদ্র ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে। মৃত্যুর দিনে শোকাতুরা ইন্দুবালা শ্মশানে মাকে দেখতে দেখতে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাকেই তিনি পরদিন বাড়িতে বসে লেখা এই কবিতায় ব্যক্ত করেছিলেন। পুরো কবিতাটি এখানে হুবহু তুলে দেওয়া হল :

॥ শ্মশানে ॥

আকাশে তখন নক্ষত্রেরা
নিস্তব্ধ শিশির লগ্নে ;
আঁখিতে অশ্রুর স্রোত বয়,
বিষণ্ণ পথটি এসে
শেষ হয় নিদ্রিত শ্মশানে ।
শ্মশান বন্ধুরা সব মুছে দেয় বেদনার স্বেদ
উদাস চণ্ডাল আসে—
আসে ব্রাহ্মণ—আসন্ন মুখাগ্নিকাল
শয্যা মহাপ্রস্থানে প্রথিত ;
সজ্জিত রজনীগন্ধা নানাবিধ শ্বেত পুষ্পে
ব্যথা বিদ্ধ মনে আমি দেখি
সেই পবিত্র শয্যারে
যেখানে জননী ঘুমে বিমগ্ন বিভোর ;
সাড়া দেবে না সে আর কোনদিন
কোন বন্ধনের পৃথিবীতে ।
একে একে খুলে দিই সকল বন্ধন
তুলে রাখি রজনী গন্ধার হার
জননীর বিমল শরীরে
ওষ্ঠাধরে মাখি দেই ঘৃতের প্রলেপ
গন্ধ চন্দনের মমতার,
মন্ত্র করি পাঠ ধীরে
তুলে ধরি তাপপ্রসূ অগ্নিশিখা
জননীর মুখে ।
দহনে দারুণ হুতাশন হানে হিরণের দ্যুতি
বিষণ্ণ রাত্রির বুকে ধীরে ধীরে
ভস্ম চিতা ভ'রে ॥

ইতি—ভাগ্যহীনা ইন্দুবালা

তথ্যগত আর একটি ভুল হল এই যে, ইন্দুবালার জীবনে এটি আপাত প্রাপ্ত প্রথম কবিতা হলেও এর বছর পাঁচেক পরে লেখা আর একটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। নৈহাটীর সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'ফাল্গুনী' (অধ্যক্ষা বর্তমানে প্রয়াত গৌরী বসু) দশম বর্ষ পূর্ত্তি উৎসব উপলক্ষে এই কবিতাটি ফাল্গুনার অধ্যক্ষা শ্রীমতী গৌরী বসুর নিকট প্রেরিত এবং ওই উৎসবের (২৯শে চৈত্র ১৩৮১) স্মারকপত্রে প্রকাশিত।

আশীর্বানী

শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী

হৃদয় মন্দিরে মম
গাঁথা রবে চিরদিন।
সেই সুন্দর সন্ধ্যা
নবীন ফাল্গুন দিন॥
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার
মালা দিলে তুলি।
জীবন সন্ধ্যায় আসি
তবু নাহি ভুলি॥
তুমি মম হৃদয়ের
আদরের ধন।
প্রকৃত শিল্পী তুমি
সঙ্গীতে ভজন॥
নিভে আসে মম দীপ
তবুও যে শুনি।
প্রতি ফাল্গুনে ডাকে
তব ফাল্গুনী॥
প্রেমের সুরভি দিয়ে
পুরাও মনের সাধ।
প্রিয়তমা কন্যা মোর
এই করি আশীর্ব্বাদ॥

উদ্দেশ্যে Classic Theatreএর পক্ষ থেকে একটি হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হয়েছিল। তাতে একপিঠে প্রোফেসর বোসের সার্কাসে সময় পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি ও অপর পৃষ্ঠায় ছাপা ছিল,—

Classic Theatre

৩-১-০৫

শ্রদ্ধাস্পদ পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল বসু

Proprietor, GREAT BENGAL CIRCUS.

পূজ্যপাদ মতিবাবু মহাশয়,

"এখন বেশ বুঝিয়াছি, পূর্ব হইতে যে স্নেহচক্ষে আমাকে দেখিয়া আসিতেন, সেই নিঃস্বার্থ স্নেহ প্রবণতা এখনও সমভাবে বর্তমান।......

স্নেহাকাঙ্খী,

(স্বাঃ) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

3-1-05

মূল প্রতিলিপিটি আমার কাছে আছে। সুতরাং বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অবশ্যই মতিলাল বসু Great Bengal Circusএর মালিক ছিলেন। ফলে প্রিয়লালের সার্কাসে (প্রিয়নাথ নয়) 'আয়ব্যয়ের হিসাবনিকাশ দেখার ভার নেন' একথাও ঠিক নয়। তা ছাড়া প্রিয়লালের মেজদা নিশ্চয়ই ছোট ভাইয়ের চেয়ে বয়সে বড়ো, তাহলে রাধাপ্রসাদবাবুর তথ্যানুযায়ী মতিলালও ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন, অথচ দেখা যাচ্ছে তিনিই আবার লিখেছেন, 'প্রিয়নাথ বোসের জন্ম ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। নিশ্চয়ই কোথাও গুরুতর ভুলচুক থেকেই এই বিপত্তি।

যাই হোক ইন্দুবালা এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর মুখে শুনেছি মতিলাল বসুর জন্ম বাংলা ১২৬৪-তে, অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, এবং মতিলাল ও প্রিয়লাল গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মালিক ছিলেন মতিলাল স্বয়ং। প্রিয়লালবাবুর রক্ষিতা ছিলেন সুশীলাসুন্দরী। সম্ভবতঃ

এই সুশীলাসুন্দরীই সার্কাসে রাধাপ্রসাদবাবুর তথ্যানুযায়ী বাঘের খেলা দেখাতেন। ইন্দুবালার মতে, প্রিয়লাল এই সার্কাসে ঘোড়া বাঘ এসব খেলার Ring Master ছিলেন। এই সার্কাস দলের ম্যানেজার ছিলেন প্রথমে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মিত্র। তাঁর মৃত্যুর পর তালতলার শ্রীযুক্ত বনমালি দাস বোসেস সার্কাসের বিজনেস ম্যানেজারের কার্য পরিচালনা করতেন [দ্রষ্টব্য : 'নাট্যমন্দির', বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ফাল্গুন ১৩১৭ পৃঃ ৬১০-৬২১, সার্কাসে ভূতের উপদ্রব (প্রোফেসর বসু কর্তৃক লিখিত) রচনা]। বাঁধন সেনগুপ্ত

(২)

সার্কাস ও সার্কাসে বাঙালী

শারদীয় মহানগরে শ্রী রাধাপ্রসাদ গুপ্তের 'সার্কাস ও সার্কাসে বাঙালী' প্রবন্ধটি পড়েছিলাম। মহানগরের ডিসেম্বর সংখ্যায় দেখলাম শ্রীবাঁধন সেনগুপ্ত একটি চিঠিতে রাধাপ্রসাদবাবুর দেওয়া কয়েকটি তথ্যের প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন। এ বিষয়ে আমার যেটুকু জানা আছে তা জানানোর উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখছি।

রাধাপ্রসাদবাবু তাঁর প্রবন্ধে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন, "আমার এই লেখায় বাঙালীর সার্কাস আর বিশেষ করে 'বোসেস সার্কাস' সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য দুটো বই থেকে নিয়েছি। সে দুটি হলো প্রোফেসর বোসের অসম্পূর্ণ স্মৃতিকথা—'অপূর্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত' (১৩০৯), আর অবনীকৃষ্ণ বসুর 'বাঙালীর সার্কাস' (১৩৪৫)"।

শ্রী গুপ্তের এই স্বীকারোক্তিটির মধ্যে একটি ছোট্ট ভুল আছে। 'বাঙালীর সার্কাসের' লেখকের নাম অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু 'অবনীকৃষ্ণ' নয়। এটি মুদ্রণ-প্রমাদ নয়, কারণ একাধিক জায়গায় 'অবনীকৃষ্ণ' নামটি উল্লিখিত হয়েছে। অবনীন্দ্রকৃষ্ণের কোন পরিচয় রাধাপ্রসাদবাবু দেননি, সম্ভবতঃ তার পরিচিতি শ্রীগুপ্তের জানা ছিল না। অবনীন্দ্র ছিলেন প্রোফেসর প্রিয়নাথ বসুর মধ্যম পুত্র। তিনি পেশায় ছিলেন শিল্পী। প্রিয়নাথের বাবা

মনোমোহন বসুর যে তৈলচিত্রটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে, সেটি অবনীন্দ্রকৃষ্ণেরই আঁকা। যাই হোক্‌, অবনীন্দ্রকৃষ্ণ প্রভূত পরিশ্রম করে, কাগজপত্র ঘেঁটে, বহু অনুসন্ধান করে 'বাঙালীর সার্কাস' বইটি লিখেছিলেন। তাই আজ প্রিয়নাথ বসু বা বাঙালীর সার্কাস সম্বন্ধে বইটি একটি অপরিহার্য প্রামাণিক আকর গ্রন্থ।

রাধাপ্রসাদবাবুর লেখার মধ্যে আর একটি ভুল আমার চোখে পড়েছে। তিনি যাদুকর গণপতিকে 'গণপতি সরকার' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর সঠিক নাম 'গণপতি চক্রবর্তী'।

এবার শ্রীবাঁধন সেনগুপ্তের চিঠির প্রসঙ্গে আসি। আগেই বলেছি, অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু ছিলেন প্রিয়নাথ বসুর পুত্র, তাই তাঁর তথ্যবহুল বইটিকে ভিত্তি করেই শ্রী সেনগুপ্তের প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা যাক:

১) রাধাপ্রসাদবাবু লিখেছেন, প্রিয়নাথ বসুর জন্ম ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রী সেনগুপ্ত এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দিহান। অবনীন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর বাবার জন্মতারিখ সম্বন্ধে সরাসরি কিছু লেখেননি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুকালের বিষয়ে লিখেছেন যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে ৫৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। অতএব হিসাব করে দেখলে প্রিয়নাথের জন্ম-সাল ১৮৬৫ নাগাদই দাঁড়াবে।

মতিলালের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে অবনীন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন, "বহুমূত্র রোগ সত্ত্বেও অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। (বাঙালীর সার্কাস, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৯১)। রাধাপ্রসাদবাবু ভুল করে ১৭ই ফেব্রুয়ারীর জায়গায় ১০ই ফেব্রুয়ারী লিখেছেন। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে অবনীন্দ্রবাবুর হিসাবে কোথাও গোলমাল হয়েছিল। তাঁর কথা অনুযায়ী মতিলালের জন্ম-সাল দাঁড়াচ্ছে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ, প্রিয়নাথের জন্ম-সাল হচ্ছে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। অথচ তিনিই বলেছেন, মতিলাল ছিলেন প্রিয়নাথের 'মধ্যমাগ্রজ'।

আমার মনে হয় ইন্দুবালার কথাই ঠিক। মতিলাল বসুর জন্ম ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩। অবনীন্দ্রবাবু ভুল করে ৪৩ লিখেছেন।

(২) রাধাপ্রসাদবাবু তাঁর প্রবন্ধের ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "এইভাবে দুই ভাই (মতিলাল ও প্রিয়নাথ) ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ অবদি একসঙ্গে কাজ করেন।" অথচ ৬৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "১৯০৭-এ মতিলালের সঙ্গে প্রোফেসর বোসের ব্যবসায়িক সম্পর্ক চুকে যায়" শ্রী সেনগুপ্ত এই দুটি উক্তির পরস্পর বিরোধিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। অবনীন্দ্রবাবুর লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে মতিলাল ও প্রিয়নাথ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একসঙ্গে ছিলেন, ১৯০৭ পর্যন্ত নয়।

(৩) শ্রী সেনগুপ্ত লিখেছেন যে প্রিয়নাথ বসুর প্রকৃত নাম প্রিয়লাল, প্রিয়নাথ নাম ভুল। 'বাঙালীর সার্কাস' বইতে কিন্তু সর্বত্র 'প্রিয়নাথ' নাম ব্যবহার করা হয়েছে। অবনীন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর বাবার সঠিক নাম জানতেন না একথা অবিশ্বাস্য। প্রিয়নাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসৌরেন বসু ও প্রিয়নাথের দৌহিত্র শ্রীভবানীপ্রসাদ দত্তের মুখে আমি 'প্রিয়নাথ' নামই শুনেছি।

(৪) শ্রী সেনগুপ্ত একটি চিঠি উদ্ধৃত করে মতিলাল বসুকে Great Bengal Circusএর স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করতে চেয়েছেন! 'বাঙালীর সার্কাসের' ৩২ পৃষ্ঠা থেকে আমি অন্য একটি চিঠির উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

RUNGPUR

10th December 1888

Most gladly I do hereby certify that Professor P. N. Bose's 'Great Bengal Circus company' performed prodigies of equestrian and gymnastic feats on the Durbur held at my Tajhat house. I engaged them for two nights, but was so highly pleased with their performances, that I could not but retain them for two nights more.

I shall be indeed happy to patronise their cause.

(Sd.) GOBINDALAL ROY

Raja of Rungpur

এই চিঠিতেই দেখা যাচ্ছে, গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস কোম্পানীকে 'প্রিয়নাথ

বসুর' বলা হয়েছে। এরকম একাধিক চিঠি অবনীন্দ্রবাবুর বইতে আছে। প্রিয়নাথ সার্কাসের মালিক না হলে এভাবে চিঠিগুলি লেখা হত কি? আমার অনুমান, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মতিলাল ও প্রিয়নাথ গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের যৌথ স্বত্বাধিকারী ছিলেন, কেউই একক মালিক ছিলেন না। এ বিষয়ে একটা কথা স্মর্তব্য। সার্কাসের প্রতিষ্ঠা প্রিয়নাথই করেছিলেন। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে তাঁর শৈথিল্য দেখে, তাঁর পিতা মনোমোহন মিতব্যয়ী মতিলালকে সহযোগী করে নিতে আদেশ দেন।

প্রাসঙ্গিক আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। শ্রীবাঁধন সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'প্রিয়লাল বসুর রক্ষিতা ছিলেন সুশীলাসুন্দরী'। রাজবালার সঙ্গেও কিন্তু মতিলালের সামাজিক বিয়ে হয়নি। মতিলাল কম্বুলিয়াটোলার বিখ্যাত কর বংশীয় কৃষ্ণচন্দ্র করের জ্যেষ্ঠা কন্যা অন্নদা মোহিনীকে বিয়ে করেছিলেন। মতিলাল ও অন্নদা মোহিনীর দুটি ছেলে ও চারটি মেয়ে হয়েছিল। তাঁদের বড় ছেলে মণিলাল কাকা প্রিয়নাথের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। সে কথা রাধাপ্রসাদ বাবু লিখেছেন। শেষ জীবনে মণিলাল সন্ন্যাসী হয়ে যান, তাঁর নাম হয় স্বামী বিজয় বাসুদেবানন্দ গিরি।

দেবাশিস বসু

কলকাতা-৭০০০১৯

(৩)

সার্কাস ও সার্কাসে বাঙালী

মহানগর পত্রিকায় (শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৯) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্ত রচিত 'সার্কাস ও সার্কাসে বাঙালী' শীর্ষক প্রবন্ধে আমার পিতৃদেব স্বর্গত প্রফেসর প্রিয়নাথ বসু সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাঁধন সেনগুপ্ত মহাশয় একটি বিস্তারিত চিঠি প্রকাশ করে তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেছেন। দুজনেরই লেখায় কোন কোন স্থলে তথ্যগত ত্রুটি থাকায় আমি এ সম্পর্কে সহৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(১) রাধাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যের জন্য

'বাঙালীর সার্কাস' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থটি আমার দাদা অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু কর্তৃক লিখিত এবং মৎ কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থের তথ্য গুপ্ত মহাশয়ের লেখায় বেশ কয়েক স্থানে উপেক্ষিত কিংবা বিকৃত হয়েছে।

(২) বাঁধনবাবু তাঁর চিঠিতে লিখেছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসুর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল "প্রিয়লাল বসু (প্রিয়নাথ নয় ,"। এ সম্পর্কে বাঁধনবাবুর ধারণা ঠিক নয়। আমার পিতৃদেবের আসল নাম ছিল প্রিয়নাথ বসু। আমাদের বংশ-তালিকা, জন্ম-পত্রিকা থেকে আরম্ভ করে বাড়ি-জমি সংক্রান্ত কাগজপত্রে তাঁর নাম প্রিয়নাথ বসু বলেই উল্লেখিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি সার্কাসের দল নিয়ে দেশেবিদেশে যেখানেই গেছেন সেখানে তাঁর ব্যবহৃত Visiting cardএ স্পষ্টভাবে লেখা থাকত 'প্রিয়নাথ বসু'। এখনো সেইসব পুরানো Visting card আমার কাছে সুগচ্ছিত আছে। মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরীতে এবং চিঠিপত্রে (অধ্যক্ষ ডঃ সুবোধ চৌধুরী মনোমোহন বসুর জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ডায়েরী ও চিঠিপত্র সংগ্রহ করেছেন) তাঁর পুত্রের নাম প্রিয়নাথ বসু হিসেবেই লিখিত হয়েছে।

(৩) মনোমোহনের মধ্যম পুত্র মতিলাল বসুর জন্মসন নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। বাঁধনবাবু ইন্দুবালা দেবীর সাক্ষ্যে এই জন্মসন ভুল ভাবে দিয়ে বলেছেন যে মতিলালের জন্ম ১৮৫৭ খ্রীঃ (১২৬৪ সালে)। ইন্দুবালা দেবীর এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না ; সম্ভবতঃ তিনি অন্য কারুর কাছ থেকে শুনে এই ভুলটি করেছিলেন। আসলে মতিলালের জন্ম হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। মতিলাল বসু প্রথম জীবনে নরেন্দ্রনাথ দত্তের (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) সহপাঠী ছিলেন। মতিলালের জন্মপত্রিকা ছাড়াও তাঁদের স্কুলের রেকর্ড থেকে এবং অন্যান্য তথ্য প্রমাণ থেকে স্পষ্টভাবে বলা চলে যে মতিলালের জন্ম হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রীঃ এবং মৃত্যু হয় ১৭-২-১৯১০ সালে।

স্বামীজি তাঁর পুরানো সহপাঠী মতিলাল সম্পর্কে একবার মন্তব্য করেছিলেন, **'Mati was doing greater work than perhaps any Bengali worker in setting an example in organisation**

and proving Bengali nerve and pluck which was more effective than articles and lectures' (দ্রঃ অমৃত বাজার পত্রিকা ১৭-১-১৯১০)।

(৪) বাঁধনবাবুর চিঠির এক স্থানে লেখা হয়েছে যে মতিলাল বসু বিবাহ করেছিলেন রাজবালা দেবীকে (ইন্দুবালা দেবীর মা), এ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একথা কেবল ইন্দুবালাই প্রচার করে থাকেন, কিন্তু তাঁর কাছে গিয়েও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমাদের পরিবারের এত বড় একটা ঘটনার কথা আমাদের সকলের কাছে কেন অজ্ঞাত রইল, এ কথার কোন প্রকৃত উত্তর ইন্দুবালা দেবী কিংবা তাঁর মতের সমর্থক কেউ দিতে পারেন নি। আসলে রাজবালা দেবী মতিলালের সার্কাসের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সবচেয়ে বেশী দিন ঐ দলে ছিলেন বলে সেকালের স্বার্থান্বেষীরা এরূপ গুজব ছড়াতে পারেন। মতিলালবাবুর পত্নীর নাম ছিল অন্নদা মোহিনী। ইনি কম্বুলিয়াটোলার বিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র করের কন্যা ছিলেন।

(৫) প্রিয়নাথ বসু সম্পর্কে এক স্থানে বলা হয়েছে যে সুশীলাসুন্দরী ছিলেন তাঁর রক্ষিতা। এ কথারও কোন ভিত্তি নেই। সুশীলাসুন্দরী প্রিয়নাথের সার্কাসের দলে বাঘের খেলা দেখাতেন। তিনি ১৯১২ সালে সার্কাসের রিঙ-এর মধ্যে বাঘের আক্রমণে আহত হন এবং বার বছর শয্যাশায়ী হয়ে কাটানোর পর ১৯২৪ সালে মারা যান। প্রিয়নাথ বসু মারা যান ১৯২০ সালে ২১শে মে তারিখে। প্রিয়নাথ বসুর সংগে সুশীলাসুন্দরীর ঘনিষ্ঠতার প্রশ্নটি কেবল অবান্তর নয়, অসৌজন্যমূলক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রিয়নাথ বসু দুটি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর প্রথমা পত্নীর নাম যোগেন্দ্র যোগিনী, দ্বিতীয় পত্নীর নাম সরযূবালা দেবী। আমার দাদা ৺ ফনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর ('প্রেমডোর, Modern thought' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা), মা ছিলেন যোগেন্দ্র যোগিনী দেবী এবং আমার মা ছিলেন সরযূবালা দেবী। আমার মা পরিণত বয়স পর্যন্ত জীবিতা ছিলেন।

(৬) রাধাপ্রসাদ বাবু সার্কাসের দল প্রসঙ্গে একজনের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ভুল করেছেন। তিনি তাঁর নাম লিখেছেন গণপতি সরকার ;

আসলে তাঁর নাম ছিল গণপতি চক্রবর্তী (বিখ্যাত যাদুকর)।

চিঠিটি দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ছোটখাটো তথ্যের বিকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করা গেল না। সুযোগ পেলে সেগুলি সম্পর্কেও আলোচনা করা যাবে।

শ্রীসৌরেন বসু, কলিকাতা-৭০০০০৮

পত্র তিনখানি প্রকাশিত হবার পর 'বাঙ্গালীর সার্কাস' গ্রন্থখানি হঠাৎ দেখবার সুযোগ পেয়েছি। দেখা যাচ্ছে, অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখিত এই গ্রন্থটির প্রকাশকাল লেখকের নিবেদনপত্রের সূত্রানুসারে ১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩। পাবলিসিটি ষ্টুডিও ৩৬৭ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীভুজঙ্গশেখর সিংহ* ও প্রিণ্টার শ্রীরথীন্দ্র কৃষ্ণ বসু। সেকালে গ্রন্থকার স্বয়ং অবনীন্দ্রকৃষ্ণ এটি সমালোচনার জন্যে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদককে ১৪ই শ্রাবণ ১৩৪৫ তারিখে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন। 'বাঙ্গালার নব্য ব্যায়ামশালার অন্যতম শিক্ষক ও সংগঠন কর্ত্তা, বাঙ্গালীর সার্কাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা' স্বর্গীয় প্রিয়নাথ বসু মহাশয়ের উদ্দেশে 'বাঙ্গালীর সার্কাস' উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। সেকালে গ্রন্থটির মূল্য ছিল ১।• (একটাকা চার আনা)। ভূমিকা লিখেছিলেন প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

দেবাশিস বসু তাঁর পত্রে জানিয়েছিলেন (২নং পত্র দ্রষ্টব্য), গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ। অথচ গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী এটির প্রকাশকাল ১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩। জানি না পরে অর্থাৎ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটির আরও কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা। তবে তাঁর পত্রের সূত্র ধরে এবং পরে এই গ্রন্থের মাধ্যমে প্রিয়নাথ বসু নামটি যে সঠিক তা জানতে পেরেছি। এজন্য আমি দেবাশিস বসু ও শ্রীসৌরেন বসুর প্রতি কৃতজ্ঞ। অন্যদিকে গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস দলের প্রকৃত মালিক কে ছিলেন এ সম্পর্কে দ্বিধা এখনো বর্তমান। এই গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী, 'এইবার প্রোফেসর বসুর মধ্যমাগ্রজ

---

*সৌরেন বসু তাঁর পত্রে এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবশ্য লিখেছিলেন, 'এই গ্রন্থটি আমার বাবা ৺অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু কর্তৃক লিখিত এবং মৎ কর্তৃক প্রকাশিত।'

মতিলাল বসুর কথা বলিব। ইনি সাহিত্যামোদী ও সঙ্গীতরসিক ছিলেন। ইনি 'চারি চিত্র' নামক উপন্যাস রচনা করিয়া এবং কয়েক বৎসর 'গান ও গল্প' নামে এক পাক্ষিক পত্র সম্পাদন করিয়া তৎকালে সুনাম অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। তিনি খুব 'কড়া' প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং এরূপ তেজীয়ান ও স্পষ্টবাদী ছিলেন যে, ব্যবসা সংক্রান্ত আদান প্রদানে এবং কর্মচারী প্রভৃতির সহিত ব্যবহারে যে প্রীতি ও সহানুভূতির সহযোগ ও সুকৌশল আবশ্যক তাহা তাঁহার ধাতুতে ছিল না। এইজন্যই বোধহয় তিনি তাঁহার যৌবনে কয়েকবার কয়েকটি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তবে তিনি টাকাকড়ির ব্যাপারে এবং হিসাবপত্র বিষয়ে খুব সতর্ক ছিলেন, ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা কম প্রয়োজনীয় নহে। পক্ষান্তরে প্রিয়নাথ ব্যয় সম্বন্ধে কতকটা শিথিল প্রকৃতির কিন্তু পরিশ্রমী, কর্ম্মকুশল ও জনপ্রিয় ছিলেন।

এই দুই ভ্রাতার দুইরূপ প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া এবং প্রিয়নাথকে একা এই সার্কাস পরিচালনার বিপুল দায়িত্ব লইয়া নানারূপে বিব্রত অথচ কিছুতেই সার্কাস ব্যবসায় হইতে ফিরাইবার উপায় নাই বুঝিয়া, তাঁহাদিগের পিতা মতিলালকে প্রিয়নাথের সহিত মিলিত হইয়া দুইজনে একযোগে কাজ করিবার উপদেশ দেন। মতিলাল সম্মত হন। শুভ মুহূর্তে তিনি 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে' যোগদান করেন।

মতিলালকে পাইয়া প্রিয়নাথের বল বাড়িয়া গেল, অর্থাৎ টাকাকড়ির দায়িত্ব, আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র প্রভৃতি বিষয় হইতে কতকটা অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি খেলোয়াড়দিগকে ও জন্তু-জানওয়ারগুলিকে শিক্ষাদান, খেলার জন্য নূতন নূতন যন্ত্রপাতির নির্ম্মাণ, তাম্বু ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত, বিজ্ঞাপন রচনা, কার্য পরিচালনা, রাজন্যবর্গ এবং ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট গমনাগমন এবং সর্ব্বোপরি নূতন নূতন খেলার উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে নিশ্চিন্তভাবে মনোনিবেশপূর্ব্বক দলটিকে মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিলেন। এইরূপে দুই ভ্রাতা মিলিত ভাবে কাজ করায় 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' উন্নতির শিখরে আরোহণ করিল।

ভবিষ্যৎকালে নানা কারণে একাধিক বার দুই ভ্রাতা পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র দল চালাইয়াছিলেন এবং কিছুকাল না যাইতেই আবার উভয়ে মিলিত হইয়া ছিলেন। দেখা গিয়াছে, যখনই উভয় ভ্রাতা একত্র হইয়াছেন, তখনই দল সমধিক গৌরব ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।' (পৃঃ ১৮-২০, বাঙ্গালীর সার্কাস)।

সতর্ক পাঠক মাত্রেরই নজরে পড়বে যে অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু অলক্ষ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠতাত মতিলাল সম্পর্কে যেসব উক্তি করেছেন তা কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিহীন। কেননা যৌবনে যিনি 'কয়েকবার কয়েকটি ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই' তাঁকে পিতা মনোমোহন শুধুমাত্র 'টাকাকড়ি ব্যাপারে এবং হিসাবপত্র বিষয়ে খুব সতর্ক ছিলেন' বলে ছোট ছেলের ব্যবসায়ে যোগ দিতে বললেন এবং প্রিয়নাথ যিনি 'ব্যয় সম্বন্ধে কতকটা শিথিল-প্রকৃতির কিন্তু পরিশ্রমী, কর্মকুশল ও জনপ্রিয়' তিনিও তাঁর নিজের সার্কাসে দাদা মতিলালের ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কথা জেনেও গ্রহণ করতে রাজী হলেন এ কথা কি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য? তাহলে এখন প্রশ্ন, গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের প্রকৃত মালিকানা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কার ছিল? একা প্রিয়নাথের না মতিলালের, না কি দু'জনেই পরে যৌথভাবে এর মালিক ছিলেন?

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত এবং সৌরেন বসুর মতে প্রিয়নাথই এই সার্কাসের একমাত্র মালিক। অবনীন্দ্রবাবুর গ্রন্থের বক্তব্যে মালিকানার প্রশ্নটি উপরোক্ত অংশে অনুপস্থিত। ইন্দুবালার মতে, গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের মালিক ছিলেন স্বয়ং মতিলাল অর্থাৎ তাঁর বাবা। ১৯০৫ খ্রীঃ ৩রা জানুয়ারীর তারিখ চিহ্নিত Classic Theatreএর মুদ্রিত বিজ্ঞাপনেও মতিলাল বসুকেই Proprietor, Great Bengal Circus বলে প্রচারিত করা হয়েছে। দেবাশিস বাবু অবশ্য তাঁর পত্রে Raja of Rungpurএর প্রদত্ত ১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৮ খ্রীঃ এর একটি প্রশস্তিনামার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে Professor P. N. Bose's 'Great Bengal Circus Company' কথাটি উল্লেখিত। বলাবাহুল্য এটি চিঠি নয়, একটি প্রশংসাপত্র বা Certificate মাত্র। এ রকম আরও বেশ কয়েকটি প্রশংসাপত্র অবনীন্দ্রকৃষ্ণ

তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন, যা থেকে একমাত্র দেবাশিসবাবু তাঁর একটি পত্রে ব্যবহার করেছেন। যাই হোক দেবাশিসবাবুও কিন্তু নিজেই পত্রের শেষ দিকে তাঁর অনুমানের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, 'আমার অনুমান, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মতিলাল ও প্রিয়নাথ বেঙ্গল সার্কাসের যৌথ স্বত্বাধিকারী ছিলেন, কেউই একক মালিক ছিলেন না।' আর প্রিয়নাথের নাতি শ্রীসৌরেন বসু তাঁর পত্রে এ প্রসঙ্গে কিছুই উল্লেখ করেননি।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, তবে কি 'ভবিষ্যৎকালে নানা কারণে একাধিকবার দুই ভ্রাতা পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল চালাইয়া ছিলেন এবং কিছুকাল না যাইতেই আবার উভয়ে মিলিত হইয়াছিলেন' বলে অবনীন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর গ্রন্থে যে কথা বলেছেন তাই গ্রহণযোগ্য? কেননা এই সার্কাস কবে প্রকৃতপক্ষে প্রথম খোলা হয় এবং কতবার মতিলাল এবং প্রিয়নাথ পৃথক হয়ে স্বতন্ত্রভাবে দল চালিয়েছিলেন তারও কোন উল্লেখ কোথাও নেই। এটা থাকলে ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে সার্কাসের মালিক মতিলাল ছাড়া যে অন্য কেউ ছিলেন কিনা তা যাচাই করা সহজ হতো। এছাড়া পিতা মনোমোহনের মৃত্যুর (রবিবার ৪ঠা ফেব্রু' ১৯১২) আগে যদি বোসেস সার্কাস ১৯০৭ সালে রাধাপ্রসাদবাবুর তথ্যানুযায়ী মতিলাল বসুর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে তখন মনোমোহনবাবুর ভূমিকাটি কি ছিল? সৌরেন বসুর পত্র অনুসারে মতিলালের মৃত্যুর তারিখ ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০। ইন্দুবালাও আমায় তাঁর ডায়েরী থেকে তথ্য মিলিয়ে জানিয়েছেন যে তাঁর পিতা মতিলাল বসুর মৃত্যু হয়েছিল ৫ই ফাল্গুন ১৩১৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯১০ সাল (বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ৫৫ মিঃ)। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে রাধাপ্রসাদবাবুর কথিত মতিলালের মৃত্যুর ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ খ্রীঃ তারিখটিও সঠিক নয়। সুতরাং এ কথাও নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রিয়নাথের সঙ্গে মতিলাল কখনোই 'এইভাবে দুই ভাই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ অবদি একসঙ্গে কাজ করেননি।'

দ্বিতীয়তঃ প্রোফেসর বোস আসলে কে? মতিলাল না প্রিয়নাথ? প্রিয়নাথ বসুর পুত্র অবনীন্দ্রকৃষ্ণ সব সময় 'বাঙ্গালার নব্য ব্যায়ামশালার অন্যতম শিক্ষক ও সংগঠন কর্তা, বাঙ্গালীর সার্কাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা'

প্রিয়নাথ বসুকেই 'প্রোফেসর বোস' বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, Classic Theatreএর শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হ্যাণ্ডবিলে Great Bengal Circusএর Proprietor শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল বসুকে প্রোফেসর বোস বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইন্দুবালা দেবী যিনি এখনও একমাত্র জীবিত সাক্ষী আছেন তাঁর বক্তব্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনিও লিখেছেন, 'সে সময় আর এক নাম করা সার্কাস দল ছিল। লোকে বলত প্রোফেসর বোসের 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'। মালিকের পুরো নাম মতিলাল বোস অর্থাৎ আমার বাবা'। পাশাপাশি অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখিত 'বাঙ্গালীর সার্কাস' গ্রন্থে রংপুরের রাজা গোবিন্দলাল রায়ের প্রশংসাপত্র (১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৮) Sir Michael Filose, Lt. Col., K. C. S. S.' Secretary, Gwallior State and Late Governor of Malwa প্রদত্ত সার্টিফিকেট (২৯শে জুন ১৮৯৬), Amar Singh, Raja, K. C. S. I. Vice President of Council, Jammu and Kashmir State প্রদত্ত প্রশংসাপত্র (২রা ডিসেম্বর ১৮৯৭) অর্থাৎ মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে প্রিয়নাথের নাম প্রোফেসর বসু হিসেবে চিহ্নিত ছিল। অন্যদিকে, গ্রন্থে সর্বমোট যে পঁচিশটি প্রশংসাপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার বাকি বাইশটিতেই সার্কাসের মালিকের কোন নাম উল্লেখিত হয়নি। এগুলিতে কেবলমাত্র বোসেস সার্কাস বা প্রোফেসর বোস সম্বোধনটিই ব্যবহৃত। আবার 'সার্কাসে ভূতের উপদ্রব' রচনা যা ধারাবাহিক ভাবে 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লেখকের নাম 'প্রোফেসর বসু' হিসেবে নামাঙ্কিত হয়েছে। এর প্রকাশকাল ১৯১০ খ্রীঃ। সুতরাং এ থেকেও নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে না যে ইনিই স্বয়ং প্রিয়নাথ বসু। এছাড়া মতিলাল সে বছরই ৫ই ফাল্গুন প্রাণত্যাগ করেছিলেন। এ অবস্থায় আনুমানিক ভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে দেবাশিস বাবুর অনুমানই কিছুটা হয়ত সত্য। অর্থাৎ '১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মতিলাল ও প্রিয়নাথ গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের যৌথ স্বত্বাধিকারী ছিলেন। কেউই একক মালিক ছিলেন না।'

অন্যদিকে, সুশীলাসুন্দরী যে গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে ছিলেন এবং বাঘের

খেলায় অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিলেন সেকথা ঠিক। অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুও তাঁর গ্রন্থে সেকথা বিস্তৃতভাবে লিখেছিলেন। বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সুশীলাসুন্দরী আহত অবস্থায় দীর্ঘ বারো বছর শয্যাশায়ী হয়ে কাটাবার পর অবশেষে যে ১৯২৪ সালে মারা যান একথাও ঠিক। প্রিয়নাথের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট মহলে এখনও প্রচারিত বলেই তা লিখেছিলাম। অবশ্য এ জাতীয় সম্পর্কের কোন প্রমাণপত্র যে থাকে না তা সকলেই জানেন। তবু সৌজন্যের প্রশ্নেই এ প্রসঙ্গ থেকে বিরত থাকা শোভনীয় ভেবে এ প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ নিঃপ্রয়োজন। সুশীলাসুন্দরীর অবদান সার্কাসের ক্ষেত্রে অপরিসীম। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে আরো জানা যায় যে, সুশীলাসুন্দরীর দুটি কন্যা ছিল। সুশীলার বোনের নাম ছিল কুমুদিনী। কন্যা মুলতান (টনি) অমর দত্তের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন। কুমুদিনীও সার্কাসে খেলা দেখাতেন। পরে কবিরাজ নগেন সেন তাঁকে আশ্রয় দান করেন এবং রামবাগান অঞ্চলে নাকি চারখানা বাড়িও তাঁকে দান করেছিলেন।

যাই হোক্, অবনীন্দ্রকৃষ্ণের গ্রন্থে সার্কাসের অনেক শিল্পী বা খেলোয়াড় সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু সৌরেন বসু কথিত 'আসলে রাজবালা দেবী মতিলালের সার্কাসের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সবচেয়ে বেশীদিন ঐ দলে ছিলেন বলে সেকালের স্বার্থান্বেষীরা এরূপ গুজব ছড়াতে পারেন, বলে যে কথা উল্লেখ হয়েছে তাঁর অর্থাৎ রাজবালা সম্পর্কেও সেই গ্রন্থে আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বিত হয়েছে। সতর্ক পাঠকের নিশ্চয়ই নজরে পড়বে যে সৌরেন বসুও লিখেছেন যে, 'আসলে রাজবালা দেবী মতিলালের সার্কাস দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তিনি সবচেয়ে বেশীদিন ঐ দলে ছিলেন...'। এ ক্ষেত্রে মতিলালের সার্কাস দল কোন্‌টি? নিশ্চয়ই তাঁর পিতা প্রিয়নাথের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস দলকেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। তা না হলে মতিলালের আলাদা কোন সার্কাস দল ছিল যেখানে রাজবালা দীর্ঘকাল খেলা দেখিয়েছেন, এবং তবে কি এই কারণেই অবনীন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর গ্রন্থে অনেকের কথা লিখলেও রাজবালা সম্পর্কে কোন উল্লেখই করেননি? যদিও দেখা যাচ্ছে 'সার্কাসে ভূতের উপদ্রব' রচনার মধ্যে ফুটনোটে রাজবালার

ভাই তিনকড়ি দাসের নাম এবং ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। রাজবালা সবচেয়ে বেশীদিন সার্কাসের সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও 'বাঙ্গালীর সার্কাস' গ্রন্থে কোথাও রাজবালার নাম উল্লেখ না হওয়াটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার।

এবার মতিলাল ও ইন্দুবালার সম্পর্ক প্রসঙ্গে আসা যাক। দীর্ঘকাল ধরে ইন্দুবালা বাংলা গানের জগতে, নাটকে ও চলচ্চিত্রে সাফল্যের গুণে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিতা। সর্বভারতীয় সঙ্গীত জগতেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর চুরাশী বছরের জীবনে তিনি তাঁর পরিচিতিতে সর্বত্রই মতিলাল বসুকেই তাঁর পিতা বলে উল্লেখ করে এসেছেন। দীর্ঘজীবনে প্রকাশিত অজস্র সাক্ষাৎকার এবং সংক্ষিপ্ত জীবনীতে আজও ইন্দুবালার পিতা হিসেবে মতিলাল বসুর নামই উল্লেখিত হয়ে থাকে। অবশ্য একথা ঠিক যে, ইন্দুবালা নিজেই একথাও স্বীকার করে এসেছেন যে মতিলালের হাতিবাগান (ভল্লুকবাগান) অঞ্চলে যে বাড়ি ছিল সেখানেই তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে প্রধানতঃ বসবাস করতেন। এমন কি মতিলাল যে কম্বুলিয়াটোলার বিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র করের কন্যা অন্নদামোহিনী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন এ তথ্যও ইন্দুবালার অজ্ঞাত নয়। ইন্দুবালার তথ্যানুযায়ী এটর্নী পণ্টু করের বোন অন্নদামোহিনীকেও মতিলাল বিবাহ করেছিলেন। বিডন স্ট্রীটের পাগলা বাবু অর্থাৎ সর্বানন্দ বসাকের সিঁথির বাগান বাড়িতে ইন্দুবালার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও আলাপ হয়েছিল। পণ্টু কর ইন্দুবালার সঙ্গে মতিলালের সম্পর্কের কথাও জানতেন। ইন্দুবালার মতে, উজ্জয়িনীতে মতিলাল রাজবালাকে গ্রহণ করার পর বছর ছয়েক বাদে মতিলালের সঙ্গে রাজবালার সম্পর্ক বা যোগাযোগের সমাপ্তি ঘটে। পরস্পরের বিচ্ছেদের স্পষ্ট কোন কারণ জানা না থাকলেও ইন্দুবালার ধারণা, মা রাজবালা সার্কাসে ফিরে যাবার উৎসাহ হারিয়েছিলেন এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। যদিও রাজবালার ভরণপোষণ বা কন্যা ইন্দুবালার জন্যে মতিলালের উদ্বেগ বা চিন্তার অভাব ছিলনা। সেই কারণেই রাজবালাকে একটি বাড়ি এবং ইন্দুবালার জন্যে মাসিক ২০ টাকা নিয়মিতভাবে মতিলাল মনসাবাবুর মাধ্যমে পাঠাতেন। রাজবালা প্রথমে ভূপেন্দ্রনাথ দাস দে (মজুমদার) বা ভূপে মজুমদারের কাছে এবং পরে জীবনকৃষ্ণ ঘোষের আশ্রয়ে চলে আসার পর

টাকা পাঠানো মতিলালই বন্ধ করে দেন। ইন্দুবালার বয়স তখন ছয় অর্থাৎ ১৯০৫ সাল। *

এখন কথা হচ্ছে, মতিলাল-রাজবালার প্রবাসে উজ্জয়িনীতে বিবাহ করার সংবাদ হাতিবাগানে অন্নদামোহিনী বা তাঁর পরিবারের কাছে কেন অজ্ঞাত রইল সে কথা সৌরেন বাবুরও হয়ত জানার কথা নয়। কেন না এ ঘটনা তো সম্ভবতঃ তাঁরও জন্মের পূর্বের ঘটনা। তাছাড়া এ জাতীয় বিবাহ তো সেকালে অসংখ্য পরিবারেই দেখা যেত। আর তথ্য-প্রমাণবিহীন এই সব সত্য ঘটনার কথা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সব সময় জ্ঞাত থাকে না। ইন্দুবালা নিশ্চয়ই সব জেনেশুনে অকারণে মতিলাল বসুর নাম আজীবন উল্লেখ করতে যাননি। এমন কি এতকাল ধরে সেকালের স্বার্থান্বেষীরা গুজব ছড়াবেন এটাই বা কতখানি সত্য? তাছাড়া ইন্দুবালা কোন দাবী না করেও মিছেমিছি এই সংবাদ শুধুমাত্র মতিলালের নামে প্রচার করতে যাবেন কেন? মতিলালের দুই পুত্র মণিলাল এবং স্নেহলাল সম্পর্কেও তিনি খবরাখবর রাখেন। দেবাশিস বাবু এই মণিলাল সম্পর্কেই লিখেছেন যে, 'বড় ছেলে মণিলাল কাকা প্রিয়নাথের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন।' সে কথা রাধাপ্রসাদবাবুও লিখেছেন, শেষ জীবনে মণিলাল সন্ন্যাসী হয়ে যান, তাঁর নাম হয় স্বামী বিজয় বাসুদেবানন্দ গিরি'। ইন্দুবালার বাড়ির কাছাকাছি একটি বাড়িতে মতিলালের দুই পুত্রেরও যাতায়াত ছিল। ইন্দুবালার স্মৃতি অনুযায়ী রাজবালাকে লেখা স্বামী মতিলালের কয়েকটি চিঠিপত্রও ছিল। রাজবালাই মৃত্যুর আগে সম্ভবতঃ অভিমানভরে সেগুলি নষ্ট করে ফেলেন। চিঠিগুলি থাকলে এ বিষয়ে আরও স্পষ্টভাবে আলোকপাত করা সম্ভব হত। অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর গ্রন্থটিতে মতিলাল বসুর একটি বিশেষ গুণের সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন সার্কাসের মধ্যে বাঘের খেলা দেখানোর পূর্বে মতিলালের রচিত গানও গাওয়া হত। বাঘের খেলাতে সুশীলাসুন্দরীর পরেই স্থান ছিল মৃন্ময়ী নামের এক মহিলা খেলোয়াড়ের। মৃন্ময়ী সম্পর্কে তখনকার দিনে Statesman পত্রিকা (৯ই ডিসেম্বর ১৯০৬) মন্তব্য করেছিলেন—**Miss Mrinmoyee introduces a sensation in which a**

* ইন্দুবালার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২৮শে এপ্রিল ১৯৮৩

tiger perched on a splendid tusker is the chief attraction…

'Bandemataram' পত্রিকাতেও মৃন্ময়ীকে উদ্দেশ্য করে অনুরূপ প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হয়। যেমন—It was one inspiring even to dream that the most ferocious of all the beasts could be so trained and that by the Bengalee girls who was proverbially dubbed cowards. (২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৬)।

অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর তথ্যানুযায়ী এই খেলার পূর্ব্বে গাহিবার জন্য মতিলাল বসু একটি গানও রচনা করিয়াছিলেন,—

জানে বিশ্বজন,
বুঝে আমরণ
হইলে মিলন
ব্যাঘ্র বারণে!
দেখ তাহা ভুল,
জগতে অতুল
দ্বিরদে শার্দ্দুল
বন্ধু বন্ধনে।
কাঁদায়ে কল্পনা,
গজে বাঘাসনা
বঙ্গ বীরাঙ্গনা
বরে মরণে।

[বাঙ্গালীর সার্কাস পৃঃ ৪৪-৪৫]

প্রোফেসর বসুর 'সার্কাসে ভূতের উপদ্রব' রচনার নীচে ফুটনোটে প্রদত্ত তথ্য থেকেও বোসেস সার্কাসের ব্যাপারে অনেক খবরাখবর পাওয়া যায়। 'নাট্যমন্দির' ফাল্গুন ১৩১৭ সংখ্যায় প্রাপ্ত তথ্যগুলি নিম্নরূপ :

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মিত্রের বাড়ী কলিকাতা সিমলা ষ্ট্রীটস্থ মধু রায়ের গলি। পূর্বে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসে কর্ম করিতেন। পরে আমাদের এই সার্কাসে ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হন। তিনি এখন মৃত।

উদ্দেশ্যে Classic Theatreএর পক্ষ থেকে একটি হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হয়েছিল। তাতে একপিঠে প্রোফেসর বোসের সার্কাসে সময় পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি ও অপর পৃষ্ঠায় ছাপা ছিল,—

Classic Theatre
৩-১-০৫

শ্রদ্ধাস্পদ পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল বসু
Proprietor, GREAT BENGAL CIRCUS.
পূজ্যপাদ মতিবাবু মহাশয়,

"এখন বেশ বুঝিয়াছি, পূর্ব হইতে যে স্নেহচক্ষে আমাকে দেখিয়া আসিতেন, সেই নিঃস্বার্থ স্নেহ প্রবণতা এখনও সমভাবে বর্তমান।......

স্নেহাকাঙ্ক্ষী,
(স্বাঃ) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত
3-1-05

মূল প্রতিলিপিটি আমার কাছে আছে। সুতরাং বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অবশ্যই মতিলাল বসু Great Bengal Circusএর মালিক ছিলেন। ফলে প্রিয়লালের সার্কাসে (প্রিয়নাথ নয়) 'আয়ব্যয়ের হিসাবনিকাশ দেখার ভার নেন' একথাও ঠিক নয়। তা ছাড়া প্রিয়লালের মেজদা নিশ্চয়ই ছোট ভাইয়ের চেয়ে বয়সে বড়ো, তাহলে রাধাপ্রসাদবাবুর তথ্যানুযায়ী মতিলালও ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন, অথচ দেখা যাচ্ছে তিনিই আবার লিখেছেন, 'প্রিয়নাথ বোসের জন্ম ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। নিশ্চয়ই কোথাও গুরুতর ভুলচুক থেকেই এই বিপত্তি।

যাই হোক ইন্দুবালা এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর মুখে শুনেছি মতিলাল বসুর জন্ম বাংলা ১২৬৪-তে, অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, এবং মতিলাল ও প্রিয়লাল গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মালিক ছিলেন মতিলাল স্বয়ং। প্রিয়লালবাবুর রক্ষিতা ছিলেন সুশীলাসুন্দরী। সম্ভবতঃ

এই সুশীলাসুন্দরীই সার্কাসে রাধাপ্রসাদবাবুর তথ্যানুযায়ী বাঘের খেলা দেখাতেন। ইন্দুবালার মতে, প্রিয়লাল এই সার্কাসে ঘোড়া বাঘ এসব খেলার Ring Master ছিলেন। এই সার্কাস দলের ম্যানেজার ছিলেন প্রথমে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মিত্র। তাঁর মৃত্যুর পর তালতলার শ্রীযুক্ত বনমালি দাস বোসেস সার্কাসের বিজনেস ম্যানেজারের কার্য পরিচালনা করতেন [দ্রষ্টব্য: 'নাট্যমন্দির', বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ফাল্গুন ১৩১৭ পৃঃ ৬১০-৬২১, সার্কাসে ভূতের উপদ্রব (প্রোফেসর বসু কর্তৃক লিখিত) রচনা]। বাঁধন সেনগুপ্ত

(২)
সার্কাস ও সার্কাসে বাঙালী

শারদীয় মহানগরে শ্রী রাধাপ্রসাদ গুপ্তের 'সার্কাস ও সার্কাসে বাঙালী' প্রবন্ধটি পড়েছিলাম। মহানগরের ডিসেম্বর সংখ্যায় দেখলাম শ্রীবাঁধন সেনগুপ্ত একটি চিঠিতে রাধাপ্রসাদবাবুর দেওয়া কয়েকটি তথ্যের প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন। এ বিষয়ে আমার যেটুকু জানা আছে তা জানানোর উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখছি।

রাধাপ্রসাদবাবু তাঁর প্রবন্ধে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন, "আমার এই লেখায় বাঙালীর সার্কাস আর বিশেষ করে 'বোসেস সার্কাস' সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য দুটো বই থেকে নিয়েছি। সে দুটি হলো প্রোফেসর বোসের অসম্পূর্ণ স্মৃতিকথা—'অপূর্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত' (১৩০৯), আর অবনীকৃষ্ণ বসুর 'বাঙালীর সার্কাস' (১৩৪৫)"।

শ্রী গুপ্তের এই স্বীকারোক্তিটির মধ্যে একটি ছোট্ট ভুল আছে। 'বাঙালীর সার্কাসের' লেখকের নাম অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু 'অবনীকৃষ্ণ' নয়। এটি মুদ্রণ-প্রমাদ নয়, কারণ একাধিক জায়গায় 'অবনীকৃষ্ণ' নামটি উল্লিখিত হয়েছে। অবনীন্দ্রকৃষ্ণের কোন পরিচয় রাধাপ্রসাদবাবু দেননি, সম্ভবতঃ তার পরিচিতি শ্রীগুপ্তের জানা ছিল না। অবনীন্দ্র ছিলেন প্রোফেসর প্রিয়নাথ বসুর মধ্যম পুত্র। তিনি পেশায় ছিলেন শিল্পী। প্রিয়নাথের বাবা

মনোমোহন বসুর যে তৈলচিত্রটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে, সেটি অবনীন্দ্রকৃষ্ণেরই আঁকা। যাই হোক্, অবনীন্দ্রকৃষ্ণ প্রভূত পরিশ্রম করে, কাগজপত্র ঘেঁটে, বহু অনুসন্ধান করে 'বাঙালীর সার্কাস' বইটি লিখেছিলেন। তাই আজ প্রিয়নাথ বসু বা বাঙালীর সার্কাস সম্বন্ধে বইটি একটি অপরিহার্য প্রামাণিক আকর গ্রন্থ।

রাধাপ্রসাদবাবুর লেখার মধ্যে আর একটি ভুল আমার চোখে পড়েছে। তিনি যাদুকর গণপতিকে 'গণপতি সরকার' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর সঠিক নাম 'গণপতি চক্রবর্তী'।

এবার শ্রীবাঁধন সেনগুপ্তের চিঠির প্রসঙ্গে আসি। আগেই বলেছি, অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু ছিলেন প্রিয়নাথ বসুর পুত্র, তাই তাঁর তথ্যবহুল বইটিকে ভিত্তি করেই শ্রী সেনগুপ্তের প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা যাক:

১) রাধাপ্রসাদবাবু লিখেছেন, প্রিয়নাথ বসুর জন্ম ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রী সেনগুপ্ত এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দিহান। অবনীন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর বাবার জন্মতারিখ সম্বন্ধে সরাসরি কিছু লেখেননি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুকালের বিষয়ে লিখেছেন যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে ৫৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। অতএব হিসাব করে দেখলে প্রিয়নাথের জন্ম-সাল ১৮৬৫ নাগাদই দাঁড়াবে।

মতিলালের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে অবনীন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন, "বহুমূত্র রোগ সত্ত্বেও অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। (বাঙালীর সার্কাস, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৯১)। রাধাপ্রসাদবাবু ভুল করে ১৭ই ফেব্রুয়ারীর জায়গায় ১০ই ফেব্রুয়ারী লিখেছেন। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে অবনীন্দ্রবাবুর হিসাবে কোথাও গোলমাল হয়েছিল। তাঁর কথা অনুযায়ী মতিলালের জন্ম-সাল দাঁড়াচ্ছে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ, প্রিয়নাথের জন্ম-সাল হচ্ছে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। অথচ তিনিই বলেছেন, মতিলাল ছিলেন প্রিয়নাথের 'মধ্যমাগ্রজ'।

আমার মনে হয় ইন্দুবালার কথাই ঠিক। মতিলাল বসুর জন্ম ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩। অবনীন্দ্রবাবু ভুল করে ৪৩ লিখেছেন।

(২) রাধাপ্রসাদবাবু তাঁর প্রবন্ধের ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "এইভাবে দুই ভাই (মতিলাল ও প্রিয়নাথ) ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ অবদি একসঙ্গে কাজ করেন।" অথচ ৬৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "১৯০৭-এ মতিলালের সঙ্গে প্রোফেসর বোসের ব্যবসায়িক সম্পর্ক চুকে যায়।" শ্রী সেনগুপ্ত এই দুটি উক্তির পরস্পর বিরোধিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। অবনীন্দ্রবাবুর লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে মতিলাল ও প্রিয়নাথ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একসঙ্গে ছিলেন, ১৯০৭ পর্যন্ত নয়।

(৩) শ্রী সেনগুপ্ত লিখেছেন যে প্রিয়নাথ বসুর প্রকৃত নাম প্রিয়লাল, প্রিয়নাথ নাম ভুল। 'বাঙালীর সার্কাস' বইতে কিন্তু সর্বত্র 'প্রিয়নাথ' নাম ব্যবহার করা হয়েছে। অবনীন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর বাবার সঠিক নাম জানতেন না একথা অবিশ্বাস্য। প্রিয়নাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসৌরেন বসু ও প্রিয়নাথের দৌহিত্র শ্রীভবানীপ্রসাদ দত্তের মুখে আমি 'প্রিয়নাথ' নামই শুনেছি।

(৪) শ্রী সেনগুপ্ত একটি চিঠি উদ্ধৃত করে মতিলাল বসুকে Great Bengal Circusএর স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করতে চেয়েছেন! 'বাঙালীর সার্কাসের' ৩২ পৃষ্ঠা থেকে আমি অন্য একটি চিঠির উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

RUNGPUR

10th December 1888

Most gladly I do hereby certify that Professor P. N. Bose's 'Great Bengal Circus company' performed prodigies of equestrian and gymnastic feats on the Durbur held at my Tajhat house. I engaged them for two nights, but was so highly pleased with their performances, that I could not but retain them for two nights more.

I shall be indeed happy to patronise their cause.

(Sd.) GOBINDALAL ROY

Raja of Rungpur

এই চিঠিতেই দেখা যাচ্ছে, গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস কোম্পানীকে 'প্রিয়নাথ

বসুর' বলা হয়েছে। এরকম একাধিক চিঠি অবনীন্দ্রবাবুর বইতে আছে। প্রিয়নাথ সার্কাসের মালিক না হলে এভাবে চিঠিগুলি লেখা হত কি? আমার অনুমান, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মতিলাল ও প্রিয়নাথ গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের যৌথ স্বত্বাধিকারী ছিলেন, কেউই একক মালিক ছিলেন না। এ বিষয়ে একটা কথা স্মর্তব্য। সার্কাসের প্রতিষ্ঠা প্রিয়নাথই করেছিলেন। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে তাঁর শৈথিল্য দেখে, তাঁর পিতা মনোমোহন মিতব্যয়ী মতিলালকে সহযোগী করে নিতে আদেশ দেন।

প্রাসঙ্গিক আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। শ্রীবাঁধন সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'প্রিয়লাল বসুর রক্ষিতা ছিলেন সুশীলাসুন্দরী'। রাজবালার সঙ্গেও কিন্তু মতিলালের সামাজিক বিয়ে হয়নি। মতিলাল কম্বুলিয়াটোলার বিখ্যাত কর বংশীয় কৃষ্ণচন্দ্র করের জ্যেষ্ঠা কন্যা অন্নদা মোহিনীকে বিয়ে করেছিলেন। মতিলাল ও অন্নদা মোহিনীর দুটি ছেলে ও চারটি মেয়ে হয়েছিল। তাঁদের বড় ছেলে মণিলাল কাকা প্রিয়নাথের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। সে কথা রাধাপ্রসাদ বাবু লিখেছেন। শেষ জীবনে মণিলাল সন্ন্যাসী হয়ে যান, তাঁর নাম হয় স্বামী বিজয় বাসুদেবানন্দ গিরি।

দেবাশিস বসু

কলকাতা-৭০০০১৯

(৩)

সার্কাস ও সার্কাসে বাঙালী

মহানগর পত্রিকায় (শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৯) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্ত রচিত 'সার্কাস ও সার্কাসে বাঙালী' শীর্ষক প্রবন্ধে আমার পিতৃদেব স্বর্গত প্রফেসর প্রিয়নাথ বসু সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাঁধন সেনগুপ্ত মহাশয় একটি বিস্তারিত চিঠি প্রকাশ করে তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেছেন। দুজনেরই লেখায় কোন কোন স্থলে তথ্যগত ত্রুটি থাকায় আমি এ সম্পর্কে সহৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(১) রাধাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যের জন্য

'বাঙালীর সার্কাস' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থটি আমার দাদা অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু কর্তৃক লিখিত এবং মৎ কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থের তথ্য গুপ্ত মহাশয়ের লেখায় বেশ কয়েক স্থানে উপেক্ষিত কিংবা বিকৃত হয়েছে।

(২) বাঁধনবাবু তাঁর চিঠিতে লিখেছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসুর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল "প্রিয়লাল বসু (প্রিয়নাথ নয়)"। এ সম্পর্কে বাঁধনবাবুর ধারণা ঠিক নয়। আমার পিতৃদেবের আসল নাম ছিল প্রিয়নাথ বসু। আমাদের বংশ-তালিকা, জন্ম-পত্রিকা থেকে আরম্ভ করে বাড়ি-জমি সংক্রান্ত কাগজপত্রে তাঁর নাম প্রিয়নাথ বসু বলেই উল্লেখিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি সার্কাসের দল নিয়ে দেশেবিদেশে যেখানেই গেছেন সেখানে তাঁর ব্যবহৃত Visitiug cardএ স্পষ্টভাবে লেখা থাকত 'প্রিয়নাথ বসু'। এখনো সেইসব পুরানো Visting card আমার কাছে সুগচ্ছিত আছে। মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরীতে এবং চিঠিপত্রে (অধ্যক্ষ ডঃ সুবোধ চৌধুরী মনোমোহন বসুর জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ডায়েরী ও চিঠিপত্র সংগ্রহ করেছেন) তাঁর পুত্রের নাম প্রিয়নাথ বসু হিসেবেই লিখিত হয়েছে।

(৩) মনোমোহনের মধ্যম পুত্র মতিলাল বসুর জন্মসন নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। বাঁধনবাবু ইন্দুবালা দেবীর সাক্ষ্যে এই জন্মসন ভুল ভাবে দিয়ে বলেছেন যে মতিলালের জন্ম ১৮৫৭ খ্রীঃ (১২৬৪ সালে)। ইন্দুবালা দেবীর এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না ; সম্ভবতঃ তিনি অন্য কারুর কাছ থেকে শুনে এই ভুলটি করেছিলেন। আসলে মতিলালের জন্ম হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। মতিলাল বসু প্রথম জীবনে নরেন্দ্রনাথ দত্তের (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) সহপাঠী ছিলেন। মতিলালের জন্মপত্রিকা ছাড়াও তাঁদের স্কুলের রেকর্ড থেকে এবং অন্যান্য তথ্য প্রমাণ থেকে স্পষ্টভাবে বলা চলে যে মতিলালের জন্ম হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রীঃ এবং মৃত্যু হয় ১৭-২-১৯১০ সালে।

স্বামীজি তাঁর পুরানো সহপাঠী মতিলাল সম্পর্কে একবার মন্তব্য করেছিলেন, **'Mati was doing greater work than perhaps any Bengali worker in setting an example in organisation**

and proving Bengali nerve and pluck which was more effective than articles and lectures' (দ্রঃ অমৃত বাজার পত্রিকা ১৭-১-১৯১০)।

(৪) বাঁধনবাবুর চিঠির এক স্থানে লেখা হয়েছে যে মতিলাল বসু বিবাহ করেছিলেন রাজবালা দেবীকে (ইন্দুবালা দেবীর মা), এ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একথা কেবল ইন্দুবালাই প্রচার করে থাকেন, কিন্তু তাঁর কাছে গিয়েও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমাদের পরিবারের এত বড় একটা ঘটনার কথা আমাদের সকলের কাছে কেন অজ্ঞাত রইল, এ কথার কোন প্রকৃত উত্তর ইন্দুবালা দেবী কিংবা তাঁর মতের সমর্থক কেউ দিতে পারেন নি। আসলে রাজবালা দেবী মতিলালের সার্কাসের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সবচেয়ে বেশী দিন ঐ দলে ছিলেন বলে সেকালের স্বার্থান্বেষীরা এরূপ গুজব ছড়াতে পারেন। মতিলালবাবুর পত্নীর নাম ছিল অন্নদা মোহিনী। ইনি কম্বুলিয়াটোলার বিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র করের কন্যা ছিলেন।

(৫) প্রিয়নাথ বসু সম্পর্কে এক স্থানে বলা হয়েছে যে সুশীলাসুন্দরী ছিলেন তাঁর রক্ষিতা। এ কথারও কোন ভিত্তি নেই। সুশীলাসুন্দরী প্রিয়নাথের সার্কাসের দলে বাঘের খেলা দেখাতেন। তিনি ১৯১২ সালে সার্কাসের রিঙ-এর মধ্যে বাঘের আক্রমণে আহত হন এবং বার বছর শয্যাশায়ী হয়ে কাটানোর পর ১৯২৪ সালে মারা যান। প্রিয়নাথ বসু মারা যান ১৯২০ সালে ২১শে মে তারিখে। প্রিয়নাথ বসুর সংগে সুশীলাসুন্দরীর ঘনিষ্ঠতার প্রশ্নটি কেবল অবান্তর নয়, অসৌজন্যমূলক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রিয়নাথ বসু দুটি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর প্রথমা পত্নীর নাম যোগেন্দ্র যোগিনী, দ্বিতীয় পত্নীর নাম সরযূবালা দেবী। আমার দাদা ৺ ফনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর ('প্রেমডোর, Modern thought' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা), মা ছিলেন যোগেন্দ্র যোগিনী দেবী এবং আমার মা ছিলেন সরযূবালা দেবী। আমার মা পরিণত বয়স পর্যন্ত জীবিতা ছিলেন।

(৬) রাধাপ্রসাদ বাবু সার্কাসের দল প্রসঙ্গে একজনের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ভুল করেছেন। তিনি তাঁর নাম লিখেছেন গণপতি সরকার ;

আসলে তাঁর নাম ছিল গণপতি চক্রবর্তী (বিখ্যাত যাদুকর)।

চিঠিটি দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ছোটখাটো তথ্যের বিকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করা গেল না। সুযোগ পেলে সেগুলি সম্পর্কেও আলোচনা করা যাবে।

শ্রীসৌরেন বসু, কলিকাতা-৭০০০০৮

পত্র তিনখানি প্রকাশিত হবার পর 'বাঙ্গালীর সার্কাস' গ্রন্থখানি হঠাৎ দেখবার সুযোগ পেয়েছি। দেখা যাচ্ছে, অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখিত এই গ্রন্থটির প্রকাশকাল লেখকের নিবেদনপত্রের সূত্রানুসারে ১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩। পাবলিসিটি ষ্টুডিও ৩৬৭ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীভুজঙ্গশেখর সিংহ* ও প্রিণ্টার শ্রীরথীন্দ্র কৃষ্ণ বসু। সেকালে গ্রন্থকার স্বয়ং অবনীন্দ্রকৃষ্ণ এটি সমালোচনার জন্যে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদককে ১৪ই শ্রাবণ ১৩৪৩ তারিখে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন। 'বাঙ্গালার নব্য ব্যায়ামশালার অন্যতম শিক্ষক ও সংগঠন কর্ত্তা, বাঙ্গালীর সার্কাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা' স্বর্গীয় প্রিয়নাথ বসু মহাশয়ের উদ্দেশে 'বাঙ্গালীর সার্কাস' উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। সেকালে গ্রন্থটির মূল্য ছিল ১।০ (একটাকা চার আনা)। ভূমিকা লিখেছিলেন প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

দেবাশিস বসু তাঁর পত্রে জানিয়েছিলেন (২নং পত্র দ্রষ্টব্য), গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ। অথচ গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী এটির প্রকাশকাল ১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩। জানি না পরে অর্থাৎ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটির আরও কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা। তবে তাঁর পত্রের সূত্র ধরে এবং পরে এই গ্রন্থের মাধ্যমে প্রিয়নাথ বসু নামটি যে সঠিক তা জানতে পেরেছি। এজন্য আমি দেবাশিস বসু ও শ্রীসৌরেন বসুর প্রতি কৃতজ্ঞ। অন্যদিকে গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস দলের প্রকৃত মালিক কে ছিলেন এ সম্পর্কে দ্বিধা এখনো বর্তমান। এই গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী, 'এইবার প্রোফেসর বসুর মধ্যমাগ্রজ

---

*সৌরেন বসু তাঁর পত্রে এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবশ্য লিখেছিলেন, 'এই গ্রন্থটি আমার বাবা ৺অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু কর্তৃক লিখিত এবং মৎ কর্তৃক প্রকাশিত।'

মতিলাল বসুর কথা বলিব। ইনি সাহিত্যামোদী ও সঙ্গীতরসিক ছিলেন। ইনি 'চারি চিত্র' নামক উপন্যাস রচনা করিয়া এবং কয়েক বৎসর 'গান ও গল্প' নামে এক পাক্ষিক পত্র সম্পাদন করিয়া তৎকালে সুনাম অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। তিনি খুব 'কড়া' প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং এরূপ তেজীয়াম ও স্পষ্টবাদী ছিলেন যে, ব্যবসা সংক্রান্ত আদান প্রদানে এবং কর্মচারী প্রভৃতির সহিত ব্যবহারে যে প্রীতি ও সহানুভূতির সহযোগ ও সুকৌশল আবশ্যক তাহা তাঁহার ধাতুতে ছিল না। এইজন্যই বোধহয় তিনি তাঁহার যৌবনে কয়েকবার কয়েকটি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তবে তিনি টাকাকড়ির ব্যাপারে এবং হিসাবপত্র বিষয়ে খুব সতর্ক ছিলেন, ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা কম প্রয়োজনীয় নহে। পক্ষান্তরে প্রিয়নাথ ব্যয় সম্বন্ধে কতকটা শিথিল প্রকৃতির কিন্তু পরিশ্রমী, কর্ম্মকুশল ও জনপ্রিয় ছিলেন

এই দুই ভ্রাতার দুইরূপ প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া এবং প্রিয়নাথকে একা এই সার্কাস পরিচালনার বিপুল দায়িত্ব লইয়া নানারূপে বিব্রত অথচ কিছুতেই সার্কাস ব্যবসায় হইতে ফিরাইবার উপায় নাই বুঝিয়া, তাঁহাদিগের পিতা মতিলালকে প্রিয়নাথের সহিত মিলিত হইয়া দুইজনে একযোগে কাজ করিবার উপদেশ দেন। মতিলাল সম্মত হন। শুভ মুহূর্তে তিনি 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে' যোগদান করেন।

মতিলালকে পাইয়া প্রিয়নাথের বল বাড়িয়া গেল, অর্থাৎ টাকাকড়ির দায়িত্ব, আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র প্রভৃতি বিষয় হইতে কতকটা অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি খেলোয়াড়দিগকে ও জন্তু-জানওয়ারগুলিকে শিক্ষাদান, খেলার জন্য নূতন নূতন যন্ত্রপাতির নির্ম্মাণ, তাম্বু ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত, বিজ্ঞাপন রচনা, কার্য পরিচালনা, রাজন্যবর্গ এবং ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট গমনাগমন এবং সর্ব্বোপরি নূতন নূতন খেলার উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে নিশ্চিন্তভাবে মনোনিবেশপূর্ব্বক দলটিকে মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিলেন। এইরূপে দুই ভ্রাতা মিলিত ভাবে কাজ করায় 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' উন্নতির শিখরে আরোহণ করিল।

ভবিষ্যৎকালে নানা কারণে একাধিক বার দুই ভ্রাতা পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র দল চালাইয়াছিলেন এবং কিছুকাল না যাইতেই আবার উভয়ে মিলিত হইয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে, যখনই উভয় ভ্রাতা একত্র হইয়াছেন, তখনই দল সমধিক গৌরব ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।' (পৃঃ ১৮-২০, বাঙ্গালীর সার্কাস)।

সতর্ক পাঠক মাত্রেরই নজরে পড়বে যে অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু অলক্ষ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠতাত মতিলাল সম্পর্কে যেসব উক্তি করেছেন তা কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিহীন। কেননা যৌবনে যিনি 'কয়েকবার কয়েকটি ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই' তাঁকে পিতা মনোমোহন শুধুমাত্র 'টাকাকড়ি ব্যাপারে এবং হিসাবপত্র বিষয়ে খুব সতর্ক ছিলেন' বলে ছোট ছেলের ব্যবসায়ে যোগ দিতে বললেন এবং প্রিয়নাথ যিনি 'ব্যয় সম্বন্ধে কতকটা শিথিল-প্রকৃতির কিন্তু পরিশ্রমী, কর্মকুশল ও জনপ্রিয়' তিনিও তাঁর নিজের সার্কাসে দাদা মতিলালের ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কথা জেনেও গ্রহণ করতে রাজী হলেন এ কথা কি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য? তাহলে এখন প্রশ্ন, গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের প্রকৃত মালিকানা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কার ছিল? একা প্রিয়নাথের না মতিলালের, না কি দু'জনেই পরে যৌথভাবে এর মালিক ছিলেন?

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত এবং সৌরেন বসুর মতে প্রিয়নাথই এই সার্কাসের একমাত্র মালিক। অবনীন্দ্রবাবুর গ্রন্থের বক্তব্যে মালিকানার প্রশ্নটি উপরোক্ত অংশে অনুপস্থিত। ইন্দুবালার মতে, গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের মালিক ছিলেন স্বয়ং মতিলাল অর্থাৎ তাঁর বাবা। ১৯০৫ খ্রীঃ ৩রা জানুয়ারীর তারিখ চিহ্নিত Classic Theatreএর মুদ্রিত বিজ্ঞাপনেও মতিলাল বসুকেই Proprietor, Great Bengal Circus বলে প্রচারিত করা হয়েছে। দেবাশিস বাবু অবশ্য তাঁর পত্রে Raja of Rungpurএর প্রদত্ত ১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৮ খ্রীঃ এর একটি প্রশস্তিনামার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে Professor P. N. Bose's 'Great Bengal Circus Company' কথাটি উল্লেখিত। বলাবাহুল্য এটি চিঠি নয়, একটি প্রশংসাপত্র বা Certificate মাত্র। এ রকম আরও বেশ কয়েকটি প্রশংসাপত্র অবনীন্দ্রকৃষ্ণ

তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন, যা থেকে একমাত্র দেবাশিসবাবু তাঁর একটি পত্রে ব্যবহার করেছেন। যাই হোক দেবাশিসবাবুও কিন্তু নিজেই পত্রের শেষ দিকে তাঁর অনুমানের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, 'আমার অনুমান, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মতিলাল ও প্রিয়নাথ বেঙ্গল সার্কাসের যৌথ স্বত্বাধিকারী ছিলেন, কেউই একক মালিক ছিলেন না।' আর প্রিয়নাথের নাতি শ্রীসৌরেন বসু তাঁর পত্রে এ প্রসঙ্গে কিছুই উল্লেখ করেননি।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, তবে কি 'ভবিষ্যৎকালে নানা কারণে একাধিকবার দুই ভ্রাতা পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল চালাইয়া ছিলেন এবং কিছুকাল না যাইতেই আবার উভয়ে মিলিত হইয়াছিলেন' বলে অবনীন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর গ্রন্থে যে কথা বলেছেন তাই গ্রহণযোগ্য? কেননা এই সার্কাস কবে প্রকৃতপক্ষে প্রথম খোলা হয় এবং কতবার মতিলাল এবং প্রিয়নাথ পৃথক হয়ে স্বতন্ত্রভাবে দল চালিয়েছিলেন তারও কোন উল্লেখ কোথাও নেই। এটা থাকলে ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে সার্কাসের মালিক মতিলাল ছাড়া যে অন্য কেউ ছিলেন কিনা তা যাচাই করা সহজ হতো। এছাড়া পিতা মনোমোহনের মৃত্যুর (রবিবার ৪ঠা ফেব্রু' ১৯১২) আগে যদি বোসেস সার্কাস ১৯০৭ সালে রাধাপ্রসাদবাবুর তথ্যানুযায়ী মতিলাল বসুর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে তখন মনোমোহনবাবুর ভূমিকাটি কি ছিল? সৌরেন বসুর পত্র অনুসারে মতিলালের মৃত্যুর তারিখ ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০। ইন্দুবালাও আমায় তাঁর ডায়েরী থেকে তথ্য মিলিয়ে জানিয়েছেন যে তাঁর পিতা মতিলাল বসুর মৃত্যু হয়েছিল ৫ই ফাল্গুন ১৩১৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯১০ সাল (বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ৫৫ মিঃ)। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে রাধাপ্রসাদবাবুর কথিত মতিলালের মৃত্যুর ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ খ্রীঃ তারিখটিও সঠিক নয়। সুতরাং এ কথাও নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রিয়নাথের সঙ্গে মতিলাল কখনোই 'এইভাবে দুই ভাই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ অবদি একসঙ্গে কাজ করেননি।'

দ্বিতীয়তঃ প্রোফেসর বোস আসলে কে? মতিলাল না প্রিয়নাথ? প্রিয়নাথ বসুর পুত্র অবনীন্দ্রকৃষ্ণ সব সময় 'বাঙ্গালার নব্য ব্যায়ামশালার অন্যতম শিক্ষক ও সংগঠন কর্তা, বাঙ্গালীর সার্কাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা'

প্রিয়নাথ বসুকেই 'প্রোফেসর বোস' বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, Classic Theatreএর শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হ্যাণ্ডবিলে Great Bengal Circusএর Proprietor শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল বসুকে প্রোফেসর বোস বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইন্দুবালা দেবী যিনি এখনও একমাত্র জীবিত সাক্ষী আছেন তাঁর বক্তব্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনিও লিখেছেন, 'সে সময় আর এক নাম করা সার্কাস দল ছিল। লোকে বলত প্রোফেসর বোসের 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'। মালিকের পুরোনাম মতিলাল বোস অর্থাৎ আমার বাবা'। পাশাপাশি অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখিত 'বাঙ্গালীর সার্কাস' গ্রন্থে রংপুরের রাজা গোবিন্দলাল রায়ের প্রশংসাপত্র (১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৮) Sir Michael Filose, Lt. Col., K. C. S. S.' Secretary, Gwallior State and Late Governor of Malwa প্রদত্ত সার্টিফিকেট (২৯শে জুন ১৮৯৬), Amar Singh, Raja, K. O. S. I. Vice President of Council, Jammu and Kashmir State প্রদত্ত প্রশংসাপত্র (২রা ডিসেম্বর ১৮৯৭) অর্থাৎ মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে প্রিয়নাথের নাম প্রোফেসর বসু হিসেবে চিহ্নিত ছিল। অন্যদিকে, গ্রন্থে সর্বমোট যে পঁচিশটি প্রশংসাপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার বাকি বাইশটিতেই সার্কাসের মালিকের কোন নাম উল্লেখিত হয়নি। এগুলিতে কেবলমাত্র বোসেস সার্কাস বা প্রোফেসর বোস সম্বোধনটিই ব্যবহৃত। আবার 'সার্কাসে ভূতের উপদ্রব' রচনা যা ধারাবাহিক ভাবে 'নাট্যমন্দির' পত্রিকায় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লেখকের নাম 'প্রোফেসর বসু' হিসেবে নামাঙ্কিত হয়েছে। এর প্রকাশকাল ১৯১০ খ্রীঃ। সুতরাং এ থেকেও নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে না যে ইনিই স্বয়ং প্রিয়নাথ বসু। এছাড়া মতিলাল সে বছরই ৫ই ফাল্গুন প্রাণত্যাগ করেছিলেন। এ অবস্থায় আনুমানিক ভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে দেবাশিস বাবুর অনুমানই কিছুটা হয়ত সত্য। অর্থাৎ '১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মতিলাল ও প্রিয়নাথ গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের যৌথ স্বত্বাধিকারী ছিলেন। কেউই একক মালিক ছিলেন না।'

অন্যদিকে, সুশীলাসুন্দরী যে গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে ছিলেন এবং বাঘের

খেলায় অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিলেন সেকথা ঠিক। অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুও তাঁর গ্রন্থে সেকথা বিস্তৃতভাবে লিখেছিলেন। বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সুশীলাসুন্দরী আহত অবস্থায় দীর্ঘ বারো বছর শয্যাশায়ী হয়ে কাটাবার পর অবশেষে যে ১৯২৪ সালে মারা যান একথাও ঠিক। প্রিয়নাথের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট মহলে এখনও প্রচারিত বলেই তা লিখেছিলাম। অবশ্য এ জাতীয় সম্পর্কের কোন প্রমাণপত্র যে থাকে না তা সকলেই জানেন। তবু সৌজন্যের প্রশ্নেই এ প্রসঙ্গ থেকে বিরত থাকা শোভনীয় ভেবে এ প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ নিঃস্প্রয়োজন। সুশীলাসুন্দরীর অবদান সার্কাসের ক্ষেত্রে অপরিসীম। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে আরো জানা যায় যে, সুশীলাসুন্দরীর দুটি কন্যা ছিল। সুশীলার বোনের নাম ছিল কুমুদিনী। কন্যা মুলতান (টনি) অমর দত্তের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন। কুমুদিনীও সার্কাসে খেলা দেখাতেন। পরে কবিরাজ নগেন সেন তাঁকে আশ্রয় দান করেন এবং রামবাগান অঞ্চলে নাকি চারখানা বাড়িও তাঁকে দান করেছিলেন।

যাই হোক্, অবনীন্দ্রকৃষ্ণের গ্রন্থে সার্কাসের অনেক শিল্পী বা খেলোয়াড় সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু সৌরেন বসু কথিত 'আসলে রাজবালা দেবী মতিলালের সার্কাসের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সবচেয়ে বেশীদিন ঐ দলে ছিলেন বলে সেকালের স্বার্থান্বেষীরা এরূপ গুজব ছড়াতে পারেন, বলে যে কথা উল্লেখ হয়েছে তাঁর অর্থাৎ রাজবালা সম্পর্কেও সেই গ্রন্থে আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বিত হয়েছে। সতর্ক পাঠকের নিশ্চয়ই নজরে পড়বে যে সৌরেন বসুও লিখেছেন যে, 'আসলে রাজবালা দেবী মতিলালের সার্কাস দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ; তিনি সবচেয়ে বেশীদিন ঐ দলে ছিলেন…'। এ ক্ষেত্রে মতিলালের সার্কাস দল কোন্‌টি ? নিশ্চয়ই তাঁর পিতা প্রিয়নাথের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস দলকেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। তা না হলে মতিলালের আলাদা কোন সার্কাস দল ছিল যেখানে রাজবালা দীর্ঘকাল খেলা দেখিয়েছেন, এবং তবে কি এই কারণেই অবনীন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর গ্রন্থে অনেকের কথা লিখলেও রাজবালা সম্পর্কে কোন উল্লেখই করেননি ? যদিও দেখা যাচ্ছে 'সার্কাসে ভূতের উপদ্রব' রচনার মধ্যে ফুটনোটে রাজবালার

ভাই তিনকড়ি দাসের নাম এবং ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। রাজবালা সবচেয়ে বেশীদিন সার্কাসের সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও 'বাঙ্গালীর সার্কাস' গ্রন্থে কোথাও রাজবালার নাম উল্লেখ না হওয়াটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার।

এবার মতিলাল ও ইন্দুবালার সম্পর্ক প্রসঙ্গে আসা যাক। দীর্ঘকাল ধরে ইন্দুবালা বাংলা গানের জগতে, নাটকে ও চলচ্চিত্রে সাফল্যের গুণে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিতা। সর্বভারতীয় সঙ্গীত জগতেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর চুরাশী বছরের জীবনে তিনি তাঁর পরিচিতিতে সর্বত্রই মতিলাল বসুকেই তাঁর পিতা বলে উল্লেখ করে এসেছেন। দীর্ঘজীবনে প্রকাশিত অজস্র সাক্ষাৎকার এবং সংক্ষিপ্ত জীবনীতে আজও ইন্দুবালার পিতা হিসেবে মতিলাল বসুর নামই উল্লেখিত হয়ে থাকে। অবশ্য একথা ঠিক যে, ইন্দুবালা নিজেই একথাও স্বীকার করে এসেছেন যে মতিলালের হাতিবাগান (ভল্লুকবাগান) অঞ্চলে যে বাড়ি ছিল সেখানেই তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে প্রধানতঃ বসবাস করতেন। এমন কি মতিলাল যে কম্বুলিয়াটোলার বিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র করের কন্যা অন্নদামোহিনী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন এ তথ্যও ইন্দুবালার অজ্ঞাত নয়। ইন্দুবালার তথ্যানুযায়ী এটর্নী পণ্টু করের বোন অন্নদামোহিনীকেও মতিলাল বিবাহ করেছিলেন। বিডন স্ট্রীটের পাগলা বাবু অর্থাৎ সর্বানন্দ বসাকের সিঁথির বাগান বাড়িতে ইন্দুবালার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও আলাপ হয়েছিল। পণ্টু কর ইন্দুবালার সঙ্গে মতিলালের সম্পর্কের কথাও জানতেন। ইন্দুবালার মতে, উজ্জয়িনীতে মতিলাল রাজবালাকে গ্রহণ করার পর বছর ছয়েক বাদে মতিলালের সঙ্গে রাজবালার সম্পর্ক বা যোগাযোগের সমাপ্তি ঘটে। পরস্পরের বিচ্ছেদের স্পষ্ট কোন কারণ জানা না থাকলেও ইন্দুবালার ধারণা, মা রাজবালা সার্কাসে ফিরে যাবার উৎসাহ হারিয়েছিলেন এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। যদিও রাজবালার ভরণপোষণ বা কন্যা ইন্দুবালার জন্যে মতিলালের উদ্বেগ বা চিন্তার অভাব ছিলনা। সেই কারণেই রাজবালাকে একটি বাড়ি এবং ইন্দুবালার জন্যে মাসিক ২০ টাকা নিয়মিতভাবে মতিলাল মনসাবাবুর মাধ্যমে পাঠাতেন। রাজবালা প্রথমে ভূপেন্দ্রনাথ দাস দে (মজুমদার) বা ভূপে মজুমদারের কাছে এবং পরে জীবনকৃষ্ণ ঘোষের আশ্রয়ে চলে আসার পর

টাকা পাঠানো মতিলালই বন্ধ করে দেন। ইন্দুবালার বয়স তখন ছয় অর্থাৎ ১৯০৫ সাল। *

এখন কথা হচ্ছে, মতিলাল-রাজবালার প্রবাসে উজ্জয়িনীতে বিবাহ করার সংবাদ হাতিবাগানে অন্নদামোহিনী বা তাঁর পরিবারের কাছে কেন অজ্ঞাত রইল সে কথা সৌরেন বাবুরও হয়ত জানার কথা নয়। কেন না এ ঘটনা তো সম্ভবতঃ তাঁরও জন্মের পূর্বের ঘটনা। তাছাড়া এ জাতীয় বিবাহ তো সেকালে অসংখ্য পরিবারেই দেখা যেত। আর তথ্য-প্রমাণবিহীন এই সব সত্য ঘটনার কথা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সব সময় জ্ঞাত থাকে না। ইন্দুবালা নিশ্চয়ই সব জেনেশুনে অকারণে মতিলাল বসুর নাম আজীবন উল্লেখ করতে যাননি। এমন কি এতকাল ধরে সেকালের স্বার্থান্বেষীরা গুজব ছড়াবেন এটাই বা কতখানি সত্য? তাছাড়া ইন্দুবালা কোন দাবী না করেও মিছেমিছি এই সংবাদ শুধুমাত্র মতিলালের নামে প্রচার করতে যাবেন কেন? মতিলালের দুই পুত্র মণিলাল এবং স্নেহলাল সম্পর্কেও তিনি খবরাখবর রাখেন। দেবাশিস বাবু এই মণিলাল সম্পর্কেই লিখেছেন যে, 'বড় ছেলে মণিলাল কাকা প্রিয়নাথের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন।' সে কথা রাধাপ্রসাদবাবুও লিখেছেন, শেষ জীবনে মণিলাল সন্ন্যাসী হয়ে যান, তাঁর নাম হয় স্বামী বিজয় বাসুদেবানন্দ গিরি'। ইন্দুবালার বাড়ির কাছাকাছি একটি বাড়িতে মতিলালের দুই পুত্রেরও যাতায়াত ছিল। ইন্দুবালার স্মৃতি অনুযায়ী রাজবালাকে লেখা স্বামী মতিলালের কয়েকটি চিঠিপত্রও ছিল। রাজবালাই মৃত্যুর আগে সম্ভবতঃ অভিমানভরে সেগুলি নষ্ট করে ফেলেন। চিঠিগুলি থাকলে এ বিষয়ে আরও স্পষ্টভাবে আলোকপাত করা সম্ভব হত। অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর গ্রন্থটিতে মতিলাল বসুর একটি বিশেষ গুণের সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন সার্কাসের মধ্যে বাঘের খেলা দেখানোর পূর্বে মতিলালের রচিত গানও গাওয়া হত। বাঘের খেলাতে সুশীলাসুন্দরীর পরেই স্থান ছিল মৃন্ময়ী নামের এক মহিলা খেলোয়াড়ের। মৃন্ময়ী সম্পর্কে তখনকার দিনে Statesman পত্রিকা (৯ই ডিসেম্বর ১৯০৬) মন্তব্য করেছিলেন—Miss Mrinmoyee introduces a sensation in which a

* ইন্দুবালার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২৮শে এপ্রিল ১৯৮৩

tiger perched on a splendid tusker is the chief attraction···

'Bandemataram' পত্রিকাতেও মৃন্ময়ীকে উদ্দেশ্য করে অনুরূপ প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হয়। যেমন—It was one inspiring even to dream that the most ferocious of all the beasts could be so trained and that by the Bengalee girls who was proverbially dubbed cowards. (২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৬)।

অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর তথ্যানুযায়ী এই খেলার পূর্ব্বে গাহিবার জন্য মতিলাল বসু একটি গানও রচনা করিয়াছিলেন,—

জানে বিশ্বজন,
বুঝে আমরণ
হইলে মিলন
ব্যাঘ্র বারণে।
দেখ তাহা ভুল,
জগতে অতুল
দ্বিরদে শার্দ্দুল
বদ্ধ বন্ধনে।
কাঁদায়ে কল্পনা,
গজে বাঘাসনা
বঙ্গ বীরাঙ্গনা
বরে মরণে।

[বাঙ্গালীর সার্কাস পৃঃ ৪৪-৪৫]

প্রোফেসর বসুর 'সার্কাসে ভূতের উপদ্রব' রচনার নীচে ফুটনোটে প্রদত্ত তথ্য থেকেও বোসেস সার্কাসের ব্যাপারে অনেক খবরাখবর পাওয়া যায়। 'নাট্যমন্দির' ফাল্গুন ১৩১৭ সংখ্যায় প্রাপ্ত তথ্যগুলি নিম্নরূপ :

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মিত্রের বাড়ী কলিকাতা সিমলা ষ্ট্রীটস্থ মধু রায়ের গলি। পূর্বে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসে কর্ম করিতেন। পরে আমাদের এই সার্কাসে ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হন। তিনি এখন মৃত।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বসু—৮৪ নং মানিকতলা ষ্ট্রীটস্থ শুঁড়িপাড়ায় বাস করেন। আমাদের সার্কাসে বহু বৎসর কর্ম করিবার পর হিপোড্রোম সার্কাসে কর্ম করেন—অধুনা মহারাষ্ট্র সার্কাসে কর্ম করিতেছেন। (পৃঃ ৬১০)

সিমলা ষ্ট্রীটে প্রসিদ্ধ গোঁসাইবাড়ির পার্শ্বে "দীনুর হোটেল" নামক বহু বৎসর ধরিয়া দীননাথের হোটেল ছিল। উপস্থিত সম্ভবতঃ ঐ পাড়াতেই থাকে। (পৃ ৬১১)

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি শ্যামবাজার। ইনি ক্লাউনএর প্লে এবং লাঠিম ক্রীড়ার জন্য অনেকের নিকট পরিচিত।

শ্রীযুক্ত বনমালি দাসের বাড়ি তালতলায়। দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে শিষ্যরূপে আমার নিকট খেলাড়ি রূপে আছেন। অধুনা কলিকাতা গড়ের মাঠে আমাদের "বোসের সার্কাসের" বিজনেস ম্যানেজারের কার্য্য করিতেছেন।

সেই বৎসর আমি করাচি বন্দর হইতে আসিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ পালের নিকট হইতে "গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস" ক্রয় করিয়া লই। সেইবার আমাদের গড়ের মাঠে প্রথম খেলা হয়—পরে মাত্র কটক ও ভাইজাগাপাটম এই দুই শহরে ক্রীড়া দেখাইয়া কোকণ্ডায় আসি। উভয় সম্প্রদায় * মিশ্রিত হওয়ায় অশ্বের সংখ্যা সেবারে অধিক হইয়াছিল। (পৃঃ ৬১২)

মধুসূদনের প্রকৃত নাম শ্রীযুক্ত হরিদাস মতিলাল। শ্যামবাজার শাস্তিরাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ "মতিলাল" বংশের যুবক। একজন all round উচ্চ অঙ্গের ক্রীড়ক ও ring master। হায়! আমার সেই প্রিয়তম যুবক এখন মৃত! (পৃঃ ৬১৬)

হরিমতিবাবুর আসল নাম শ্রীমতিলাল মিত্র। নিবাস সিমুলিয়া কাঁসারী পাড়া, অধুনা বোসের সার্কাসের রিং মাষ্টার।

জগৎপ্রসিদ্ধ ব্যাঘ্র-ক্রীড়ক মহাবীর বাদলচাঁদের পরিবারের নাম বিবি নুরজাহান। বাদলচাঁদ যক্ষারোগে মৃত, বিবিসাহেবা নিরুদ্দিষ্ট। (পৃঃ ৬১৮)

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দাস অধুনা তারের উপর বাইসিকেল সাহায্যে পরিভ্রমণ

---

* উভয় সম্প্রদায় বলতে কি মতিলাল ও প্রিয়নাথের দুটি আলাদা সম্প্রদায় বোঝান হয়েছে কিনা তা বোঝা যায় না—লেখক।

করেন। নিবাস ১৫।১ নং দর্প নারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, পাথুরিয়াঘাটা। (পৃঃ ৬১৯)

শ্রীমতী সুচিন্তা ও সুকুমারী, ওরফে শুচি ও ভুঁদি নাম্নী দুই সহোদরা শোভাবাজার ফুলবাগানে (থিয়েটারের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মৃতা প্রমোদা সুন্দরীর বাটীর পার্শ্বে) এখনও বাস করিতেছেন।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী "প্রোফেসর বোসের গ্র্যাণ্ড সার্কাস"এ প্লে করিতেছেন। উপস্থিত এলাহাবাদ একজিবিসনে আছেন। (পৃঃ ৬২১)

এই সূত্র থেকে অবশ্য বোঝা যায় যে, ইন্দুবালাকথিত তথ্যের সত্যতাই অনেক বেশী। কেননা ইন্দুবালা প্রথম থেকেই বলে এসেছেন যে, তাঁর বাবা মতিলাল বসু যোগীন পালের কাছ থেকেই সার্কাসের দলটি অল্প টাকায় কিনে নিয়েছিলেন। এখন বোঝা যাচ্ছে, যোগেন্দ্রনাথ পালের বিক্রীত সেই সার্কাস দলের নাম ছিল "গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস"। গড়ের মাঠে সেই বছরই প্রথম খেলা হয় বলে প্রোফেসর বসু তা এই ফুটনোটে জানিয়েছেন, অর্থাৎ এটি ১৮৯৩-৯৪ সালের ঘটনা, এবং সেবারই রাজবালা মতিলালের এই নব নামাঙ্কিত সার্কাস দল বোসের 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে' যোগ দেন। সুতরাং 'সার্কাসে ভূতের উপদ্রব' রচনার লেখক যে মতিলাল স্বয়ং একথা আপাতদৃষ্টিতে অস্বীকার করার সুযোগও কম।

পরিশেষে উৎসাহী পাঠকের বিস্তৃতভাবে অবগতির জন্য প্রিয়নাথ বসুর পুত্র শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখিত (প্রথম সংস্করণ ১লা শ্রাবণ ১৩৪৩) 'বাঙ্গালীর সার্কাস' গ্রন্থ থেকে দুটি অধ্যায় (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬ থেকে ৩৯) হুবহু তুলে দেওয়া হচ্ছে। যথাক্রমে 'প্রোফেসর বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' ও 'বোসের সার্কাস ও স্বদেশী আন্দোলন' নামক এই দুই অধ্যায় থেকে পাঠকবৃন্দ দুটি সত্য অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন। প্রথমতঃ অবনীন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর জ্যাঠামশাইকে (মতিলালের মৃত্যুর পরে লিখিত) এই গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত কম প্রাধান্য দিয়ে কেবলমাত্র পিতা প্রিয়নাথের কৃতিত্ব ও প্রশস্তিরই বিবরণ দান করতে সচেষ্ট ছিলেন। সতর্ক পাঠকের পক্ষে এই গ্রন্থটি পড়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তাঁর এই কাজটি স্বেচ্ছাকৃত। কেননা এতে অগ্রজের কৃতিত্বকে ম্লান প্রমাণ করার চেষ্টা খুবই স্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ কেবলমাত্র প্রিয়

নাথের প্রশস্তিনামাগুলিই এতে সংযোজিত। প্রিয়নাথের ভূমিকা এবং বোসেস গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে তাঁর অবদানের কথা স্বীকার করেও এই সত্যকে অস্বীকার করা চলে না যে, মতিলালই এই সার্কাসের অন্যতম স্রষ্টা এবং মালিক। কেননা যোগীন পালের কাছ থেকে সার্কাস দলটিকে কিনে নিয়েছিলেন স্বয়ং মতিলাল। লক্ষণীয়, এই গ্রন্থে গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস কত সালে প্রতিষ্ঠিত তারও উল্লেখ নেই। সুতরাং এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত তথ্যাদি পেলে ভবিষ্যতে গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের অতীত সম্পর্কে পুঙ্খানুভাবে জানতে পারা যাবে বলে আমার বিশ্বাস। অন্যদিকে মতিলাল কেবলমাত্র এই সার্কাসের হিসেবপত্র রাখতেন এটিও নেহাৎই গুজব ও অপপ্রচার মাত্র।

প্রোফেসার বোসের

গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস

দুর্গম নূতন পথের যাত্রীর অদৃষ্টসুলভ দুঃখ ও বিড়ম্বনা মাথায় করিয়া প্রথম প্রথম ঘোর অসুবিধা ও বিপদের মধ্য দিয়া প্রিয়নাথ বসু আত্মীয়-স্বজনের সন্দেহ ও বিরক্তি ভাজন হইয়া অতি কষ্টে সার্কাসের দলটিকে চালাইতে লাগিলেন। বিদেশে একবার অর্থাভাবে তাঁহাকে এরূপ পীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল যে, সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে স্নেহপ্রবণ পিতাকে তথায় যাইতে হয়; তিনি যাইয়া পুত্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন ও তাঁহাকে আর এ কার্যে লিপ্ত হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু প্রিয়নাথ 'সাধিলেই সিদ্ধি' এই মহাবাক্য বিশ্বাস করিতেন। তিনি নিজের ঈপ্সিত কাজকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না—দ্বিগুণ উৎসাহে আবার দল গঠন করিয়া চালাইতে লাগিলেন।

অল্পকালের মধ্যেই 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে রংপুরের দরবার উপলক্ষে তাজহাট রাজবাটীতে খেলা দেখাইবার জন্য নিযুক্ত হইল। খেলা দেখিয়া রাজা গোবিন্দলাল রায় এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিক ব্যতীত দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ২৫ জোড়া শাল উপহার দান করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত প্রশংসাপত্রখানিও দিয়াছিলেন—

Rungpur,
10th December, 1888.

Most gladly I do hereby certify that Professor P. N. Bose's 'Great Bengal Circus Company' performed prodigies of equestrian and gymnastic feats on the Durbar held at my Tajhat house. I engaged them for two nights, but was so highly pleased with their performances that I could not but retain them for two nights more.

I shall be indeed happy to patronise their cause.

(Sd.) Gobindalal Roy
Raja of Rungpur.

ঐ সময়েই কাকিনার (রংপুর) রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয় 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' খেলা দেখিয়া উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন—

"I hope all noblemen and gentlemen will help their cause as I consider an institution for the display of gymnastic and equestrian feats is a national glory."

পাঠক দেখিবেন, মহিমারঞ্জনের এই আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়াছিল। প্রথম প্রথম এইরূপে বাঙ্গালার জমিদারবর্গের গৃহে খেলা দেখাইবার জন্ত 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' আহূত হইতে লাগিল এবং ইহাদের মধ্যে অনেকেই চুক্তি অনুযায়ী অর্থ ব্যতীত অনেক জিনিষপত্র অথবা অশ্ব প্রভৃতি জন্তু উপহার দিয়া সার্কাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন। সার্কাসের আত্তাবস্থায় এবং উত্তরকালেও ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজাদের মধ্যে অনেকে অনেক বার অনেক মূল্যবান উপহার দিয়াছিলেন; সকলের কথা এখানে বলা সম্ভব নহে, তবে ইহাদিগের মধ্যে ত্রিপুরার মহারাজা, রেওয়ার মহারাজা, কাশীনরেশ, কাশ্মীরের মহারাজা, ঝালওয়ারের মহারাজা রাণা ঝালিম সিং বাহাদুর ও ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে একাধিকবার একাধিক হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি উপহার দিয়াছিলেন।

এই বার প্রোফেসার বসুর মধ্যমাগ্রজ মতিলাল বসুর কথা বলিব। ইনি সাহিত্যামোদী ও সঙ্গীতরসিক ছিলেন। ইনি 'চারি চিত্র' নামক উপন্তাস রচনা করিয়া এবং কয়েক বৎসর 'গান ও গল্প' নামে এক পাক্ষিক পত্র সম্পাদন করিয়া তৎকালে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি খুব 'কড়া' প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং এরূপ তেজীয়ান ও স্পষ্টবাদী ছিলেন যে, ব্যবসা সংক্রান্ত আদান প্রদানে এবং কর্মচারী প্রভৃতির সহিত ব্যবহারে যে প্রীতি ও সহানুভূতির সহযোগ ও সুকৌশল আবশ্যক তাহা তাঁহার ধাতুতে ছিল না। এই জন্তই বোধ হয়, তিনি তাঁহার যৌবনে কয়েকবার কয়েকটি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে তিনি টাকাকড়ির ব্যাপারে এবং হিসাবপত্র বিষয়ে খুব সতর্ক ছিলেন; ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা কম প্রয়োজনীয় নহে। পক্ষান্তরে প্রিয়নাথ বায় সম্বন্ধে কতকটা শিথিল প্রকৃতির কিন্তু পরিশ্রমী, কর্মকুশল ও জনপ্রিয় ছিলেন।

এই দুই ভ্রাতার দুইরূপ প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া এবং প্রিয়নাথকে একা এই সার্কাস পরিচালনার বিপুল দায়িত্ব লইয়া নানারূপে বিব্রত অথচ কিছুতেই সার্কাস ব্যবসায় হইতে ফিরাইবার উপায় নাই বুঝিয়া, তাঁহাদিগের পিতা মতিলালকে প্রিয়নাথের

সহিত মিলিত হইয়া দুইজনে একযোগে কাজ করিবার উপদেশ দেন। মতিলাল সম্মত হন। শুভ মুহূর্ত্তে তিনি 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে' যোগদান করেন।

মতিলালকে পাইয়া প্রিয়নাথের বল বাড়িয়া গেল; অর্থাৎ টাকাকড়ির দায়িত্ব, আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র প্রভৃতি বিষয় হইতে কতকটা অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি খেলোয়াড়দিগকে ও জন্তু-জানোয়ারগুলিকে শিক্ষাদান, খেলার জন্য নূতন নূতন যন্ত্রপাতির নির্ম্মাণ, তাম্বু ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত, বিজ্ঞাপন রচনা, কার্য্য পরিচালনা, রাজন্যবর্গ এবং ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট গমনাগমন এবং সর্ব্বোপরি নূতন নূতন খেলার উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে নিশ্চিন্তভাবে মনোনিবেশ পূর্ব্বক দলটিকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিলেন। এইরূপে দুই ভ্রাতা মিলিত ভাবে কাজ করায় 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' উন্নতির শিখরে আরোহণ করিল।

ভবিষ্যৎকালে নানা কারণে একাধিক বার দুই ভ্রাতা পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল চালাইয়া ছিলেন এবং কিছুকাল না যাইতেই আবার উভয়ে মিলিত হইয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে, যখনই উভয় ভ্রাতা একত্র হইয়াছেন, তখনই দল সমধিক গৌরব ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' ক্রমে বাঙ্গালার বাহিরে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে ইহার যশশ্রী-মণ্ডিত নাম দেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। উত্তরে কাশ্মীরের মহারাজা হইতে দক্ষিণে মহিশূররাজ, আর পশ্চিমে গুজরাটের ভবনগর, জামনগর, জুনাগড়, বরদা প্রভৃতির রাজন্যবর্গ হইতে পূর্ব্বে বঙ্গের কুচবিহারাধিপতি, জমিদার রাজা গোবিন্দলাল ও রাজা জানকীবল্লভ প্রভৃতির আগ্রহে এমন স্থান, এমন নগর এবং এমন রিয়াসত, বোধ হয় কম রহিল যেখানে 'প্রোফেসার বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' যাইয়া ক্রীড়া না দেখাইল ও সমাদর না পাইল। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই অন্ততঃ এক বারও প্রোফেসার বোসের সার্কাস দেখিয়া উচ্চাঙ্গের প্রশংসাপত্র দিলেন। বহু সংখ্যক প্রশংসাপত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকখানি এখানে প্রকাশিত হইল :

Gondal

17th November, 1894

On the occassion of H. E. Lord Harris' visit to the Gondal State we have had the pleasure, at the invitation of H. H. the Thakur Saheb of Gondal, of witnessing the admirable performan-

ces of 'Professor Bose's Great Bengal Circus.' H. E. the Governor and all the party were much pleased with the performance.

(Sd.) E. C. K. M. Ollivant, C. I. E., C. S.,
Political Agent, Kathiawar.

(Sd.) T. Harris, Lieutenant Colonel,
Military Secretary.

Lashkar Gwalior
29th June, 1896.

* * Professor P. N. Bose's Circus is one of the most unique productions the natives of India have adopted after the European method of equestrian athletic and comic performance.

This is the first time I had the pleasure of seeing the Bengali ladies and a girl appear in the scene and their graceful performance was exquisite.

On the whole from what I saw of his performance at His Highness the Maharaja of Gwalior's Palace on the 27th instant, I have no hesitation to say that Professor Bose's efforts in getting up his Great Bengal Circus of purely Bengali ladies and gentlemen have proved to be of great success.

Sir Michael Filose, Lt. Col., K. C. S. S.,
Secretary, Gwallior State and Late Governor of Malwa.

Saugor Cantonment
14th May, 1896

* * It is wonderfully good of its kind * *

(Sd.) P. Neville Lt. Col.,
Commanding Saugor, Central India

Panna
11th October, 1896.

The most exquisite performance of Professor Bose's Great

Bengal Circus at the Kothi Palace at Panna afforded the utmost pleasure and amusement to the spectators for three nights.

His Highness the Mahendra Maharaja Sahib Bahadur was highly delighted with the numerous wonderful gymnastic exercises, daring manly exploits and astonishing feats of horsemanship, most excellently and successfully achieved by the various Bengali male and female members of the Circus.

* * * * *

(Sd.) Rao Anant Singh
Dewan, Panna State

Jammu
2nd December, 1897.

Professor P. N. Bose entertained His Highness and the gentry at the palace at Jammu, with his performance. * *

The whole party were much pleased by what they saw and congratulate the Professor for the great success which has attended his efforts in getting up his 'Great Bengal Circus' of purely Bengali ladies and gentlemen.

(Sd.) Amar Singh, Raja, K. C. S. I.,
Vice President of Council,
Jammu and Kashmir State.

Lahore
4th April, 1898.

* * * Their exhibition of horsemanship and acrobatic feats are exceedingly good and quite equal to those of the best European circuses that I have seen in India. Mr. Pannalal's performances on the tripple horizontal bars and those of Bir Badal chand with two Royal Bengal Tigers are astonishing. Those of Miss Susila

with the tigers are also very creditable and are I believe unique of their kind in this country.

The Company were very popular with all ranks and classes during their stay here and their performances universally admired and appreciated.

(Sd.) P. Chatterjee
Chief Justice, Punjab

বাঙ্গালার বাহিরে 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' তখন উল্লিখিত রাজামহারাজা বা পদস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত জনসাধারণের চিত্ত কিরূপ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল ও কিরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত তিনখানি সংবাদ পত্রের মন্তব্য হইতে বুঝা যায় ;—

The Punjab Times 22-12-93.

"Professor Bose's Great Bengal Circus continues to draw crowds to witness what to Rawalpindi is something new. The rush for seats is so great that money is nightly refused at the doors. * * * "

The Rajputana Malwa Times, 3-2-96.

"The Great Bengal Circus Company which was almost a nine days' wonder in this sleepy hollow * * * were able to provide the Ajmere public with an entertainment which while it fully sustained the reputation which they have already earned for themselves, exceeded the most sanguine expectations of their patrons. * * * "

The Tribune, (Lahore) 10-11-91.

"The Great Bengal Circus has taken the Lahore public by storm. No other show had such a hold on popular fancy here within living memory. People have gone what may be called circus-mad and laudatory ejaculations with reference to the performance of members of the troupe are heard on every side."

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী দলের এই সাফল্যের কথা সংবাদ পত্রের মারফতে বঙ্গবাসীরা জানিতে লাগিলেন, ও এই বাঙ্গালীর সার্কাসের জন্য কলিকাতাবাসীরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' কলিকাতায় সর্বপ্রথম খেলা দেখাইতে আসিল। কলিকাতার গড়ের মাঠে তাম্বু পড়িল। কলিকাতাবাসীরা, বিশেষতঃ প্রোফেসার বসুর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুগণ সেই সামান্য ব্যায়ামশালা হইতে ক্রীড়া-নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সজ্জাসম্ভারে পূর্ণ এই পূর্ণাবয়ব সার্কাস কোম্পানীর উদ্ভব চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইলেন; গড়ের মাঠে বহু গণ্যমান্য ও পদস্থ লোক 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' খেলা দেখিতে আসিলেন ও তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন। পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে কর্পূরতলার মহারাজা, কুচবিহারাধিপতি, এবং বর্দ্ধমানের ভূম্যধিকারী মহারাজা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সার্কাস দেখিয়া গিয়া যে সকল প্রশংসা পত্র পাঠান তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

Victoria Terrace,
Calcutta, 31st December, 1899.

* * Professor Bose's Circus was visited by H. H. the Maharaja and his staff last night. His Highness gave his patronage for the performance and was highly pleased with the equestrian and gymnastic feats specially wrestling with 2 tigers which was quite wonderful and one of the kind ever seen.

(Sd.) Daolet Ram
Private Secretary to
H. H. the Maharaja of Kapurthala.

'Woodlands' Calcutta
The 17th January, 1900

His Highness the Maharaja of Cooch Behar paid a visit to Professor Bose's Great Bengal Circus in the early part of the season and subsequently permitted him to have a special performance under his patronage. On both these occasions the performance was excellent and reflected great credit on the management. The skill

displayed by Bir Badal Chand in his play with two huge Royal Bengal Tigers was much admired.

His Highness was immensely pleased and wishes the Company all success.

(Sd.) Priya Nath Ghosh
Personal Assistant to
His Highness
the Maharaja of Cooch Behar.

The Palace, Burdwan
The 1st February, 1900.

* * We were highly delighted with all that we saw. The feats were really surprising and such as are rarely to be seen. * * In fact all that we saw of the circus were extremely entertaining and extremelv praise-worthy and cannot be too highly spoken of. The Circus deserves the patronage of the public in general."

(Sd.) Illegible
Manager Raj Burdwan

কলিকাতার খেলা সাঙ্গ করিয়া সার্কাস দক্ষিণ ভারতের উপকূল ধরিয়া সিংহলে গমন করিল এবং ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার ময়দানে দ্বিতীয়বার খেলা দেখাইল (১৯০০—১ খ্রীঃ)। বলা বাহুল্য, এবারও কলিকাতার খেলা সাফল্যমণ্ডিত হইল। এই বৎসর মহিশূরাধিপতির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তাঁহার উপস্থিতিতে এক রাত্রি খেলা দেখান হইয়াছিল। বাঙ্গালার লেফ্টন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার জন উডবার্ন একদিন খেলা দেখিয়া যান। তাঁহার পক্ষ হইতে লিখিয়া পাঠান হয় ;—

Belvedere, Calcutta
1st. January, 1901.

* * The Lieutenant Governor thought your performance a very creditable one and much enjoyed it.

(Sd.) J. Strachey
Private Secretary,
to H. H. Sir John Woodburn K. C. S. I.
Lieutenant-Governor of Bengal.

অতঃপর সার্কাস রেঙ্গুন যাত্রা করিল। তথায় যশ ও অর্থলাভ করিয়া তথা হইতে পিনাং ও পরে সিঙ্গাপুর হইয়া যবদ্বীপ পর্য্যন্ত বিজয় গর্ব্বে খেলা দেখাইয়া, অর্থে ও সম্মানে ভূষিত হইয়া, সে দেশের নূতন নূতন জীবজন্তু সঙ্গে লইয়া সার্কাস পুনরায় দেশে ফিরিল এবং কলিকাতার ময়দানে তৃতীয় বার 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' তাঁবু পড়িল (১৯০১ -২ খ্রীঃ)। এবার অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে বঙ্গদেশের প্রধান বিচারপতি পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন।

যাঁহারা এই বাঙ্গালীর সার্কাসের ক্রমপরিণতি স্নেহ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এবার খেলা দেখিয়া বাঙ্গালীর নৈপুণ্যে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন। বিখ্যাত 'Indian Mirror' পত্র লিখিলেন ;—

"Professor Bose has made a promising start and it is to be fervently hoped that his patriotic efforts at wiping out the unjust stain of physical cowardice, cast on the Bengali community, will be amply appreciated and substantially supported."

ইহার পর হইতে এই সার্কাস ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের নগরে নগরে যাইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে এবং ১৯১১।১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরই শীতকালে দেশে ফিরিয়া কলিকাতা ময়দানে নিত্য নূতন আশ্চর্য্য ক্রীড়া-কলাপ দেখাইয়া যে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে এখনও অনেকের মন হইতে বোধ হয় তাহার স্মৃতি বিলীন হইয়া যায় নাই। কলিকাতার খেলায় প্রত্যেক বৎসরই বহু প্রসিদ্ধ রাজা অথবা লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্ণর বা বড়লাট প্রভৃতি প্রোফেসার বোসের সার্কাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন অথবা খেলা দেখিতে আসিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে কয়জনের পত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আরও দুই একখানি পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে সন্নিবেশিত করিতেছি :—

High Court

Calcutta, 12th January, 1909.

* * I am directed by the Chief Justice of Bengal to say that * * His Lordship would be glad to accord his patronage to a performance of your Circus.

(Sd.) T. G. Waite

Secretary, the Chief Justice of Bengal

Government House

Calcutta 6th January, 1909

* * I am to inform you that their Excellencies * * * will be pleased to grant your show their patronage any evening.

(Sd.) Vincient Brooke, Lt. Colonel,

Military Secretary to the Viceroy.

Government House,

Calcutta the 29th January, 1909.

Dear Sir,

I am desired by their Excellencies the Viceroy and Countess of Minto to thank you very much for the Rs. 650/- you have been so good as to send me as a result of the entertainment given by you on Friday last in aid of Minto Nursing Association. Their Excellencies are very much gratified at receiving so handsome a donation to the funds of the Association.

The entertainment given by you was, I am assured, excellent in every detail.

Yours faithfully,

(Sd.) Vincient Brooke Lt. Colonel.

Military Secretary to the Viceroy

বাঙ্গালীর সার্কাসের ক্রমিক ইতিহাস হিসাবে প্রোফেসার বোসের সার্কাস প্রথম না হইলেও বাঙ্গালীর সার্কাস বলিতে প্রথমেই প্রোফেসার বোসের সার্কাস বুঝায়। যেমন রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা নাটক রচিত হইলেও তাঁহাকেই বাঙ্গালীর আদি নাট্যকার বলা হয়, অথবা যেমন 'মোহনবাগানের' পূর্ব্বে বাঙ্গালী ফুটবল ক্লাব গঠিত হইলেও প্রথমেই 'মোহনবাগানের' নাম করিতে হয়, ইহাও সেইরূপ।

কেবল বাঙ্গালী সার্কাস কেন, ভারতবর্ষে প্রোফেসার বোসের সার্কাসই ভারতীয়দিগের প্রথম ও প্রধান উল্লেখযোগ্য সার্কাস। প্রোফেসার বোসের সার্কাসের পূর্ব্বে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কোথাও কোন সার্কাস ছিল কি ছিল না, তাহার সঠিক সংবাদ জানা না থাকিলেও * সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতবাদ পড়িয়া মনে হয়

সার্কাস ব্যবসায়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে প্রোফেসার বোসের বাঙ্গালী সার্কাসই নিঃসংশয়ে সর্বপ্রধান।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রাওয়ালপিণ্ডির ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যাপ্টেন সি. ডেনিস 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' খেলা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"I have no hesitation in saying that the performance is the very best I have seen in India."

ইহারই এক বৎসর পরে জুনাগড়, সুরাট প্রান্তের এসিষ্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল এজেণ্ট জি, ই, হাইড্‌স্ কেট্‌স্ লিখিয়াছিলেন—

"Consider it is the best thing of the kind I have seen in India."

ঐ একই সময়ে গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব ভারত সিংহজী (K. C. I. E., L. L. D., D. C. O., M. B. C. M., M. R. C. P.,) লিখিয়াছিলেন :

"The Circus I believe is the very first of its kind in this country."

আরও তিনটি অভিমত এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

" * * I have no hesitation in saying * * that it is the best thing of its kind I have seen in India." * *

(Sd.) A. J. C. Wrench, Major,
23rd Royal Welch Fusiliers
2-5-95. ***Commanding, Jhansi***

" * * It is alone the best entertainment I have seen in India. **"

C. W. Whish
18-4-97. ***Collector & Magistrate, Saharanpur.***

"I think Professor Bose's Great Bengal Circus is the best I have seen in India." * * *

E. D. Bullen, Captain. R. E.,
Principal,
Thompson Civil Engineering College
27-4-97 Roorkee

---

* "হ্যারেস সার্কাস" নামক মারহাট্টি সার্কাস, বহু পুরাতন বলিয়া শুনিয়াছি।

'বোসের সার্কাস' ও স্বদেশী আন্দোলন

দেশের লোকের কায়িক দৌর্ব্বল্যে লজ্জাবোধ ও দেশের কলঙ্ক মোচনের প্রেরণা হইতে যে প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, তাহা তখনই দেশবাসীর নিকট বিশেষভাবে আদরণীয় হয়, যখন দেশের লোকের দেশের প্রতি মমত্ব-বোধ প্রবলভাবে জাগিয়া উঠে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগের পর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে যখন দেশাত্মবোধের প্রবল বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া গেল, তখন দেশবাসীর নিকট এই বাঙ্গালীর সার্কাসের নূতন করিয়া সমাদর লাভ ঘটিল। তখন এই বাঙ্গালীর সার্কাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য সাধারণের মনে প্রতিযোগিতা লক্ষিত হইতে লাগিল। 'বোসের সার্কাসের' * নাম তখন পথে, ঘাটে, মাঠে, লোকের মুখে মুখে ফিরিয়াছে। এখন যেমন লোক 'ফুটবল-ম্যাচ্' দেখিতে ছুটে, কতকটা সেইরূপ আগ্রহে তখন লোক গড়ের মাঠে 'বোসের সার্কাস' দেখিবার জন্য কাতারে কাতারে যাইত। 'বোসের সার্কাসের' সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পারিয়া পাশাপাশি অবস্থিত 'হার্মষ্টন' প্রভৃতি নামজাদা ইংরাজ কোম্পানীকে অল্প দিনের মধ্যেই তাম্বু গুটাইয়া জাহাজে উঠিতে হইত।

সে সময়ে গড়ের মাঠে 'বোসের সার্কাস' দেখিবার জন্য যে বিপুল জনসমাগম হইত, তাহা দেখিলে মনে হইত যে, দর্শকরা শুধু খেলা দেখিবার জন্যই সেখানে সমবেত হয়েন নাই; তাঁহারা প্রত্যেকে পয়সা খরচ করিয়া, যেন এক অভিনব জাতীয় মেলায়—অভিনব জাতীয় অনুষ্ঠানে—সম্মিলিত হইয়া দেশমাতৃকার চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিয়াছেন। তাহার উপর খেলার অবকাশে প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসু যখন স্বয়ং ক্রীড়াচক্রে (Ring) আবির্ভূত হইয়া স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় গুরু গম্ভীর স্বরে জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া জাতীয় ভাবদ্যোতক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা স্বদেশী-ব্রতকে দৃঢ়তর করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন ও বক্তৃতা শেষে তিনি যখন "বন্দেমাতরম" শব্দ উচ্চারণ করিতেন, তখন দর্শকমণ্ডলীর সমর্থনসূচক "বন্দেমাতরম্" রব 'বোসের সার্কাসের' বিশাল তাম্বু ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত; বুঝি সেই স্বদেশীর মল্লক্ষেত্রের তটভূমিতে জাতীয় ভাবের উদ্বেল সমুদ্র উছলিয়া পড়িত।

* স্বদেশী যুগে 'প্রোফেসর বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া 'বোসের সার্কাস' নামে প্রচারিত হয়।

এই সময়ে কিছুদিনের জন্য খেলার মধ্যে মধ্যে সার্কাসে নৃত্য-গীতের আয়োজন হইয়াছিল। এজন্য প্রিয়নাথ নিজে কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন। * সে সব গানেও স্বদেশী ভাবের অভিব্যক্তি ছিল, যথা—

"ভারত সন্তান সব
জাগরে জাগ আজ,
যুক্ত আঁখি মুক্ত কর
আর কেন কাল ব্যাজ!
উন্নতি চাওরে যদি
বিনা ব্যায়াম মহানিধি
স্বর্গাদপি গরীয়সী দেশ ভস্ম
হয় আজ!"

এই সময়ে অনেক দেশপূজ্য নেতা মধ্যে মধ্যে 'বোসের সার্কাসে' আসিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। এক বার পঞ্জাব-কেশরী লালা লাজ্‌পত্‌ রায় সার্কাস দেখিতে আসেন; সেই উপলক্ষে প্রিয়নাথ তাঁহার জন্য অভ্যর্থনা-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন ও তাহা ক্রীড়াচক্রে গীত হইয়াছিল। তাহার প্রথম দুই লাইন মনে পড়ে; তাহা এইরূপ:—

"আও লালা লাজ্‌পত্‌ হৃদয় কি ধন্‌,
ভারত্‌ কি দোস্ত্‌ তোম্‌ ভারত্‌-ভূষণ।"
ইত্যাদি

তখন 'বোসের সার্কাস' দেশবাসীর কত আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং 'বোসের সার্কাসকে' দেশের লোক ঘরের জিনিষ ভাবিয়া তাহার জন্য কতটা গর্ব ও দরদ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সেই স্বদেশী যুগের প্রচারিত সংবাপত্র-সমূহের অসংখ্য প্রশংসা ও অজস্র উচ্ছ্বাস-বাণী পাঠ করিলে বুঝা যায়। বাহুল্য ভয়ে প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের মাত্র কয়েকটি মতাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

স্বদেশী যুগের 'মন্ত্রগুরু' 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রোফেসার বোসের সার্কাস সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

" * * Apart from the preferential claim on the people of India to which the Professor and his troupe are naturally inclined,

---

* কতকটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রিয়নাথ বসুর সাহিত্যে ও রসরচনায় যে অধিকার ছিল, তাহা তাঁহার রচিত 'প্রোফেসর বোসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত' পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

the party is justifying its title more strongly in succeeding years to special patronage and support at the hands of the Indian public by dint of sheer comparative merit in fair field. When however the fact that the Professor is our own, a Bengalee of all Bengalees who is vindicating Bengal's cause before the eyes of the world in the field of athletics, equestrianism, animal training and acrobatic performances, is taken into consideration, we do not know if any Indian with a true fire of patriotism glowing in his bosom ought to fail to lend his support to Professor Bose."

The Amrita Bazar Patrika, 2-12-07

" * * Superfluous to add that among items advertised are many which excel anything seen in the West and as such are a credit to Asia and particularly to Bengal." * *

The Bandemataram, 8-1-08.

" * * The Circus has been doing splendid service in its own way to the Country."

The Hindu Patriot, 28-12-08.

" * * The Circus is indeed the pride of the Bengalees."

The Bengalee, 10-2-09.

"Bose's Circus presents extraordinary interesting object lesson and the performances are the index of the capabilities of the modern Bengalee. The performances at the Bose's Circus testify to the .pluck, never and power of adaptation developed by the modern Bengalee. * * "

The A. B. Patrika, 1-3-09.

"Bengalees are said to be worthless people who can only talk, with no manliness or power of organisation and only a race of

imitators. Bose's Circus gives lie to this statement. We all know that the Simultaneous Civil Service Examination in England and in India was not held on the ground that the Bengalee might capture the majority of appointments in the Civil Service This is high complement to the intellectual powers of the people of Bengal. But Mr. Bose has proved that even Bengali girls can do feats of daring that would reflect credit on the best European and American artistes. * * When we first saw Chirany's Circus, we could not imagine that Bengalees would ever emulate the performances of this troupe. But Bose's Circus has dispelled this illusion. We are unable to say which of the performance of this troupe we admire the most—they are all equally "Wonder of the Age.' * * We not only congratulate Mr. Bose but are proud of him and his troupe. They have raised the Bengali nation in the estimation of the public. * * "

The Hindu Patriot, 1-3-09.

" * * It makes a Bengalee proud to think that such daring feats are performed by his own class on whom wanton insult has been poured as being weak and lily-livered. The fact that Bengalee young men, women and children do such daring acts gives the lie direct to such malicious accusations. * * "

ইন্দুবালার একটি অসমাপ্ত রচনার খসড়া

শ্রীশ্রী৺কালীমাতা সহায়

মাদ্রাজ
১৪।৭।৩৮
বৃহস্পতিবার

॥ ভূমিকা ॥

"ভ্রমণ কাহিনী" লেখবার ক্ষমতা আমার কোনদিনই ছিল না, এখনও নেই। আমার উপস্থিত স্বামীর স্থানে যিনি আছেন, তিনি শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর ঝা, তিনিই এসব বিষয়ে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য রাখেন। তাঁর এসব লেখবার শখও খুব। অথচ আমার নামেই লেখেন, আর বলেন ইন্দু লিখেছে। আমি তাঁর এই সুন্দর সরল ভাষায় লেখা কোনদিন প্রকাশ করতে পারবো কিনা জানি না। তবে তাঁর এই বাঙলা লেখার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারি না এবং আশ্চর্য্যও হয়ে যাই। কারণ তিনি দেওঘর নিবাসী মৈথিলি ব্রাহ্মণ (হিন্দুস্থানি); তাঁর এ ক্ষমতা দেখে আমার ন্যায় সামান্য নারী মুগ্ধ হওয়া কিছু বাহুল্য নয়। আমার মনে হয়, বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্রলোক যিনিই পড়বেন মুগ্ধ হবেন নিশ্চয়। আমি এই মাদ্রাজে "পার্থসারথী" মন্দির যা-যা দেখেছি সাধ্যমত তাঁকে লেখাবার জন্যই সাদাসিধা ভাবে লিখে রাখছি। পরে তিনি লিখে দেবেন ভাষার মালা গেঁথে।

ইন্দু

॥ পার্থসারথী মন্দির ॥

আমি প্রথম মাদ্রাজে আসি ইং ১৯৩৫ সালে ডিসেম্বর মাসে। তখন মাদ্রাজে যা-যা দেখেছি তা লিখেছেন আমার বাবু ইং ১৯৩৬ সালে জুন মাসে যখন মহীশূরে আসি। সেই মহীশূর ভ্রমণেই আমার নাম নিয়ে মাদ্রাজ ভ্রমণ লেখেন। তৃতীয় বার ইং ১৯৩৭ সালে আবার মাদ্রাজ এবং মহীশূর আসি। এবার চতুর্থ বার। বাবু আমার এবারে মাদ্রাজে ১২ দিন রইলেন কিন্তু তাঁর

এখনো কোন মন্দির দেখা হল না। পূর্ব্বে যখনই আসতাম অনেককে জিজ্ঞাসা করতাম যে, এখানে কি মন্দির আছে? কেউ কিছু বলে না। কাজেই মনে করতাম যে, হয়ত ছ'একটা মন্দির সাধারণ ভাবেই আছে, তা না হলে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই দেখাতেন। বাবুর সঙ্গে বিদেশে একসময় সাতদিন কাটাই। মহীশূর, রামেশ্বর, ধনুষকোটী, মাতুরা, মান্দ্রাজে ১১ দিন। তারপর অভাগিনীর কপাল দোষে, (কারণ আমার জীবনে শান্তি নেই) বার মাস বাবুকে নিয়ে এক সঙ্গে বাস করবার উপায় নেই। তাঁর ও আমার সংসারই আমাদের এ ব্যবধানের সৃষ্টি করে। আমি এই তিন বৎসর সমানে রোজগার করি। বাবু বৎসরে অধিকাংশ সময় অর্থাৎ বৎসরে ৯ মাস আমায় নিয়েই থাকেন এবং আমার নানা রোগের সেবা এবং আমার সঙ্গে ঝগড়ায় পাল্লা দেওয়া, কিম্বা আমার এক মুখে চীৎকার, তা নীরবে শোনা, এবং ভয়ে চুপ ক'রে থাকেন। এমন কি তাঁর পিতা পর্যন্ত— সেই মানুষ আমার ঝগড়াকে বড় ভয় পান। আর ভয় করেন আমার মায়ের ব্যবহারকে। সেই শান্তিময় বাবু আমার তাঁর ছোট পুত্রের "টাইফয়েড" হওয়াতে চলে যেতে বাধ্য হন। যেতে কি চান! বড় ছেলের চিঠি আসছে। আমি বলি, কি হবে? বলেন, দেখি আর ছ'একদিন, কিন্তু টেলিগ্রাফ পেলেন যেদিন—সেদিন খালি একটি কথাই মনের ভেতর জাগে। (মাণিক! ছেলে আমায় যদিও ফাঁকি দেয়, তুমি আমায় ফাঁকি দিও না, আমার হ'য়েই থেকো)।

কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। আমার যন্ত্রণা আর কাকে জানাই, জানেন অন্তঃর্য্যামী ভগবান। আর জানেন বোধ হয় আমার জীবন দেবতা। রাত্রে তাঁর পাশে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। কত দুঃখ করেন। ঠাট্টা করে বলেন যে, তোমার ঘুম আমার সতীন। কত রাত্রি একটানা দীর্ঘশ্বাসের ওপর দিয়েই কাটে। খুব খানিকটা বকলাম। পরে ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে, দেখি কাঁদছেন। সমস্ত রাত কেঁদে কেঁদে সুন্দর মুখ শুকিয়ে বড় বড় চোখ দুটি ফুলিয়ে আমার দিকে ড্যাব-ড্যাব ক'রে চেয়ে থাকেন। হা ভগবান! তাঁকে এত কষ্ট দিই ব'লেই কি আমার কাছ হ'তে সরিয়ে নিয়ে গেলে! বিদেশে এই তিন বছরে মাত্র তিন দিন "ঢাকায়", তাও সমস্ত

রাত দিন দাস্ত ক'রে এবং বার্লী খেয়ে গান ক'রে কেটেছে। ২ রাত্রি ট্রেনে। আর তো কখনও বিদেশে ছেড়ে থাকিনি তাঁকে। আজ ৭দিন ছেড়ে আছি। জানি না আর কতদিন ছেড়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমি পাচ্ছি না আর এক মিনিট ছেড়ে থাকতে। প্রাণ অসম্ভব ছট্‌ফট্ করছে। সময় সময় মনে হয় বুঝি প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। অথচ চুপচাপ ক'রে যাচ্ছি। গলাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। উপরের পরদা একেবারে ওঠে না। ভগবান জানেন অদৃষ্টে কি আছে। মনের এই যখন অবস্থা তখন গতকাল স্টুডিওতে পণ্ডিত নরোত্তম ব্যাসের জামাই বললেন, মা! পার্থসারথী মন্দির দেখতে যাবেন? আশ্চর্য্য হ'লাম। মন্দিরের কথা তো কেউ বলে না। জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা ভাল দেখতে ত? বললেন, এমন মন্দির কখনও দেখেননি। বললাম, বেশ যাব। সন্ধ্যা ৬টায় ফিরলাম রিহার্শাল দিয়ে।

জামাইবাবু ৭॥ টার সময় এলেন। তাঁকে দিয়েই ৩ খানা রিক্সা যাতায়াত ছয় আনা ক'রে এক টাকা ছ' আনায় ঠিক ক'রে, মা, আমি, সঙ্গসখা নন্‌কা, কালী ওস্তাদজী, জামাইবাবু রওনা হলাম, কাকা ও মিছরি চাকর বাড়ীতে রইলেন। গাড়ী চলেছে, জামাইবাবু বল্লেন যে, আপনাদের বিশেষ করে নিয়ে যাচ্ছি, আজ হচ্ছে মন্দিরের শেষ উৎসব। রথের দিন হতে উৎসব হয়। ভগবানের রথযাত্রা হয়। আজ "উল্টোরথ", আজই উৎসব শেষ হয়ে যাবে। ট্রিপ্লিকোণে, মন্দিরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। নামলাম, দেখলাম সামনে এক সুন্দর পুকুর। পুকুরটা চওড়ায় ও লম্বায় ঠিক দেওঘরের শিবগঙ্গার ন্যায়। কত ফুট জানি না, বাবু ঠিক করে নেবেন। পুকুরের চারিধার সিঁড়ি দিয়ে বাঁধান। প্রায় ১০/১২টি করে ধাপ হবে, সিমেণ্ট দিয়ে ধাপ তৈরী। জলের মাঝে একটা সুন্দর মাঝারি গোছের মন্দির। ছেলেবেলা কালীঘাট ভবানীপুরে এক "জল টুঙ্গি" দেখেছিলাম, ঠিক সেই রকম। আর পুকুরটার চারিধার লোহার রেলিং দিয়ে বাঁধান। চারিধারে ৪টা ফটোক আছে। তার ভেতর দিয়েই সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। পুকুরের নাম জানতে পারিনি। তবে মাঝে ঐ মন্দির থাকবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে শুনলাম যে মন্দিরের ভেতর যত দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে, এবং পার্থসারথীর দু'টা করে মূর্ত্তি আছে। এক পাথরের মূর্ত্তি—তিনি মন্দিরেই স্থিতিভাবে আছেন। সে মূর্ত্তি নড়াবার

ক্ষমতা বা নিয়ম নেই। আর সোনার যে মূর্ত্তি তা গঠনে ছোট, সেই মূর্ত্তি-গুলি নিয়ে প্রতি পার্ব্বণে—যেসব পার্ব্বণ এদেশে প্রচলিত আছে সেই পার্ব্বণের দিনে মন্দিরের চারিধারে প্রদক্ষিণ করায়। আর পার্থসারথীর সোনার যে ছোট মূর্ত্তি তাঁকে নিয়ে পুকুরে এক বড় গোছের নৌকা আছে; ৺কাস্তী পঞ্চমীর দিন নৌকায় বসিয়ে যত পুরোহিত আছেন বাবার মন্দিরে তাঁরা সকলে মিলে নৌকায় ব'সে ভগবানের সঙ্গে জলবিহার করেন, আর সিঁড়ির ওপর যত লোক দর্শক থাকেন, তাঁরাও সব বালতি ক'রে আবির গুলে পুরোহিতের গায়ে দেয়, ভগবান পার্থসারথির গায়ে দিয়ে থাকেন। পুরোহিতরাও সকলের গায়ে দেন, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নাকি। ভগবান ও ভক্তরা সকলেই "হোলি" খেলেন। এটা প্রতি বৎসর এই পঞ্চমীর দিন ছাড়া আর কোনদিন হয় না। তারপর পুকুরের মাঝে সেই মন্দিরে ভগবান পার্থসারথীকে নিয়ে গিয়ে স্থাপিত করেন। এই খেলা-উৎসব সকাল বেলাই হয়। দুপুরে পাহারার বন্দোবস্ত ক'রে সকলে স্নান ক'রে ঘরে ফিরে যান। সেই সময় নাকি মন্দিরের দেবতা ভগবান পার্থসারথী পুকুরের মন্দিরের দেবতার সঙ্গে দেখা করে আসেন। প্রবাদ আছে যে, "বড় দেবতা" "ছোট দেবতার" সঙ্গে ঐ দুপুর বেলা হোলি খেলেন। সন্ধ্যায় পুকুর দেবতাকে মন্দিরের ভেতর খুব ধুমধাম ক'রে বাজনা বাজিয়ে প্রদক্ষিণ করে ঘরে তোলেন।

এবার মন্দিরের ভেতর প্রবেশ ক'রলাম। সামনেই নাটমন্দির, সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দু'পাশে দু'টা প্রকাণ্ড বড় কষ্টিপাথরের ধারে ধারে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। মনে হ'ল যেন ইলেক্‌ট্রিক খুব বেশী বেশী ক'রে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরে উঠতে যাচ্ছি হঠাৎ চারিধারে গোলমাল শুনে চেয়ে দেখি যে অনেকগুলি দোকান, আর হীরের মত সব চক্‌চক্‌ ক'রছে। আরও হঠাৎ মনে হয়ে গেল যে আমার পায়ে জুতো রয়েছে। তখন জামাইবাবুকে বল্লাম যে জুতো কোথায় রাখি? তিনি তখন আমায় এক মাটির খেলনার দোকানে গিয়ে জুতো খোলালেন এবং ওস্তাদজী, মা, জামাইবাবু সকলেই জুতো খুলে রাখলেন। মাটির খেলনা! কি চমৎকার সব জগ্‌জগার গুঁড়ো দিয়ে তৈরী ক'রেছে। যেন হীরের পুতুল। অবশ্য এ পুতুল আমার ঘরে ক'টি আছে। মাটির এই রকম খেলনা মাদ্রাজ স্টেশনে বিক্রি ক'রে এবং স্টেশনের সামনে

যে 'স্যার রামস্বামী মুদলিয়ার ধর্মশালায়' প্রতিবার আমি মহীশূর যেতে যেখানে সমস্ত দিন অপেক্ষা করি, সেখানেও বিক্রি ক'রতে আসে। সেই পুতুলের দোকানে ঢুকে মনটা আমার চঞ্চল হ'য়ে উঠল। স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। যেন জগৎ-সংসার ভুলে গেলাম।

তারপর জামাইবাবু ব'ল্লেন যে রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে, শীঘ্র আসুন। একটা পাণ্ডা এসে আমাদের পাকড়াও করলেন, হঠাৎ কতকগুলি মাদ্রাজের মেয়ে এসে হাজির হ'লেন, তাঁরা সব জামাইবাবুর পরিচিত। তিনি আমার নাম ক'রে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ক'রিয়ে দিলেন। তাঁরা বল্লেন যে আসুন ইন্দুবালা, আমরা সব দেখাচ্ছি। (অবশ্য হিন্দি ভাষায়) পাণ্ডাকে বিদায় ক'রে দিলেন। মন্দিরের চারিধারে অসম্ভব ভীড়। মেয়ে-পুরুষের ভীড়ে মন্দিরে ঢুকব কি, দোকানগুলিতে পর্যন্ত অসম্ভব ভীড়, দোকানগুলি মন্দিরের চত্বরের ভেতর।

যে দরজায় প্রথম ঢুকে ছিলাম, সে দরজায় না গিয়ে অপর আর একটা সিংহ দরজায় প্রবেশ করলাম। সামনেই দেখি এক প্রকাণ্ড কাঠের ছাতা। রং সাদা, দেখলে মনে হয় যেন কাপড়ের ছাতা। তাতে আবার কাঠের ঝালর দেওয়া। প্রায় ৬।৭ ব্যাস হবে। সকলে তামিল ভাষায় 'সরে যাও, সরে যাও' ক'রে চেঁচাচ্ছে। একে রাত্রি, তার ওপর অসম্ভব ভীড়, আমরা অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম যে, সোনার প্রকাণ্ড বড় তাঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছে। আজ উল্টোরথ, সে কারণ ভগবানকে ঐ তাঞ্জামে ক'রে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে। ভাবলাম ঠাকুর রথে না চ'ড়ে পাল্কীতে ঘুরবেন এর মানে কি? মেয়েগুলোকে জিজ্ঞাসা করতেই তারা বল্লে, ঐ যে চেয়ে দেখুন, ভগবান বৈকালে রথে চড়ে ছিলেন। রাস্তায় চেয়ে দেখি, তাই ত। প্রকাণ্ড এক কাঠের সুন্দর রথ। অবশ্য কুম্বকোনামের রথের চেয়ে ছোট, এবং গঠন-প্রণালী ঠিক পুরীর রথের ন্যায়। ভিতরে ঢুকতেই একপ্রস্থ উঠান। উঠান পার হয়েই আবার দেখি যে সিঁড়ির দুপাশে দুটো কালো পাথরের হাতি। আগে যে দরজায় গিয়েছিলাম সেটা "মহালক্ষ্মী" দেবীর মন্দিরের দরজা। এবার ৺ভগবান পার্থসারথী মন্দিরের ভেতর যেতেই দুটি ঐ হাতি দেখলাম। সিঁড়িতে উঠে সরু গলির মত খানিকটা চলে যেতেই তারপর দেবতার মন্দির। দরজা

বন্ধ ছিল। পূজারী বল্লেন, দরজা খুলে দেব কি? আমি ব'ল্লাম, না, আমি একদিন সকালে এসে ভগবানের পূজা দেব। কখন দরজা খোলা থাকে? বল্লেন, সকাল ৭টা হ'তে ১২টা পর্যন্ত, কিন্তু আমার দেবতাদর্শন হ'ল। দেখলাম মন্দিরের যে দরজা তা খুব বড় এবং দরজায় চোখ দিয়ে দেখবার জন্য অসংখ্য গোল গোল ছিদ্র রয়েছে ও প্রত্যেক ছিদ্রের মাঝে মাঝে ১টা ক'রে পিতলের হুক্, এবং তাতে ১টা ক'রে পিতলের ঘণ্টা ঝুলছে। ছেঁদা দিয়ে ভগবানের রূপ দেখলাম। কষ্টিপাথরের মুখখানি খুব বড়, ভগবান লম্বায় প্রায় ৪।৫ হাত হবেন, বড় সুন্দর অপূর্ব মুখ। আর সব সোনা দিয়ে মোড়া। একটা সোনার দণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পা দুখানি বড় সুন্দর, লম্বা চওড়ায় খুব বড়। মনে হয়, পা দুখানি জড়িয়ে ধরি। অসংখ্য ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। ভগবানকে দেখতে দেখতে বাবুর জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠল। হায় রে, আমার মাণিক ৪বার এলেন, ভগবানের এ বিরাট সুন্দর মূর্ত্তি দেখা হল না। পালিয়ে এলাম কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে। সবাই মনে কল্লেন যে ভক্তের প্রাণে ভক্তিরসের বন্যা ফুটল বুঝি। কিন্তু তা নয়। আর দেব দেবী দেখবার আগ্রহ রইল না। প্রাণের ভেতর ছট্‌ফট্ সুরু হল। কিন্তু সবাই র'য়েছেন। বাধ্য হ'য়ে মহালক্ষ্মীর মন্দিরে গেলাম। কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, সোনার মূর্ত্তি। হীরা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। আগাগোড়া হীরা দিয়ে মুড়ে রেখেছে, সমস্ত হীরার গহনা। আরও দু'চারটা ঠাকুর দেখলাম। পরে খেলনার দোকানে ঢুকে মন ঠাণ্ডা হ'ল। কিন্তু মন্দিরের সৌন্দর্য্য ইত্যাদির জন্য মনে ২ সংকল্প করলাম যে ২য় দিনের দিন বাবুর ও আমার পুত্রের জীবন ভিক্ষা ক'রতে আসব ও দিনের আলোয় সব দেখতে পাব, এবং সব লিখে নিয়ে গিয়ে বাবুকে দিয়ে লেখাব। আর আমার ভাষাহীন বইটা বাবুকে দেব। এতে আর কিছু না থাক আমার ও পুত্রের জীবন রক্ষার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে ৺ভগবান পার্থসারথীর দয়ায়। সুন্দর সুন্দর পুতুল ঝকঝক করছে, ছোট পুতুল এক আনা ক'রে মাত্র দাম। অথচ চোখ-মুখ দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। মনে হয় এখানকার কুমোররাও কৃষ্ণনগরের চাইতে কম যায় না। এরাও সত্যকার আর্টিষ্ট! প্রায় এক টাকা পাঁচ আনার পুতুল কিনে নিলাম। কলকাতায় একটা আলাদা আলমারীতে রাখব। কলকাতার প্রত্যেক

লোককে দেখে মুগ্ধ হতে হবে। ওস্তাদজীও এক টাকার বড় বড় কিনলেন, জন্মাষ্টমীতে সাজাবার জন্য। একে রাত্রিকাল, তার ওপর কতকগুলি পুঁটলি আমার হাতে দেওয়ায় আমার ঘুমন্ত মন জেগে উঠল। হায় বাবু! কখনও পানের ডিবেটা পর্য্যন্ত হাতে নিতে দাও না। আর আমার হাতে আজ কত বোঝা। কই, কেউ ত দয়া ক'রলে না। মায়ের হাতেও অনেক জিনিষ, বাড়ি ফিরে এলাম। প্রাণের ভেতর কেমন করে উঠল. রাত্রে খানিকটা কেঁদে তবে প্রাণ ঠাণ্ডা হল। কদিন দাস্ত হওয়াতে বড় কষ্ট পেলাম। রবিবার সকালে মিশ্রি চাকরকে নিয়ে কাকা, মা, আমি ২খানা রিক্সা করে গেলাম। প্রথমেই কৃষ্ণ মূর্ত্তির সঙ্গে দেখা হল। তাকে দিয়ে ঠাকুরের পূজার জন্য ১ নারিকেল কলা রেলি কর্পূর ফুল ইত্যাদি ভ'প্রস্থ করে কেনা হল। ভগবানের মন্দিরের নাটমন্দিরের সামনে দেখি, প্রকাণ্ড একটা পাথরের স্তম্ভ, মাঝে সোনার একটা প্রকাণ্ড ঢিবির ন্যায় কারুকার্য্য করা। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ঢিবিটির নাম "বলিপিট"। তারপরই হচ্ছে সোনার প্রকাণ্ড বড় চার স্তম্ভ, প্রায় ৬০ ফিট লম্বা। সেদিন দেখতে পাইনি, ফলে আশ্চর্য্য হলাম। আরও আশ্চর্য্য হলাম যে, বৃন্দাবনে মাত্র ১টি জয়স্তম্ভ সোনার আছে বলে লোকে গোবিন্দজীর নাম আগে না করে বলে, বৃন্দাবনে যখন যাবে একবার সোনার "তালগাছ" দেখে আসবে।

হাঁ, আমিও দেখেছি, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের যে কোন দেশে যে কোন মন্দির হোক না কেন, ঐরূপ "তালগাছ" সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয়, দক্ষিণের লোকেরা সোনা নিয়ে বুঝি রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে বেড়ায়। এ দেশে যেমন নারিকেল গাছের ছড়াছড়ি, তেমনি সোনার "তালগাছের" ছড়াছড়ি। জয়স্তম্ভের সামনেই একটা মস্ত বড় ঘর। তার ভেতর ভগবানের সোনার তাঞ্জাম, সোনার অঙ্গ সৌষ্ঠব, অপূর্ব কারুকার্য্যময় সোনার দোলনা, ৪।৫টি বড় ছাতা, সোনার বাঁট দেওয়া। কত কি রয়েছে। দুজনে দরজার দুপাশে পাহারা দিচ্ছে। সিং দরজা হতে নাটমন্দির পর্য্যন্ত ছাদগুলিতে তুলি দিয়ে রং করা দেবদেবীর মূর্ত্তি চিত্রিত করা। মাদুরার সিং দরজার চিত্রের চাইতেও দেখতে ভাল লাগে। ভগবানের মন্দির যেতে আবার সেই হাতি ও গলি দেখলাম। এবার গলির ভেতর যেতে বাঁ দিকে দেখি একটানা

১০।১২টা জানালা রয়েছে। উঁকি মেরে দেখি জানালাগুলিতে গরাদ দেওয়া ও ভেতরে অনেকগুলি পাথরের মানুষের মূর্ত্তি, আর সব মূর্ত্তিগুলিই মাথা ন্যাড়া ও টিকি রয়েছে। গেরুয়া কাপড় পরনে। হাত জোড় করে কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্ত্তিগুলির পেছনে দেওয়াল, একটা লম্বা সরু ঘর, প্রত্যেক জানালায় ঐ রকম দেখলাম। জিজ্ঞাসা করাতে জানলাম যে, ৬৪ জনের মূর্ত্তি, এরা সকলেই ভগবান পার্থসারথীর ভক্তগণ এবং সকলেই দেহ রেখেছেন। ভগবানের প্রকৃত ভক্ত যিনিই মারা যাবেন, তাঁরই মূর্ত্তি তৈরী করে রাখা হবে। এবার ভগবানের দরজার কাছে পৌঁছতে দেখলাম, দরজার দু'পাশে রেলিং দিয়ে ঘেরা দুটো পাথরের বড় বড় দ্বারপাল। ভেতরে ঢুকলাম, অসম্ভব গরম, মাথা ঘুরে যায়। সামনেই ভগবানের বিরাট লম্বা চওড়া মূর্ত্তি। কাপড় পরে আছেন কিনা লক্ষ্য করলাম। না, আগাগোড়া সোনার পাতে মোড়া হাত পর্য্যন্ত। খালি কালো কালো আঙুল কটি দেখা যাচ্ছে। পা দুটো দেখা যায় কুলোর মত, চওড়া চরণযুগল, সেই উপযুক্ত সোনার নূপুর। ১ভরির কম বলে মনে হয় না। পূজা দিলাম, কর্পূর জ্বালতে দেখি, ভগবানের বাঁ দিকে একটু তফাতে রুক্মিনী দেবীর মূর্ত্তি, ভগবানের চাইতে লম্বায় সামান্য ছোট। চওড়ায় ঠিকই আছে। কষ্টি পাথরের মূর্ত্তি, ঢলঢলে চোখ দুটি, ঠোঁটটি হাসিতে ভরা। ভগবানের ন্যায় সমস্ত সোনায় মোড়া। ভগবানের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। চেয়ে থাকবার সুবিধা হয়েছিল, তার কারণ প্রদীপ খুব অল্প জ্বললেও বিস্তর লোক পূজা দিচ্ছিলেন, আর অনবরত কর্পূর জ্বলে উঠছে। কাজেই আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখেছি যে, তাঁর মুখের গঠন অতি সুন্দর, চোখ ঢলঢলে হ'লেও মুখের ভাব গম্ভীর, আর যেন জগতের পাপী-তাপী সবাইকে অভয় দিচ্ছেন। কেঁদে ফেললাম। বসন্তর জন্যে প্রাণ ভিক্ষা চাইলাম। বল্লাম, ঠাকুর, আমি ডাকতে জানি না। কিন্তু তোমার এই বিরাট মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমার প্রাণ শান্তিতে ভরে গেল। তোমার বিরাট রূপ। তুমি আমায় বিরাট কাজ দেখাও। আমার বাবু, আমি তাঁকে ভালবাসি। সে তো তোমার অজানা নয় দেবতা! তুমি তাঁর পুত্রকে বাঁচিয়ে দিয়ে তাঁর ও আমার এ কলঙ্ক মোচন্ কর। তুমি সত্য আমায় দেখিয়ে দাও। একদিন

বড় জ্বালায় ৺বৈদ্যনাথকে ডেকে তিনি যে সত্য জেনেছি। ৺মা শীতলাকে ডেকে তিনি সত্য জেনেছি। এখন তুমি সত্য জানতে চাই। আমার বাবু এখানে যখন আসবেন আপনার শ্রীচরণে পূজা দিয়ে যাবেন। শাস্তি মনে চাইতেই দেখি, আমার নারিকেল দুটো নিয়ে পূজারী ভগবান চরণে নারিকেল ফাটিয়ে জল ঢেলে দিলেন। পূজা সার্থক হ'ল। ব্রাহ্মণকে বল্লাম, বাবা, ভগবানের চরণের ফুল আমায় দিন। তিনি দিলেন। যত্ন ক'রে রেখেছি। বসন্তর জন্য মাদুলিতে দেব। ডান দিকে মুখ ফেরাতে দেখি যে, সোনার সিংহাসনের ওপর ছোট্ট পার্থসারথী মূর্ত্তি। জিজ্ঞাসা করাতে জানলাম যে ইনিই ঘুরে বেড়ান। গায়ে সমস্ত হীরার গহনা। মুকুট হ'তে নূপুর পর্য্যন্ত হীরার। পূজা হ'তেই বাইরে এসে গলির মধ্যে একটু বসলাম বড় মাথা ঘোরার দরুন। ২।৩দিন পেটের অসুখে ভুগে বড় দুর্ব্বল হ'য়েছিলাম। একটু আসতেই দেখলাম সে পাথরের হনুমানজীর মন্দির।

এবার অন্য এক উঠান দিয়ে মহালক্ষ্মী মন্দিরে গেলাম। হীরের মুড়ে দেবী বসে আছেন। সোনা দেওয়া মুখখানি ঢলঢল ক'রছে। পূজা দিয়ে ফুল নিয়ে ফিরলাম। তারপর আবার এক উঠান পার হয়ে "অণ্ডাল দিবা" পাথরের মূর্ত্তি সোনা ও হীরার গহনা পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্ত্তির গঠন মাঝারি। ইনি হচ্ছেন ৺ভগবান পার্থসারথীর স্ত্রী। আবার খানিকদূর গিয়ে এক দেবীর মন্দির। ইনিও পাথরের, বসে আছেন। ওঁর নাম "পয়ার বেদবল্লী তায়ার"। ইনি হচ্ছেন ত্রিচিনাপল্লীর দেবতা রঙ্গনাথের স্ত্রী। জিজ্ঞাসা করলাম, স্বামী ছেড়ে ইনি এখানে কেন? বাজে বকতে সুরু করলেন পাণ্ডা ঠাকুরটা। কোন রকমে থামালাম। আবার খানিকদূর গিয়ে আর এক মন্দির। ইনি হচ্ছেন দেবতা বরদরাজ "কাঞ্জীপুরম্"। এই দক্ষিণেই এক দেশ আছে। সেইখানকার মূর্ত্তি, কষ্টিপাথরের। আরও কিছুদূরে কষ্টিপাথরের নরসিংহের মন্দির, সারা অঙ্গে সোনার গহনা। আরও কিছুদূর গেলে সোনার বিষ্ণু মূর্ত্তি। এক কথায় চমৎকার হীরার গহনা সারা অঙ্গে। মন্দিরে বড় বড় সিংহ দরজা ২টা আছে। আর ভগবানের ও মহালক্ষ্মীর দরজায় অসংখ্য গোল গোল ফুটো ও অসংখ্য ছোট ছোট পিতলের ঘণ্টা ঝুলছে। ঢোকবার সময় সবাই একটা একটা করে

বাজিয়ে ভেতরে ঢুকছে। সারা মন্দিরটা ঘুরে দেখলাম যে মন্দিরটা যেন একটা গোলকধাঁধা। দু'দিন গেলাম, কিন্তু কোথা দিয়ে যে কোথায় নিয়ে গেল তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে মনে হয় যে ৺ভগবানের ও মহালক্ষ্মীর মন্দির দু'মহলে দু'জন আছেন। মন্দির খুব বড়, চওড়া কতখানি জানি না। তবে ৺বৈদ্যনাথের মন্দিরের চাইতেও উঁচায় বড় না হ'লেও চারিধার মস্ত বড় এবং উঠান ৩।৪টা। চারিধার বাবা বৈদ্যনাথের চেয়ে ঢের বেশী বড়। আমার বোধ হয় বাবু এর অনেকটা বুঝতে পারবেন। প্রদক্ষিণ সব মন্দিরেই করতে হয়। এইবার বাইরে বেরিয়ে এসে মন্দিরের চূড়ার দিকে চাইলাম। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। একেবারে নতুন রকমের তৈরী। পুরীর ৺জগবন্ধু মন্দিরের ন্যায় লম্বা চওড়া। গঠন প্রণালী অনেকটা ৺রামেশ্বরজীর মন্দিরের ন্যায়। কিন্তু কারুকার্য্যে কারোর সঙ্গে মিল না রেখে আলাদা ফ্যাসানের ক'রেছে। বর্ণনা ক'রে বোঝাবার ক্ষমতা নেই, তবু চেষ্টা কচ্ছি। বাবু করবেন। মন্দিরের চূড়ায় এক প্রকাণ্ড সোনার চালচিত্র। ঠিক দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রের ন্যায়। মধ্যে সোনার সিংহাসনের ওপর সোনার বিষ্ণুমূর্ত্তি ব'সে রয়েছেন। তার দু'পাশে দু'টা সোনার সখী, মূর্ত্তিগুলি কেউ ছোট নয়। মূর্ত্তিগুলি ৩।৪ হাতের কম নয় লম্বায়। চালচিত্রটা খুব বড়, দুর্গা প্রতিমার যেরূপ বড় চালচিত্র হয় ঠিক সেই রকম। চূড়ার চার কোণে খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সোনার ৪টা গরুড় মূর্ত্তি। ভাবটি ঠিক যেন ডানা মেলে উড়ে যাবে। দেখলে মনে হবে যেন শূন্যে রয়েছে। মন্দিরের সঙ্গে লেগে নেই। এমন বসাবার কৌশল যে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। ....

পাণ্ডুলিপিটি এর পর আর লেখা হয়নি।

ইন্দুবালার কয়েকটি চিঠিপত্র

ইন্দুবালা দেবী চিরদিনই চিঠিপত্র লিখতে উৎসাহী এবং পত্রের সময়মত জবাব দেবার ব্যাপারেও তিনি আজীবন নিষ্ঠাবতী। দৃষ্টিশক্তি প্রায় নিঃশেষিত হবার পূর্ব পর্যন্তও অসংখ্য চিঠিপত্র দীর্ঘকাল ধরে তিনি দেশে বিদেশে নিয়মিতই লিখে এসেছেন। তাঁর অনুরাগীদের কাছে পত্রের প্রত্যুত্তরের সংখ্যাও প্রায় কয়েক হাজার। নৈহাটীতে শ্রীমতী গৌরী বসুকে লেখা পত্রের সংখ্যাই প্রায় হাজারের কাছাকাছি। বর্তমান লেখককে লিখিত পত্রের মধ্যে কয়েকটি এখানে উৎসাহী পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে দেওয়া হল।

(১)

মাঃ ৩০।৭।৭১

কল্যাণবরেষু—

বাবা বাঁধন! ৺দুর্গা পূজার ষষ্ঠীর দিন আমার প্রথম স্ট্রোক হয়েছিল, এবার ২৫শে জুন দ্বিতীয় বার স্ট্রোক হয়েছে। সামান্য ভাল হয়েছি। গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি আমার কাছে এসে কথা বল। লিখতে কষ্ট হয়। আশীর্বাদ জানবে, আমায় দেখতে এসো। ইতি—

তোমার ইন্দুমা

পুঃ

তোমার প্রথম চিঠি যখন আসে আমি শয্যাগত ছিলাম।

—মা

কল্যাণীয়
শ্রীমান বাঁধন সেনগুপ্ত
ডিপোজিট সেক্সন
ট্রেজারী বিল্ডিংস
কলিকাতা-১

(২)
মাঃ
—

২৪ | ১২ | ৭১
কলিকাতা

পরম কল্যাণীয়—

বাবা বাঁধন। পত্রপাঠ তুমি আমার বাড়ী একবার নিশ্চয় আসবে, আমার ভয়ানক বিপদ, নিশ্চয়ই আসবে। স্নেহাশীষ জানবে, আশা করি ভাল আছ। গতকাল অলোক এসেছিল আমায় দেখতে। গৌরী পাঠিয়েছিল। ইতি—

তোমার ইন্দুমা

কল্যাণীয়
শ্রীমান বাঁধন সেনগুপ্ত
ডিপোজিট সেক্‌শন
ট্রেজারী বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

(৩)
মাঃ
—

১৩ | ৯ | ৭৪
কলিকাতা

কল্যাণবরেষু—

বাবা বাঁধন! গতকাল বৈকালে তোমার চিঠি পেয়েছি। দুপুরে পেলাম সরকারের চিঠি, তোমার ও ঈশ্বরের কৃপায় আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে ৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত। তুমি পত্রপাঠ কাগজপত্র নিয়ে আনন্দ করে যাও। তোমার পরিশ্রমের ফল বাবা।

আমি একই প্রকার। গৌরীকে খবর দেবে। আমিও চিঠি দেব। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানবে। ইতি—

তোমার মা ইন্দুবালা।

কল্যাণীয়
শ্রীমান বাঁধন সেনগুপ্ত
ডিপোজিট সেক্‌শন
ট্রেজারী বিল্ডিংস (দোতলা)
কলকাতা-১
এ. জি. বেঙ্গল.

(৪)

মাঃ — 26. 3. 75

পরম কল্যাণীয়

বাবা বাঁধন, কিছুকাল আগে তুমি তোমার এক বন্ধু এবং বন্ধু-স্ত্রীকে নিয়ে আমার বাড়ী এসেছিলে এবং তাঁহারা আমাকে একটি কলম দিয়াছিল। কিন্তু সেদিন তো কোন অপরাধ করিনি যার জন্য আজ পর্য্যন্ত তুমি আমার কোন খবর নাওনি। আমি ভীষণ শয্যাগত। তোমার আমাকে দেখতে আসা উচিৎ। ৬০টি ইনজেকশন নিয়েও ডাক্তার আজ পর্য্যন্ত আমাকে বিছানা থেকে তুলতে পারেনি। এবার তুমি আমার নতুন করে ব্যবস্থা করে দাও (নতুন বাজেটের)। আমার আন্তরিক অনুরোধ, তুমি আমাকে একবার এসে দেখে যাও। গৌরীর পত্রে জেনেছিলাম যে তোমার বাবা অসুস্থ। আশা করি, তিনি এতদিনে সুস্থ হয়েছেন। আশীর্বাদ করি তুমি চিরসুখী হও। ইতি

আশীর্বাদিকা

পুনঃ তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছি। — তোমার মা ইন্দুবালা

১নং পত্রের বছর কয়েক আগে ইন্দুবালা দেবী চোখ অপারেশনের জন্য স্থানীয় লোহিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তী হন। অপারেশনের পর হাসপাতালে অবস্থানকালে জনৈক নার্সের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হবার ফলে তাঁর চোখটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে এই চোখটির দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। এরপর প্রায় বছর চারেক পরে ইন্দুবালা লেখককে এই পত্রের মাধ্যমে তাঁর স্ট্রোকের সংবাদ জানান। এই সময় থেকেই তাঁর অন্য চোখটির দৃষ্টিশক্তিও কমতে সুরু করে।

২নং পত্রে ইন্দুবালা দেবী লেখককে যে 'ভয়ানক বিপদ' বলে উল্লেখ করেছেন তখন তিনি অকস্মাৎ গুরুতরভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পত্র পাবার পর লেখক তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। অনতিবিলম্বে ডাঃ নৃপেন সেনকে পি. জি. হাসপাতাল থেকে এনে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। ডাঃ সেন বিনা পারিশ্রমিকে ইন্দুবালার চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং তাঁরই পরামর্শে ইন্দুবালা দেবীকে পি. জি. হাসপাতালে ভর্ত্তী করা হয়েছিল। প্রায় দিন কুড়ি হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা শেষে সেবার তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। এই পত্রে উল্লেখিত নৈহাটীর অলক মিত্র শ্রীমতী গৌরী বসুর কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা লাভ করতেন। ব্যক্তিজীবনে ৺গৌরী বসু ছিলেন সাহিত্যিক সমরেশ বসুর সহধর্মিনী।

৩নং পত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেয় ইন্দুবালা দেবীর Lite.·ry Pensionএর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময় থেকে মাসিক দেড় শত টাকা হারে সরকারী সম্মান বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে অর্থাৎ ১৯৮২ সাল থেকে তা বৃদ্ধি পেয়ে মাসিক আড়াই শত টাকা করা হয়েছে।

৪নং পত্রে ইন্দুবালা সরকার প্রদেয় সম্মান-ভাতা বা বৃত্তির বাৎসরিক নবীকরণের কথা লিখেছেন।

ইন্দুবালার মাতৃকুল তালিকা
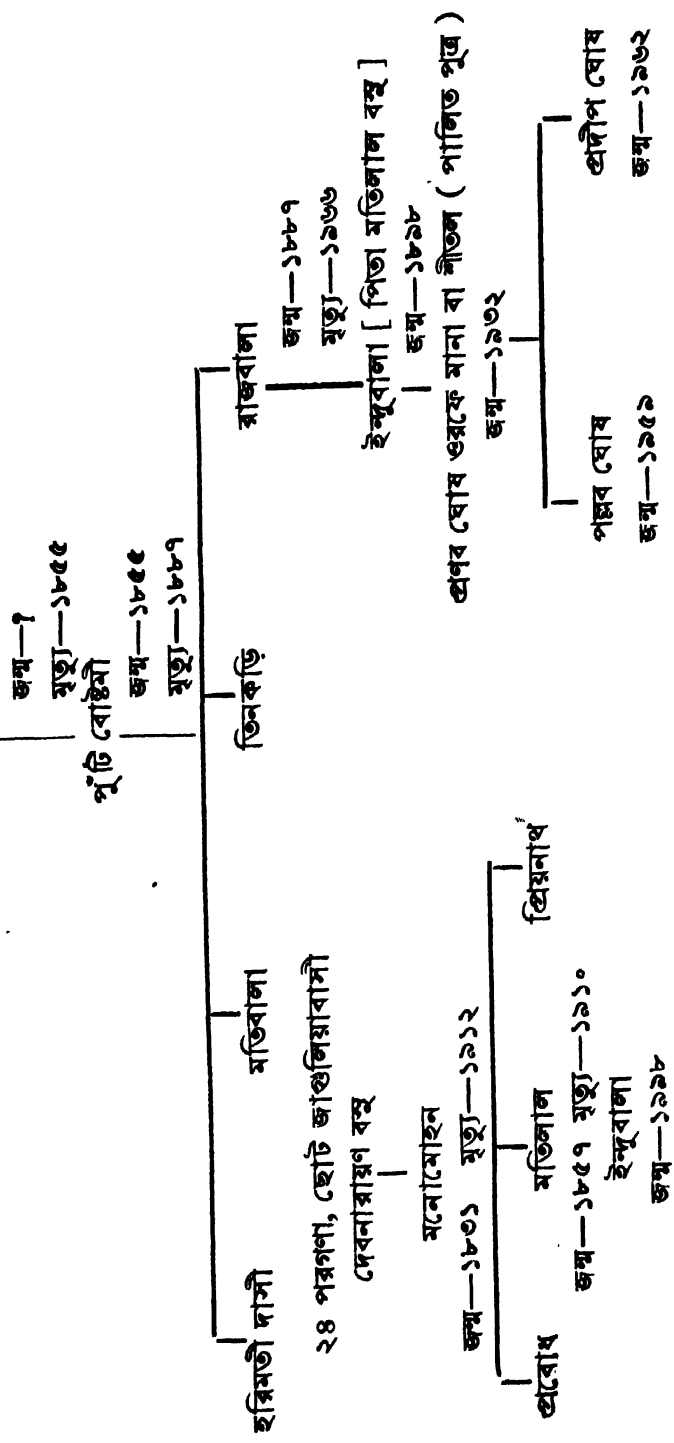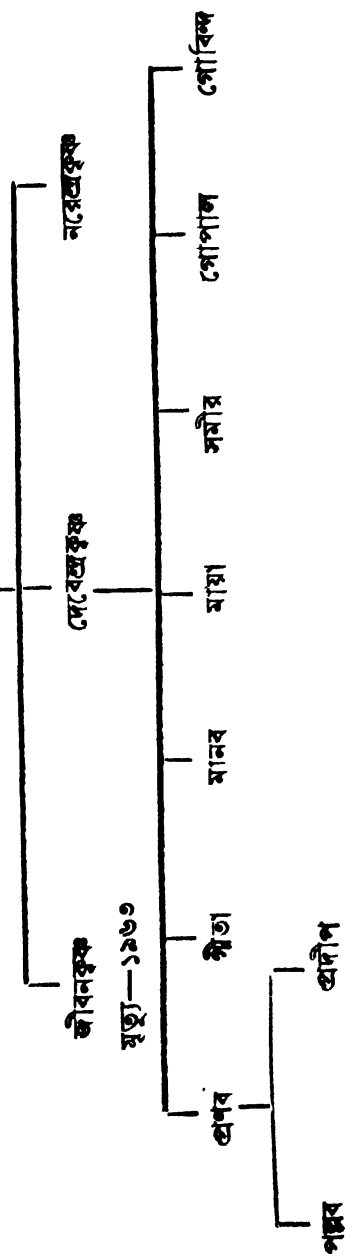
মেদিনীপুর, খেজুড়ী নিবাসী

ষ্টবিহারী ঘোষ

- জীবনকৃষ্ণ (মৃত্যু—১৯৬৩)
- দেবেন্দ্রকৃষ্ণ
  - প্রণব
    - পল্লব
    - প্রদীপ
  - সীতা
  - মানব
  - মায়া
  - সমীর
  - গোপাল
  - গোবিন্দ
- নরেন্দ্রকৃষ্ণ

ভক্ক মিশ্র পরিবারের বংশানুক্রমিক শিল্পী-তালিকা
[কাশীর মিশ্র ঘরাণা]
বুদ্ধু মিশ্র
(গান ও সারঙ্গ)
বেচু ওস্তাদ
(গান, সারঙ্গ)
ঠাকুর প্রসাদ (অপুত্রক)
(গান, সারঙ্গ)
শ্যামাচরণ (অপুত্রক)
(তবলা)
গৌরীশঙ্কর (অপুত্রক)
(সারঙ্গ, গান)
জন্ম—১৮৬৫
মৃত্যু—১৯৪৫
কঙ্কর (অপুত্রক)
(সারঙ্গ, গান)
বুন্দি
(তবলা)
কালীচরণ (অপুত্রক)
(সারঙ্গ, গান)
জন্ম—১৮৮২
মৃত্যু—১৯৩৯
চামরু
(সারঙ্গ)
জন্ম—১৯১৭
মৃত্যু—১৯৪৩
দামোদর
(গান)
জন্ম—১৯২০
সোহনলাল (তবলা)
[সূত্র : ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরাণার ইতিহাস— দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়]

বিভিন্ন তীর্থস্থান ও দেবদেবীর দর্শন স্থানের তালিকা
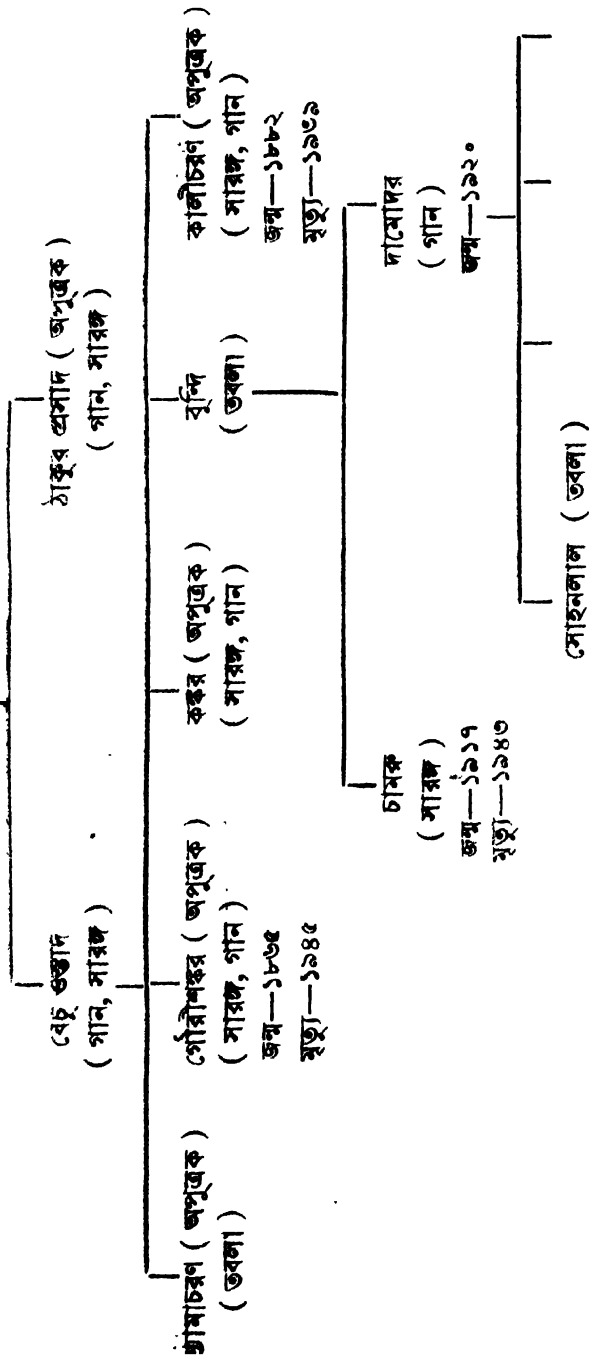
'নানা স্থানের নানা দেবদেবীর নির্মাল্য-ফুল, বিল্বপত্র, তুলসী, চন্দন মাটি, ভস্ম, চাল, আবীর, জল সংগ্রহ করিয়া দেবদেবীর নাম নিয়ে দিলাম।'

—ইন্দুবালা দেবী

দেবীর নাম

✓শীতলা মাতা—রামবাগান
,, সরস্বতী মাতা—আমার
,, শীতলা মাতা—বারোয়ারী
,, বসা কালী—বিডন ষ্ট্রীট
,, আনন্দময়ী—নিমতলা ষ্ট্রীট
,, কালী মাতা—দক্ষিণেশ্বর
,, কালী মাতা—কালীঘাট
,, সর্বমঙ্গলা—বর্দ্ধমান
,, পার্বতী মাতা—দেওঘর
,, ঢাকেশ্বরী—ঢাকা
,, অন্নপূর্ণা—কাশী
,, কামাক্ষা দেবী—কামরূপ
,, চামুণ্ডেশ্বরী—মহীশূর
,, মীনাক্ষী দেবী—মাদুরা
,, মহালক্ষ্মী—মাদ্রাজ
,, লক্ষ্মী মাতা—আমার
,, সিংহবাহিনী—পুরোহিত বাড়ী
,, শীতলা মাতা—দেওঘর
,, দুর্গা দেবী—বারোয়ারী দুর্গোৎসব
৭মী, ৮মী, ৯মী, বম্বে, দাদার
,, মোম্বা দেবী—বম্বে
,, অম্বা দেবী—বম্বে
,, ভদ্রাকালী—বম্বে
,, সাবিত্রী দেবী—বম্বে
,, গুহেশ্বরী—বম্বে
,, দেবী গৌরী—বম্বে
,, সঙ্কটামাঈ—কাশী

দেবীর নাম

✓শীতলা মাতা—কুমারটুলী
,, সিদ্ধেশ্বরী কালী মাতা—কুমারটুলী
,, ব্যোমকালী—বাগবাজার
,, শীতলা মাতা—সিমলা
,, সীতা দেবী—গুহা (নাসিক)
,, ভদ্রকালী—দ্বারকা
,, রুক্মিনী দেবী—দ্বারকা (পরিক্রমা)
,, অম্বিকা দেবী—দ্বারকা
,, গায়ত্রী দেবী—দ্বারকা
,, দেবকী মাতা—দ্বারকা
,, জাম্বুবতী—দ্বারকা
,, রাধারাণী—দ্বারকা
,, লক্ষণ—দ্বারকা
,, সত্যভামা—দ্বারকা
,, সরস্বতী—দ্বারকা
,, দেবকী মাতা—বেট দ্বারকা
,, অম্বিকা—বেট দ্বারকা
,, জাম্বুবতী—বেট দ্বারকা
,, সত্যভামা—বেট দ্বারকা
,, কালী মাতা—হবলাজুড়ি
,, কামাক্ষা দেবী—কামাক্ষা
গঙ্গা-যমুনার জল
২৪ কুণ্ডের জল (রামেশ্বর)
গোদাবরী জল ও অরুণা সঙ্গম (নাসিক)
গোমতী মাতার সব ঘাটের জল দ্বারকা
নানা কুণ্ডের জল—দ্বারকা

দেবতার নাম

৺ সত্যনারায়ণ—আমার

„ বিপিন বিহারী—বিজলীর

„ তারকনাথ—তারকেশ্বর

„ বৈদ্যনাথ—দেওঘর

„ বিশ্বনাথ—কাশী

„ দ্বারিকানাথ—মথুরা

„ গোবিন্দজী বৃন্দাবন

„ ভূতনাথ—নিমতলা

„ রামেশ্বর—রামেশ্বরম

„ সুন্দরেশ্বর—মাদুরা

„ পার্থসারথী—মাদ্রাজ

„ লক্ষ্মীনারায়ণ—বম্বে (মাধেবাল)

„ মুরলীধর—বম্বে

„ রাম লক্ষ্মণ সীতা—বম্বে

„ লক্ষ্মীনারায়ণ—পুণা

„ রামেশ্বর—পুণা

„ দত্তাত্রেয়—পুণা

„ রাম লক্ষ্মণ সীতা—পুণা

„ জোড় বাংলা শিব—কুমারটুলী

„ রাধাকৃষ্ণ—কুমারটুলী

„ মদনমোহন—বাগবাজার

„ রাধাকৃষ্ণ—গৌড়ীয় মঠ

„ গোপালজী—সিমলা

„ কালাচাঁদ—সিমলা

„ জগবন্ধু—পুরী

„ সঙ্কটমোচন—কাশী

„ কালভৈরব—কাশী

„ তিলভাণ্ডেশ্বর—কাশী

„ শ্যাম রায়—কালীঘাট

„ গদাধর—কালীঘাট

দেবতার নাম

৺ রাম সীতা—কালীঘাট

„ লক্ষ্মীনারায়ণ—কালীঘাট

„ রাধাকৃষ্ণ—কালীঘাট

„ ভুবুনাথ—কালীঘাট

„ সাক্ষীগোপাল—পুরী

„ চন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ

„ পশুপতিনাথ—নেপাল

„ আদিনাথ—নেপাল

„ নৃসিংহ দেব—নেপাল

„ হরপার্বতী—নেপাল

„ রাম লক্ষ্মণ সীতা—নাসিক

„ দ্বারিকানাথ— দ্বারিকা

„ বিশ্বনাথ— „

„ কুশেশ্বর— „

„ কেশব— „

„ নবগ্রহ— „

„ পুরুষোত্তম— „

„ দত্তাত্রেয়— „

„ প্রদ্যুম্ন— „

„ অনিরুদ্ধ— „

„ বলদেবজী— „

„ রাধাকৃষ্ণ— „

„ বেণীমাধব— „

„ দুর্বাশা— „

„ লক্ষ্মীনারায়ণ— „

„ গোপালকৃষ্ণ— „

„ নরসিংহ— „

„ সাক্ষীগোপাল— „

„ বাসুদেব— „

„ সত্যনারায়ণ—(পরিক্রমা) দ্বারিক

দেবতার নাম		
৺ লক্ষ্মীনারায়ণ—(পরিক্রমা) দ্বারিকা		
,, রাম লক্ষ্মণ সীতা	,,	,,
,, সঙ্গম নারায়ণ—	,,	,,
,, রত্নেশ্বর—	,,	,,
,, সিদ্ধেশ্বর—	,,	,,
,, দামোদর —	,,	,,
,, দ্বারিকানাথ—বেট দ্বারিকা		
,, বলদেব—	,,	
,, বেণীমাধব—	,,	
,, প্রদ্যুম্ন—	,,	
,, অনিরুদ্ধ—	,,	

দেবতার নাম	
৺ পুরুষোত্তম—বেট দ্বারিকা	
,, গরুড়—	,,
,, গোবর্দ্ধন—	,,
,, সত্যনারায়ণ—	,,
,, দাউজি—	,,
,, সাক্ষীগোপাল—	,,
,, লক্ষ্মীনারায়ণ—	,,
,, গণেশ—	,,
,, তপোনাথ—তপোবন	
,, ত্রিকূটেশ্বর—ত্রিকূট	
,, কেদারনাথ—কেদার	

শ্রীশ্রী৺কালীমাতা সহায়

১৯৩৮

আমার বিদেশ ভ্রমণ*

প্রদেশ	বার	ইং সন
বা ঙ লা		
লিলুয়া	৪০	১৯১৪-১৯২৫
শিবপুর	৮	১৯১৮-১৯২২
চাঁপাডাঙ্গা	১	১৯১৬
রামরাজাতলা	১০	১৯১৫-১৯২৬
সাঁতরাগাছি	১	১৯১৬
বালী	১	১৯১৪
বেলুড়	১	১৯১৫
শ্রীরামপুর	১	১৯৩০
চুঁচুড়া	২	১৯৩০
চন্দন নগর	৩	১৯১৮
হুগলী	১	১৯১৫
তারকেশ্বর	১০	১৯১০-১৯২৩
ঘুঘুডাঙ্গা	৫০	১৯১৬-১৯২০
শিঁতি সাতপুকুর	২০	১৯১৫-১৯২০
পেনেটী	৩	১৯১৮
শুকচর	২০	১৯১৪-১৯২৩
আগরপাড়া	৩০	১৯১৪-১৯২২
সোদপুর	১০	১৯১৬-১৯২০
বারাকপুর	১	১৯১৫
নৈহাটী	১	১৯২২
ঘুশুড়ী	৮	১৯১৫-১৯১৮
দক্ষিণেশ্বর	৯	১৯১৬-১৯২০
সংগ্রামপুর	১০	১৯১৪-১৯১৭

প্রদেশ	বার	ইং সন
বা ঙ লা		
ডায়মণ্ডহারবার	৩	১৯২০-১৯২৪
চাঁপাডাঙা	১	
হরিণখোলা	১	
বর্দ্ধমান	৩	১৯১৯-১৯৩০
আসানসোল	১	১৯৩০
আদরা	১	১৯২৯
হেতমপুর	১	১৯৩০
সিউড়ি	১	১৯৩০
খুলনা	১	১৯৩০
বাগেরহাট	১	১৯৩০
নবদ্বীপ	৬	১৯২২-১৯২৪
কুষ্টিয়া	১	১৯৩০
খড়গপুর	২	১৯২৪
খাজুরী	৩	১৯২০-১৯২৮
গঙ্গাসাগর	১	১৯১৯
ঢাকা		
বি হা র		
মিহিজাম	১	১৯২১
মধুপুর	১	১৯২৩ অক্টোবর
জশিডিহ	১	১৯২৩ নভেম্বর
দেওঘর		১৯২৩-১৯৩৮
দুমকা	১	১৯৩৭ অক্টোবর
পাকুড়	১	১৯৩৬ ফেব্রুয়ারী
মন্দারহিল	১	১৯৫৭ অক্টোবর
ভাগলপুর	১	১৯৩৭ ঐ
জামসেদপুর	২	১৯৩৩

প্রদেশ	বার	ইং সন
দত্তপুকুর		১৯১৬
বনগ্রাম		
উ ড়ি ষ্যা		
পুরী	৫	১৯২১—১৯৩৭
যু ক্ত প্র দে শ		
বেনারস	৪	১৯১৪-১৯৩৭ মার্চ
বিন্ধ্যাচল	১	১৯২২
এলাহাবাদ	২	১৯২২-১৯৩৭ মার্চ
লক্ষ্ণৌ	১	১৯৩৬ ডিসেম্বর
টিকমগড়	১	১৯৩৭ ফেব্রুয়ারী
আগ্রা	১	১৯৩৭ মে
মথুরা	১	১৯৩৭ মে
বৃন্দাবন	১	১৯৩৭ মে
দিল্লী	২	১৯৩৭ মে
মা দ্রা জ		১৯৩৫-১৯৩৬ মে
মাদ্রাজ	৪	১৯৩৭-১৯৩৮ মে
কুম্ভকোনম	১	১৯৩৬ জুন
ট্রিচিনাপল্লী	১	১৯৩৬ জুন
বাঙ্গালোর	১	১৯৩৫ ডিসেম্বর
মহীশূর	৩	১৯৩৬ মে, ১৯৩৭, ১৯৩৮
রামেশ্বরম	১	১৯৩৮
মাদুরা	১	১৯৩৮
ধনুষকোটি		১৯৩০

প্রদেশ	বার	ইং সন
হায়দ্রাবাদ	১	১৯৩০ মে
ব ম্বে (১৯৩৭-১৯৩৮)		
বম্বে	১	১৯৩৭ ডিসেম্বর
নাসিক	১	
পুণা	১	
দ্বারিকা	১	
বেট দ্বারিকা	১	
রা জ স্থা ন		১৯৪৭
রাজপুতনা		
যোধপুর		
উদয়পুর		
শ্রীনাথদ্বোয়ারা		

‡ এটি ইন্দুবালা দেবীর নিজস্ব ভ্রমণ-তালিকার প্রতিলিপি। এই তালিকাটি ১৯৩৮ সালে প্রস্তুত হয়েছিল। সুতরাং তালিকাটি অসম্পূর্ণ। এর পরেও তিনি অজস্র অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থানে যোগদান করেছিলেন।

ইন্দুবালাকে প্রদত্ত সম্বর্ধনার উল্লেখযোগ্য তালিকা

১। বেঙ্গল সিনে আর্ট সোসাইটি — ১১ই শ্রাবণ ১৩৬৫
বসুশ্রী সিনেমা, কলকাতা-২৬

২ কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটের সভ্যবৃন্দ — ১৬ই জুন ১৯৭৩

৩ নৈহাটী 'ফাল্গুনী'র সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ — ১লা চৈত্র ১৩৭৫

৪। খিদিরপুর সান্ধ্য মিলন নাট্যসংস্থা — ৩২শে শ্রাবণ ১৩৮০

৫। গীতাঞ্জলী'র অভিনন্দন — ১৯৬৫

৬। আনন্দ মন্দির — ৭ই আষাঢ় ১৩৭৮
৩ রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলকাতা-৬

৭। সহযাত্রী'র সভ্যবৃন্দ (বসুশ্রী) — ৭ই নভেম্বর ১৯৬১

৮। অনার টু ফ্রীডম ফাইটার্স'এর সভ্যবৃন্দ — ২৪শে শ্রাবণ ১৩৮০

৯। পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থা — বসন্ত '৮০ সাল
৮১ বিধান সরণি, কলকাতা-৪

১০। 'চতুর্মুখ' নাট্যসংস্থা, কলকাতা — নভেম্বর ৭, ১৯৭৪

১১। পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্ম জয়ন্তী কমিটি — ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

১২। 'কর্মীবৃন্দ'
১৬৮/১সি, রমেশচন্দ্র ষ্ট্রীট, কলকাতা-৬ — ২৩শে মার্চ ১৯৮১

১৩। নজরুল আকাদেমী চুরুলিয়া, বর্ধমান — ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮

১৪। দি কাষ্টমস রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর সুবর্ণ জয়ন্তী
উৎসব উপলক্ষে সম্বর্ধনা — ২৪শে আগষ্ট ১৯৭৪

১৫। মাদ্রাজে সম্বর্ধনা — ২৮শে ফেব্রু, ১৯৩৫

১৬। রাগ রঙ্গম আয়োজিত তিনদিনের নজরুল গীতি সম্মেলনের প্রথম দিনে সম্বর্ধিত হন ইন্দুবালা দেবী। ঐ অনুষ্ঠানে জগৎ ঘটক ও হীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রও সম্বর্ধিত হন। মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত (জুলাই ১৯৮৩)ও সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনার উত্তরে ইন্দুবালা দেবী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। জনসমক্ষে এ পর্যন্ত এটিই তাঁর সর্বশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত।

পদক এবং অন্যান্য পুরস্কার

১। মাদ্রাজের মেয়র কর্তৃক সম্বর্ধনা সভায় স্বর্ণপদক (মেডেল) প্রদান, (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫)।

২। Bengal Motion Picture-এর Silver Jubilee of the Indian Talkie (1930-1955) উপলক্ষে মেডেল প্রদান।

৩। ঢাকার সনাতন হাউস প্রদত্ত ব্রোঞ্জের ফলক (১৯৩৬)।

৪। H. M. V. কর্তৃক প্রদত্ত স্কেল চেঞ্জার হারমোনিয়াম (Das Bros.

এর তৈরী সর্বাপেক্ষা দামী, তৎকালীন মূল্য ৬০০ টাকা) এবং ষ্ট্যাণ্ড সমেত H. M. V. কোম্পানীর একটি গ্রামোফোন এবং ১২ ভরি সোনার এক জোড়া অনন্ত ও তিন ভরি সোনার একটি মেডেল।

৫। All India Radio, New Delhi প্রদত্ত রৌপ্য নির্মিত স্মারক পদক (১৯৫৭)।

৬। 'গীতাঞ্জলী' প্রদত্ত মানপত্র রাখার রৌপ্যনির্মিত পেটিকা (১৯৬৫)।

৭। 'একতারা' গোষ্ঠী, কলকাতার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা এবং মান্না দে প্রদত্ত রূপার ফলক, (রবীন্দ্র সদন, ১৯৭২)।

৮। 'চতুর্মুখ'এর পক্ষ থেকে অসীম চক্রবর্তী প্রদত্ত তাম্রফলক ও শাড়ী, (৭ই নভেম্বর ১৯৭৪)।

৯। খিদিরপুর সান্ধ্য মিলন নাট্যসংস্থা প্রদত্ত গিরিশ ঘোষের ব্রোঞ্জ নির্মিত ফলক (৩২শে শ্রাবণ ১৩৮০)।

১০। H. M. V. New Delhi, Gramophone Record Co. প্রদত্ত Melodious Thumri Display'র জন্য রৌপ্য পদক (মেডেল)।

১১। কলকাতা ২০নং ব্লক কংগ্রেস কমিটি প্রদত্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানের জন্য মেডেল প্রদান (১৯৫৭)।

১২। মনোমোহন থিয়েটারে 'বিষবৃক্ষ' নাটকে দেবেন্দ্র চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য থিয়েটার কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত রৌপ্য পদক (কাপ)।

১৩। গ্রামোফোন কোম্পানী প্রদত্ত (H. M. V.) সোনার মেডেল।

১৪। All India Radio'র ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আকাশবানী কলকাতা প্রদত্ত স্মারক উপহার (১৯৭৭)।

১৫। H. M. V. গ্রামোফোন কোম্পানী প্রদত্ত রবীন্দ্র সদনের অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত Golden Disc (১৯৭৬)।

১৬। নতুন দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার (১৯৭৫) উপলক্ষে প্রাপ্ত পাঁচ হাজার টাকার চেক ও একটি ব্রোঞ্জের ফলক।

১৭। চুরুলিয়া নজরুল আকাডেমী প্রদত্ত 'নজরুল পুরস্কার' উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার (তথ্য ও সংস্কৃতি) ও নজরুল আকাডেমী আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ১০০০ টাকা ও মানপত্র (শিশির মঞ্চ ১৯৮১)।

পরিশিষ্ট

ইন্দুবালার নাটকের তালিকা এবং অভিনীত চরিত্রের নাম

'দি রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটার' (১৯২২-২৪ খ্রীঃ)

১। বিল্বমঙ্গল—পাগলিনী

২। নরমেধ যজ্ঞ—কাত্যায়িনী

৩। খাস দখল—গিরিবালা / মুচিরাম / নিতাই / মনোমোহন মাইতি

৪। বরুণা—বরুণা

৫। পলিন—পলিন

৬। হীরেমালিনী—মালিনী

৭। কুঞ্জদরজী—হাকিমের স্ত্রী / করিম

৮। আলিবাবা—সাকিনা / আলিবাবা

৯। রেশমী রুমাল—রামলোচন

১০। হীরার ফুল—রতি

১১। পরদেশী—সাকিয়া

১২। চন্দ্রগুপ্ত—ছায়া

স্টার থিয়েটার (১ম পর্যায় ১৯২৫)*

১৩। নসীরাম—সোনা

১৪। বিল্বমঙ্গল—পাগলিনী

১৫। নরমেধ যজ্ঞ—কাত্যায়িনী

পূর্ণ থিয়েটার ভবানীপুর (১৯২৮)

১৬। উজ্জ্বলে-মধুরে-শোভা (গীতিনাট্য)

মনোমোহন থিয়েটার † (১৯৩০-৩১ খৃঃ)

১৭। রক্তকমল—পূরবী

* প্রথম পর্য্যায়ে মাত্র তিন মাস স্টারে অভিনয় করেন।

‡ মনোমোহনে নয় মাস ইন্দুবালা অভিনয় করে ছিলেন।

১৮। বিষবৃক্ষ—দেবেন্দ্র

১৯। জাহাঙ্গীর—হুসিয়ার

২০। মহুয়া—রাধুপাগলী

২১। দক্ষযজ্ঞ—তপস্বিনী

২২। তপোবল—বেদমাতা / সদানন্দ

২৩। সাজাহান—পিয়ারা

২৪। পরদেশী—সাকিয়া

২৫। বলিদান—জোবী

২৬। মীরাবাঈ—মীরাবাঈ

২৭। প্রফুল্ল—মাতালনী

জুপিটার সিনেমা এণ্ড ভ্যারাইটী প্যালেস (১৯৫২—৪২ খৃঃ)

২৮। একলব্য—চিত্রা

২৯। পরীস্থান—হাসান

৩০। শ্রীদুর্গা—বিজয়া

৩১। জয়দেব—পরাশর

৩২। সত্যভামা—মধুকর

৩৩। বরুণা—গিরিবালা / মুচিরাম / বরুণা

মিনার্ভা থিয়েটার (১৯৪৩ - ৪৫ খৃঃ)

৩৪। অন্নপূর্ণার মন্দির—কুয়াশা

৩৫। ধাত্রীপান্না—গায়িকা (বাঈজী সঙ্গীত)

৩৬। দুই পুরুষ—বাঈজী

৩৭। আত্মদর্শন—বিবেক

হিন্দী পার্শী থিয়েটার (হিন্দী নাটক : ১৯৪৫—৪৬ খৃঃ)

৩৮। ঘর কী লাজ—মুন্নী

৩৯। যাসুস—লছমীবাঈ

কালিকা থিয়েটার (১৯৪৯—৫০ খৃঃ)

৪০। তপোবল—সদানন্দ

৪১। রামপ্রসাদ—মাধব

৪২। বিল্বমঙ্গল—ভিক্ষুক

স্টার থিয়েটার (২য় পর্যায়, ১৯৫০ খৃঃ)

৪৩। সাবিত্রী—পথিক

৪৪। পৃথ্বীরাজ—মেঘা

৪৫। দুর্গেশ নন্দিনী—ওস্তাদ

৪৬। শকুন্তলা—বনদেবতা

শ্রীরঙ্গম, মিনার্ভা ও রঙমহলে অভিনীত অন্যান্য নাটক

৪৭। কারাগার—ধরিত্রী

৪৮। জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার—উন্মাদিনী

৪৯। দেবদাস—বাসরসঙ্গিনী

৫০। মন্ত্রশক্তি—বাঈজী (জহরা বাঈ)

৫১। সধবার একাদশী—কাঞ্চন

৫২। বাঙালী—ভিখারিনী

৫৩। প্রফুল্ল—মাতালনী

৫৪। আলিবাবা—আলিবাবা

৫৫। বিষবৃক্ষ—দেবেন্দ্র

১৯৪৩ খৃঃ থেকে ১৯৫৮ খৃঃ পর্যন্ত সম্মিলিত অভিনয় রাত্রি, (Combination night) এবং ইন্দুবালার ভাষায় 'খুচরো নাটক'এর পর্যায়ে এই নাটকগুলিতে উল্লিখিত চরিত্রে ইন্দুবালা অনেক রাত্রি অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে সর্বাধিক রাত্রি অভিনীত ইন্দুবালার নাটক 'বিল্বমঙ্গল' প্রায় চারশ রজনী অতিক্রান্ত। পেশাদার মঞ্চে ইন্দুবালার নিয়মিত অভিনীত শেষ নাটক 'পৃথ্বীরাজ' (১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর)।

চলচ্চিত্রে ইন্দুবালা অভিনীত ছবির নাম ও ভূমিকা

East India Film Co.

বাংলা ছবি ১। যমুনা পুলিনে—কুটীলা (১৯৩১)
পরিচালনা—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

২। বিদ্রোহী—ব্রাহ্মণী (১৯৩৬)
পরিচালনা—ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

হিন্দী ছবি ৩। নল দময়ন্তী—দময়ন্তী মাতা (১৯৩১)
পরিচালনা—বি. এস. রাজহংস

৪। সীতা—অশোকা (১৯৩২) ধাত্রী
পরিচালনা—দেবকী বসু

৫। রাধাকৃষ্ণ—কুটীলা (১৯৩২)
পরিচালনা—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

৬। বিদ্রোহী—ব্রাহ্মণী (১৯৩৬)
পরিচালনা—ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

৭। নাইট বার্ড—পরিচারিকা (Bar-maid) (১৯৩৬)
পরিচালনা—ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

৮। মার্ডারার—লখিয়া (১৯৩৬)
পরিচালনা—জি. আর. শেঠি

৯। স্টেপ মাদার—নাঈকা বাঈ (১৯৩৬)
পরিচালনা—সোরাবজী কেরাওয়ালা

উর্দু ছবি ১০। কিঙ্ ফর এ ডে—ধাত্রী (১৯৩১)
পরিচালনা—বি. এস. রাজহংস

১১। সেলিমা—শিরিণ (১৯৩৬)
পরিচালনা—মধু বসু

১২। সুলতানা—বেছুইন রানী (১৯৩৬)
পরিচালনা—এ. আর. কারদার

১৩। মিস্টার ডব্লু—হাসির চরিত্র (১৯৩৬)
পরিচালনা—যতীন দাস

১৪। খাইবার পাশ—মরিণা (১৯৩৬)
পরিচালনা—গুল হামিদ

১৫। বাগী সিপাহী—হাসনা (১৯৩৬)
পরিচালনা—এ. আর. কারদার

New Theatres Ltd.

বাংলা ছবি ১৬। মীরাবাঈ—চারিণী (১৯৩২)
পরিচালনা—দেবকী বসু

১৭। এক্সকিউজ মি স্যার—মিসেস তারিণী রায় (১৯৩৩)
পারচালনা—ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

হিন্দী ছবি ১৮। রাজরানী মীরা—চারিণী (১৯৩২)
পরিচালনা—দেবকী বসু

১৯। এক্সকিউজ্ মি স্যার—মিসেস তারিণী রায় (১৯৩৩)

উর্দু ছবি ২০। দুলারী বিবি—দুলারী বিবি (১৯৩২)
পরিচালনা—দেবকী বসু

Bharat Lakshmi Talking Pictures

বাংলা ছবি ২১। চাঁদ সদাগর—মেনকা (১৯৩৪)
পরিচালনা—প্রফুল্ল রায়

২২। শুভ ব্রাহস্পর্শ—গিন্নী (১৯৩৪)
পরিচালনা—মন্মথ রায়

হিন্দী ছবি ২৩। রামায়ণ—মন্থরা (১৯৩৩)
পরিচালনা—পণ্ডিত সুদর্শন ও প্রফুল্ল রায়

২৪। বলিদান—মুন্নীবাঈ (১৯৩৩)
পরিচালনা—প্রফুল্ল রায়

২৫। কুমারী বিধবা—রাধা (১৯৩৪)
পরিচালনা—পিটার সুদর্শন

উর্দু ছবি ২৬। ডাকু-কা-লড়কা—নুরানী (১৯৩৬)
পরিচালনা—চারু রায়

পাঞ্জাবী ছবি ২৭। ঢোলক-কি-ঢোলকি—যোগিনী (১৯৩৬)
পরিচালনায়—আর. ডি. আজাদ।

Madan Theatre

হিন্দী ছবি ২৮। আঁখ-কা-তারা—মালিনী (১৯৩৬)
পরিচালনা—জ্যোতিষ ব্যানার্জী

২৯। রিজেনারেশন—লক্ষ্মী (১৯৩৬)
পরিচালনা—মিঃ এজরা মীর

India Film Industries

বাংলা ছবি ৩০। বিল্বমঙ্গল—পাগলিনী (১৯৩৩)
পরিচালনা—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

Lucknow Picture Co.

উর্দু ছবি ৩১। নুরী—উদ্বোধনী গানের গায়িকা (১৯৩৫)
পরিচালনা—অজ্ঞাত

New Tone Film Production

উর্দু ছবি ৩২। আহ্-এ-মাজলুমান—রহিমান (১৯৩৫)
পরিচালনা—এন. জি. বুলচন্দ্রনী

The Morgan Film Co. (Madura)

তামিল ছবি ৩৩। নবীনা সারংধর—সন্ন্যাসিনী (১৯৩৬)
পরিচালক—কে. সুব্রাহ্মন্যম্

Star Film Co.

হিন্দী ছবি ৩৪। জলজলা—সন্ন্যাসিনী (১৯৩৬)
পরিচালনা—সোরাবজী কেরাওয়ালা

৩৫। ফোর টুয়েন্টি—রানী (১৯৩৬)
পরিচালনা—সোরাবজী কেরাওয়ালা

Bengal Talkies

হিন্দী ছবি ৩৬। ওয়ান ফেটাল নাইট—বিজলী (১৯৩৬)

পরিচালনা—মধু বসু

The United Artists Corporation (Madras)

৩৭। নবীনা সাথারাম—সাথারামের মা (১৯৩৬)

পরিচালনা—কে. সুব্রাহ্মণ্যনয়ম্

Adarsha Chitra Ltd.

উর্দু ছবি ৩৮। মুশায়েরা কা শায়রা—লালার স্ত্রী (১৯৩৬)

Ranjit Movietone (Bombay)

হিন্দী ছবি ৩৯। ভোলরাজা রিক্সাওয়ালা (১৯৩৮)

পরিচালনা—এজরা মীর

৪০। নদী কিনারে (on the river) (১৯৩৮)

পরিচালনা—মিঃ চার্লি।

৪১। হোলী—(১৯৩৮)

পরিচালনা—জয়ন্ত দেশাই

৪২। দেওয়ালী—চাঁদকুমারী (১৯৩৮)

উর্দু ছবি ৪৩। শের-ঈ-কাবুল—(১৯৩৮)

United Artist Corporation (Madras)-এর পক্ষে

East India Film Co.

তামিল ছবি ৪৪। মিস্ সুন্দরী—গায়িকা (১৯৩৮)

হিন্দী ছবি ৪৫। 'ইস্বা সাগর' (তামিল) এর

হিন্দী রূপ 'প্রেম সাগর'—চঞ্চলা (১৯৩৮)

Debdatta Films (G. P. Talkies)

বাংলা ছবি ৪৬। ইন্দিরা—স্ত্রী (গিন্নী) (১৯৩৭)

পরিচালনা—তড়িৎ বসু

Bharat Laxmi

হিন্দী ছবি ৪৭। সমাজ—মুন্নী (১৯৩৫)

পরিচালনা—প্রফুল্ল রায়

বাংলা ছবি ৪৮। স্বস্তিক—(১৯৩৫)

I. N. A. Pictures

বাংলা ছবি ৪৯। স্বয়ংসিদ্ধা—ধাইমা (১৯৪৬)

হিন্দী ছবি ৫০। স্বয়ংসিদ্ধা—ধাইমা (১৯৪৬)

চলচ্চিত্রে শুধু নেপথ্য-সঙ্গীতে ইন্দুবালা

East India Film Co.

১। চন্দ্রগুপ্ত (হিন্দী)

২। আবে হায়াৎ (উর্দু)

Bharat Laxmi Pictures.

৩। দিল্ কী পিয়াস (উর্দু)

৪। আলিবাবা (বাংলা)

গ্রামোফোনে ইন্দুবালার রেকর্ড

নজরুল গীতি (H. M. V. কৃত)

১। অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে N 7336, FT 4289

২। আজ বাদল ঝরে—ভৈরবী *FT 864

৩। আজ ভোরে মোর ঘুম ভাঙ্গাইলে—গজল P 11692

৪। আজি নন্দদুলালের সাথে—হোলী P 11762

৫। আয় গোপিনী খেলবি হোরী—হোলী P 11762

৬। *আজি বন্দনা তব—FT 671

৭। এ আঁখি জল মোছ পিয়া—ভৈরবী গজল P 11724

৮। এইটুকু তো কবো স্বামী—ভজন P 11768

৯। এখনও মেটেনি আশা—P 11790

১০। এস হে সজল শ্যাম-ঘন দেয়া N 9744 (ধীরেন দাসের সঙ্গে)

১১। এল নন্দের নন্দন নবঘন শ্যাম (বীরেন মুখার্জী) T 51

১২। এস ঠাকুর মহুয়া বনে

১৩। ওই জলকে চলে লো কার ঝিয়ারী P 11760

১৪। *ও কে উদাসী বেণু বাজায় N 7406

১৫। ওগো গো রাখা রাখাল

১৬। কত রাতি পোহায় বিফলে হায়—গজল P 11632, FT 4604

১৭। কাছে আমার নাইবা এলে—প্রেমগীতি N 7431

১৮। কেউ ভোলে না কেউ ভোলে—গজল P 11730

১৯। কেন আন ফুল ডোর—গজল P 11682, FT 12298

২০। *কভু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু P 11776

২১। কাহারি তরে কেন ডাকে পিয়া পিয়া

২২। কালা হলি মা

২৩। কাজরী গাহিয়া চল গোপ ললনা

২৪। গহীন রাতে ঘুম কে এলে ভাঙাতে—গজল P 11724, 7EPE 3122*

২৫। চেও না সুনয়না আর চেও না—গজল P 11661, 7EPE 3122*

২৬। ডেকে ডেকে কেন সখি—গজল—P 11754

২৭। তার অধরে নেমেছে মৃত্যু কালিমা N 17445

২৮। তিমির বিদারী অলখ বিহারী—'কারাগার' P 11776

২৯। তুই কে ছিলি তাই বল P 11790

৩০। তুমি যখন এসেছিলে N 7431

৩১। দূর বনান্তের পথ ভুলি P 11779

৩২। দোলা লাগিল দখিনার বনে বনে N 7834, FT 4289

৩৩। দোলে নিতি নবরূপের ঢেউ—ভজন P 11757, FT 4019

৩৪। দ্বার ছেড়ে দাও দ্বারী T 51

৩৫। নতুন নেশার আমার—গজল N 7268

৩৬। নাচে গিরিধারী

৩৭। ফাগুন রাতের ফুলের নেশায়—গজল P 11741

৩৮। বউ কথা কও—গজল FT 864, 7EPE 3122*

৩৯। বেদনা-বিহ্বল পাগল পূবালী পবনে N 9744 (ধীরেন দাসের সঙ্গে)

৪০। বরণ করেছি তারে সই

৪১। ভাঙা মন জোড়া নাহি যায়—ভৈরবী ঠুংরী P 11741

৪২। ভেঙো না ভেঙো না ধ্যান P 11779

৪৩। মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর—গজল P 11730

৪৪। যদি জাগে পরান কভু—সারং P 11692

৪৫। যাও যাও তুমি ফিরে—ভৈরবী P 11682, FT 12293

৪৬। যোগী হয়ে ফিরেছি আমরা—ভজন P 11768

৪৭। রুম ঝুম রুম ঝুম কে এলে নূপুর পায়—গজল P 11661

৪৮। শুধু নামে যাহার এত মধু N 7406

৪৯। সই নদীর ধারে বকুল তলায় P 11760

৫০। সখি আর অভিমান—ঠুংরী N 17316

৫১। সখি ব'লো বঁধুয়ারে—গজল N 7268, 7EPE 3122*

৫২। সাঁঝের পাখীরা ফিরিল কুলায় N 17445

৫৩। স্বপনে এসো নিরজনে—ঠুংরী N 17316

৫৪। হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে—গজল P 11754

৫৫। হে বিধাতা হে বিধাতা—ভজন P 11757

৫৬। হেমন্তিকা এসো এসো

৫৭। *আলো আজি আরতি দীপ FT 671

৫৮। যৌবনে যোগিনী সাজিয়া লো সজনী

শ্যামাসঙ্গীত

৫৯। ওই নাম বড় ভালবাসি—রামপ্রসাদী N 17357

৬০। কত অপরাধ করেছি আমি—মিশ্র ঝিঁঝিঁট P 6170

৬১। কালী হ'লি মা রাসবিহারী—রামপ্রসাদী N 17357

৬২। তিলেক দাঁড়া ওরে শমন—রামপ্রসাদী N 17274

৬৩। তীর্থবাসী হওয়া মিছে—রামপ্রসাদী P 6271

৬৪। তোর আসামী নইরে শমন—ভীমপলশ্রী (রামপ্রসাদ) P 6271

৬৫। বসন পর মা, বসন পর—রামপ্রসাদী N 17274

* Twin রেকর্ড কোম্পানী কৃত রেকর্ড

৬৬। বাজবে গো মহেশের বুকে—রামপ্রসাদী N 27058

৬৭। মন কালী জপ কালী জপ—কেদারা P 67/8

৬৮। মায়ের চরণ তলে ঠাঁই লব— ভৈরবী P 6170

৬৯। শরণ তেরো আয়ে মাতঃ—কালেংড়া (ব্রজবুলি) P 6778

হাসির গান

৭০। দিদি কে তোরে শেখালে এমন—হাসির গান N 17397

৭১। নতুন রাঁধুনি হয়েছি—হাসির গান N 17397

অন্যান্য বাংলা গান

৭২। আঁকি মরমে মুরতি তারি—মিশ্র পীলু P 11745

৭৩। আজি বন্দনা কর আরতি—FT 671

৭৪। আজি বাদলে নাচে ময়ূরী—'একলব্য' P 11738

৭৫। আদর করে হৃদে রাখো— N 27058

৭৬। আদরে বলি তারে—বেহাগ P 9975

৭৭। আমায় সকলে বলে রাধে কলঙ্কিনী—ভাটিয়ালী P 9664

৭৮। আমি ঘুমায়ে ছিলাম অবেলায়—মিশ্র ভৈরবী P 11686

৭৯। আমি বাঘ নই যে গিলবো তোমায় গপ্ করে P 8573

[এম. এন. ঘোষের সঙ্গে

৮০। আমি ভস্ম মাখি, জটা রাখি—বেহাগ P 8431

৮১। আমি রাখবো তোমায় হৃদ্ মাঝারে P 9766, FT 550

[হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে

৮২। আর মুখে ব'লে কি হবে—কেদারা P 4306

৮৩। আশা ফুরায়ে গেল—সিন্ধু-খাম্বাজ P 4306

৮৪। উমার কারণে প্রাণে—বেহাগ P 11513

৮৫। এ ভব সংসারের মাঝে—ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ P 9804

৮৬। একটি দিনের চোখের দেখায়—মিশ্র খাম্বাজ P 11541

৮৭। ওগো তার কি বরণ কালো—দরবারী কানাড়া P 9910

৮৮। ওরে ও বনের পথের পথ ভোলা—'একলব্য' P 11738

*৮৯। ওরে মাঝি তরী হেথা P 4390, P 11720, FT 544, N 27275

৯০। তুমি এসো হে এসো হে—ইমন ,, ,, ,, ,,

৯১। কঠিন তোর হিয়া—পল্লীগীতি N 27125

৯২। কবে যাবে বল গিরিরাজ—পুরিয়া P 11513

৯৩। কি দেখে মজিলে কি দেখে ভুলিলে—P 9766, FT550

[হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে]

৯৪। কিশোরী আর বাঁশরী শুনবে না—কীর্তন P 8110

৯৫। কী দারুণ বুকের ব্যথা—কীর্তন P8110

৯৬। কৃষ্ণজী। কৃষ্ণজী। কৃষ্ণজী।—ভজন HT 51 (ধীরেন দাসের সঙ্গে)

৯৭। কে চলে যায় জলের ঘাটে—দাদরা P 11553

৯৮। কে তুমি একাকিনী দাঁড়ায়ে যমুনা তীরে—ছায়ানট P 9694

৯৯। কে এক্ষ রে সর্বনাশী—ভূপালী P 8431

১০০। কেউ জানে না পিয়া—মিশ্র ভৈরবী P 11686

১০১। কেন না ফিরাবে আঁখি—ভৈরবী P 11745

১০২। কেন বাঁশী বাজে কে জানে—মিশ্র বারোয়া P 9910

১০৩। কেন রে অবোধ মন—ঠুংরী P 9804

১০৪। চরণে দলিয়া গিয়াছে চলিয়া—জংলা P 11600

১০৫। জানি না যে কোথা তুমি—কেদারা P 4868

১০৬। তিলেক ত সয়না অদর্শন—মিশ্র তিলক-কামোদ P11766

১০৭। তুই আমার কাছে আসিস নি আর P 8573

(এম. এন. ঘোষের সঙ্গে)

১০৮। তোমায় আজ আসিতে ডাকি—মিশ্র বেহাগ P 4868

১০৯। তুমি ছাতার পুষে বল চন্না P 9049 (এম. এন. ঘোষের সঙ্গে)

১১০। তোমায় ডাকতে গেলে—P 11570

১১১। তোর মুখ দেখে কি হয় না লো ভয়—সিন্ধু P 8727

১১২। দারুণ কপট বলিস নে কো তারে—সিন্ধু-খাম্বাজ P9975

১১৩। ধর হে বারিদ মিনতি মোর—মিশ্র কানাড়া P4644

১১৪। পথে যেতে যেতে বাঁশী শুনেছি—আড়ানা বাহার P4755

১১৫। পাগল পাগল বলে লোকে—মিশ্র ভৈরবী P11570

১১৬। প্রেম সাগরে আজ সজনী—P11701

১১৭। বড় নেশায় পড়েছি শ্যামের বাঁশীতে—জংলা P6203

১১৮। বহু দূর হতে আসিয়াছি আমি—আশাবরী P11541

১১৯। বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু—ভজন P11776

১২০। বিরহিনী চলে গুটি গুটি—P 9049 (এম. এন. ঘোষের সঙ্গে)

১২১। ভ্রমর এসো গো—প্রেমগীতি N7482

১২২। মথুরার দ্বারে—ভজন HT 51 (ধীরেন দাসের সঙ্গে)

১২৩। মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়—কানাড়া P8727

১২৪। মধু-চন্দ্র-তলে—বাণীচিত্র 'মীরাবাঈ' P 11787

১২৫। মিলাও দেখি নয়ন বঁধু—প্রেমগীতি N7482

১২৬। যেয়োনা যেয়োনা ব্রজেরী ললনা—খাম্বাজ P6203

১২৭। শিশির ধোওয়া প্রভাতে এসে—মিশ্র গান্ধারী P11766

১২৮। শোন তোরা ঐ কালো জলে—দাদরা P11553

১২৯। শ্যাম-প্রেমের বড় জ্বালা—পল্লীগীতি N 27125

১৩০। সখি দেখে আয় বঁধু এলো কি দুয়ারে—গজল P11632

১৩১। সর সর সুন্দরী শ্যাম—কাফী P4755

১৩২। স্বপনে তোমারে দেখিয়াছি আমি—মিশ্র ইমন P11600

১৩৩। হে আমার চির-চাওয়া—ভৈরবী P11701

১৩৪। হের সখা গভীর মেঘদল গরজে—মেঘ P4644

উর্দু ও হিন্দী গানের রেকর্ড

১। আয় রহমতে আলম সল্লে আলা—নাত P10551

২। অহলে ওয়তন কে হাথ মে ইজ্জৎ ওয়তন কী হ্যায়—দেশাত্মবোধক P10564

এছাড়া, The Twin-এ ইন্দুবালার রেকর্ড বিজ্ঞাপন—"টুইন" বাংলা রেকর্ড মিস ইন্দুবালা FT 3785) এপ্রিল ১৯৩৫।

৩ আঈ চমন মে ফস্‌লে গুল—গজল P 10502

৪। আও মোহন মন ভাওয়ন মেরো ঘর—সিন্ধুরা ঠুমরী—P10676

৫। আরে হাম মুঝতে জুলম সহা ন জায়—P10678

৬। উম্মত পেইয়হ্‌ এহ্‌সান রসুলে মদনী হ্যায়—নাত P10638

৭। উসনে ক্যয়া এ বেনওয়া রোতা হ্যায় ক্যয়ুঁ তু জাবজা—গজল N6638

৮। এ কালী কমলীওয়ালে পিয়া তোরী দীদকো—নাত N6590

৯। এরী হাঁ রী ননদইয়া—ঠুমরী P10395

১০। কহাঁ হ্যায় সানা, কহাঁ হ্যায় সীতা—N6603

১১। কদীর ইস লিয়ে জী কে মুঝে খুশী ন হুঈ—N6506

১২। কমলীওয়ালে ইয়সরবকে—N6650

১৩। করম মোরে জাগে—ঠুমরী HTI (বাজম্‌-ই-তরব)

১৪। করে স্বামী কা জো দিল সে মান—গীত N6847

১৫। কা সে কহুঁ জী কী বতিয়া—খাম্বাজ P10395

১৬। কুছ অ্যায়সা লৌহ দিলপর খিঁচ গয়া—গজল নাত P10600

১৭। কুছ মেরী ভী হালত কী হ্যায়—গজল P10571

১৮। কৃষ্ণ জী কৃষ্ণ জী—ভজন HT68 (প্রোফেসর জমীরুদ্দীন খাঁর সঙ্গে)

১৯। কোঈ কহ্‌ দে মদীনেওয়ালে সে—N16268

২০। ক্যয়সী মার দঈ দেখো পিচকারী—হোলী-গীত P10689

২১। ক্যায়া সমঝে কোঈ—গজল নাত P 10481

২২। ক্যায়ামত খেজ আলম ক্যয়োঁ বনায়া—গজল P 10662

২৩। ক্যয়ুঁ ভুলা হ্যায় করতব অপনা—ভজন N16240

২৪। খুরশীদ রসালত নূরে খুদা—নাত P10633

২৫। খেলে শ্যাম কনহৈয়া নে হোরী—হোলী-গীত P10639

২৬। গমখ্‌ওয়ান হমারে আহে হ্যাঁয়—নাত N6590

২৭। গবয়ো কা জম ঘটা (১ম ও ২য় ভাগ) MTI

১ম ভাগ—ইন্দুবালা, জমীরুদ্দীন, আঙ্গুরবালা

২য় ভাগ—মিস হুরারি, পিয়ারু কাওয়াল, মিস জোহরা জান

২৮। চশ্মে পুর নম আহবর লব দয়দে উলফৎ—গজল N6506

২৯। চৈত কী নিঁদিয়ারে—চৈতী P10442, FT12538
৩০। জগ ঝুটা সারা সইয়াঁ।—ভজন N9836
৩১। জব নূরে খুদা হমকো দোবারা নজর আয়া—ভৈরবী P10294
৩২। জবানে হাল সে ইয়হ্ কহ রহী হ্যায় হিচকিয়াঁ। P 10685
৩৩। জমানা তুঝে পুরজ যো জনতা হ্যায়—গজল P10638
৩৪। জ ম্যায় তো সে নহীঁ বোলু—ভৈরবী P10645
৩৫। জাঁউ ম্যায় তোপে বলিহার মদীনেওয়ালে—নাত N6543
৩৬। জাও কদর নহীঁ বোলো—ঠুমরী কাওয়ালী P10046
৩৭। জানা হোগা বারী বারী—ভৈরবী N6563
৩৮। জানা হ্যায় মুঝে অরব মে সখী রী—নাত N16268
৩৯। জিয়ারা সে কাহে নহীঁ বোল—ঠুমরী কার্ফা N6474
৪০। জো কি হো ন আশনায়ে দর্দে দিল—গজল P10638
৪১। ঝংকার পায়ল পগ রোমক ঝোমক—খাম্বাজ ঠুমরী P10676
৪২। ঠারে যমুনা কিনার—কাজরী P10217
৪৩। তন কা তনিক ভরোসা নহীঁ—ভজন N16240
৪৪। তন মন বারুঁ বাঁকে সাওরিয়াঁ।—নাচের সঙ্গে P10619
৪৫। তুম রাধে বনো শ্যাম—ভজন P10237, FT13942
৪৬। তেরা নূর সব মে হ্যায় জলওয়াগর—গজল P10294
৪৭। তেরী চশ্মে ফুসুঙ্গর কা—গজল P10502
৪৮। তোহরে উপর জিয়রা লুভান—কাজরী কার্ফা P10217
৪৯। দমে আখির তুম অশ্কো কী রওয়ানী দেখতে—গজল P10571
৫০। দরে পাক পর উহ্ গরীব আ গয়া হ্যায়—নাত P10652
৫১। দিল রুশ হ্যায় অজব—গজল নাত P10481
৫২। দিল মে রহে কহ্ মেরে জিগর মে—গজল N6474
৫৩। দিল লেকে মুঝে বদনাম কিয়া—ঠুমরী P10046
৫৪। দীজো দর্শন মুঝে বঁসী কে বজানেওয়ালে—ভজন P10492
৫৫। দো আলম সে বেজার দিল হী তো—গজল N6638
৫৬। ন চ্যাইন পায়েগা জালিম কভী—গজল P10662

৫৭। ন ছোড়ো সইয়াঁ বারী উমর—দাদরা P10507

৫৮। ন মারো পিচকারী কৃষ্ণ—হোলী ভৈরবী P10126 রচনা : গহরজান

৫৯। নজরিয়া মিলায় জাও রে সুন্দরী—দাদরা FT811

৬০। নয়না মিলাকে কঁহা জাতে হো ইয়ার—দাদরা FT821

৬১। পহলুমে গর হো দিল তো তেরী আরজু করে—গজল P10673

৬২। পিয়া কে মিলন হম—চৈতী P10442, FT12538

৬৩। পিয়া বিন নহীঁ আওয়ত চ্যইন—খাম্বাজ ঠুমরী P10547

৬৪। পিয়া বিনা ক্যয়সে জিয়া— N 16202

৬৫। প্যারা ওয়তন হমারা হিন্দুস্তান হ্যায় ইয়ারো—দেশাত্মবোধক P10564

৬৬। বন সে লোটে তুম রাজা N6603

৬৭। বাকী রসীলী নঈ পিনহারী—মিশরী নাচ N6395

৬৮। বারকে আল্লাহ্‌ মরহবা—গজল (ঈদ) P10562

৬৯। বালম ছেড়ো মত জাও—খাম্বাজ ঠুমরী P10645

৭০। বিষয় বাত মম—ভজন N9836

৭১। ভর ভর কে পি লা সাকী— P10678

৭২। মজা আজায়ে সাকী খবর হো পহলু মে—গজল P10685

৭৩। মন মোহ লিয়ো এরী সখী—জংলা দাদরা P10181, FT803

৭৪। মরহবা সল্লে অলা হ্যায়—গজল (ঈদ) P10562

৭৫। মানা কি মেরা দিল নহীঁ—গজল P10567

৭৬। মেরী হ্যয়ন লাগে উন সে—খেমটা P10332

৭৭। মেরে দর্দে জিগর কী খবর হী নহীঁ—দাদরা P10547

৭৮। মেরে আজ আয়ে সইয়াঁ—কামোদ খেয়াল P10606

৭৯। মোরা জীয়া নহীঁ মানে মুহম্মদ—নাত N6650

৮০। মোরী নিঁদিয়া ন জগাও—খাম্বাজ ঠুমরী P10359

৮১। মোরে সইয়াঁ নহীঁ বসমেঁ N16202

৮২। মোহে পনঘট পর নন্দলাল—ঠুমরী দাদরা P10237, FT13942

৮৩। মোহে পিয়া মিলন কো জানে দে ব্যয়র নমাঁ—কালিংড়া P10606

৮৪। ম্যয়না বোল গঈ রে প্রীতম কী—ভৈরবী N6563

৮৫। রাধে প্যারী কৃষ্ণ মুরারী—হোলী ভৈরবী P10126 রচনা—গহরজান

৮৬। রুখ্‌ কে আপ ক্যয়োঁ ঘর মেরে আতে আতে—গজল P10567

৮৭। রুয়ে রৌশন কে করীঁ জুল্‌ফ অগর হোতী হ্যায়—P10673

৮৮। লগত কলেজওয়া মে চোট—ভৈরবী ঠুমরী P10181, FT803

৮৯। লগায়ে অব গলে সে তু মুঝে এ ইয়ার—গজল P10412

৯০। ল্যয় তো গয়ে মেরী জাঁ তেরী ফবন কে সদকে—গজল P10656

৯১। শঙ্কর খেলত হোরী—হোলী-গীত P10412

৯২। শরফ হ্যায় আপ কো য়ুঁ সরওয়রোঁ মে তাজদা রোঁ মে—নাত N16228

৯৩। শাদমাঁ হ্যায় অহলে ঈমা ঈদে—গজল (ঈদ) P10551

৯৪। শ্যাম গিরধারী তো সে ক্যয়সে মিলুঁ—ভজন N6395

৯৫। সখী প্যারী প্যারী আঁখিয়াঁ—বেহাগ P10507

৯৬। সখী মোরে আজহু ন আওয়ে—P10619

৯৭। সজনে তুম কাহে কো—তিলক-কামোদ P10359

৯৮। সো হো গয়ে মেরী জাঁ তৈরী ফবন কে সদকে—P10656

৯৯। সুন সুন কে কুছ আফসানা রসুলে মদনীকা—নাত N6543

১০০। সো তে হুয়ে নসীব কো আপনে জগায়েঙ্গে—গজল P10652

১০১। সজনী ক্যাসে কহুঁ সে য়াঁ নহী বসমে N16202

১০২। হমে পরওয়াহ নহীঁ ইসকী কহ বদনাম হ্যায় জঁহা হম সে—N6686

১০৩। হঁস হঁস কে জখ্‌ম্‌ দিল কো মোরে হরা করেঙ্গে—গজল N6686

১০৪। হিজর মে কৌন্‌ পুরসানে হাল হ্যায়—গজল P10656

১০৫। হ্যায় ক্যয়া ক্যয়া জলওয়া ভর হুয়া ঘনশ্যাম—ভজন P10492

১০৬। হ্যায় বেহশ্‌তোঁ সে জ্যয়দা—গজল নাত P10600

১০৭। হ্যায় রশকে কমর চেহ্‌রয়ে তাবাঁ মোহম্মদ—নাত N16228

১০৮। বলি এ রাধা প্যারী বিহারী— HT68

হিন্দী ভজন (জমিরুদ্দীনের সঙ্গে)

পাঞ্জাবী ভাষার গানের রেকর্ড

১০৯। তুসী যাও সেইওঁনে—N4112

১১০। „ —N4112

চৈতী গান (Sample Record)

১১১। ইন্দুবালার সঙ্গে মোন্‌তা. এন. ঘোষ—BD 1281 | on 11. 4. 1924

১১২। „ „ —BD 1282 | on 11. 4. 1924

ওড়িয়া ভাষার গানের রেকর্ড

১১৩। কুহুক কলা কি মোতে—N27051

১১৪। আউ সজনী কহনা—N27051

রেকর্ডে ছায়াচিত্রের গান (উর্দু—হিন্দী)

১। আজ তুঝ কো এক নঈ দুনিয়া—বানীচিত্র 'দীওয়ালী' N25681 N25676 [ঈশ্বরলালের সঙ্গে]

২। করে থামো কা জো দিল্ সে মাত—বানীচিত্র 'মার্ডারার' N6847

৩। কহাঁ হ্যায় সীতা—বানীচিত্র 'সীতা' N6603

৪। ক্যয়োঁ ন ধরা তুনে ধীর—বানীচিত্র 'নদী কিনারে' FT15031

৫। ক্যায়োঁ প্রেম কা বাগ লগায়া—বানীচিত্র 'নদী কিনারে' FT15031

৬। খটমল রাম জী—বানীচিত্র 'রিকশাওয়ালা ভোলারাজ' N 15660

৭। খোলুঙ্গী ন খোলুঙ্গী—বানীচিত্র 'রিকশাওয়ালা ভোলারাজ' N15661

৮। গম কী কহানী মৌলা—বানীচিত্র 'আহে মজলুমাঁ' N6837.

৯। গেয়া দানা ভুলা খায়ে—বানীচিত্র 'প্রেম সাগর' N16110

১০। চন্দ্রকলা সী সোয়ত রাত থী—বানীচিত্র 'মীরা' P10667

১১। চলে জানেওয়ালে চলে জা রহে হ্যাঁয়—বানীচিত্র 'দীওয়ালী' N25676, N25681

১২। চাহে আরে ওয়হ্ ইয়া ন আয়ে—বানীচিত্র 'প্রেমসাগর' N16100

১৩। তুঝসো কান পকড়নে বালী—বানীচিত্র 'প্রেমসাগর' N16110

১৪। তেরা নাম পাক হ্যাঁয় এ খুদা—বানীচিত্র 'খাইবার পাশ' N6837

১৫। তোহে সজন কে ঘর জানা—বানীচিত্র 'রিক্‌শাওয়ালা ভোলারাজ' N156

১৬। দিল কা জলনা ভী গয়া—বানীচিত্র 'আহে মজলুমা' N6761

১৭। ধন ধান সে ভর জা ঘর মেরা—বানীচিত্র 'প্রেমসাগর'

১৮। পিয়া মিলন কী আস—বানীচিত্র 'মীরা' P10669

১৯। বন সে লৌটে হুয়ে তুম রাজা—বানীচিত্র 'সীতা' N6603

২০। বনাউঁ চায় মসালেদার—বানীচিত্র 'নদী কিনারে' FT15032

২১। রঞ্জো গম আহো ফুগাঁ হ্যাঁয় জান খানে কে লিয়ে—বানীচিত্র 'আহে মজলুমা' N6761

২২। সাজন নিকলে চোর—বানীচিত্র 'নদী কিনারে' FT15032 (রাজকুমারী ও জে. দত্তের সঙ্গে)

২৩। সো জা সো জা এ প্যারে—বানীচিত্র 'মার্ডারার' N6847

২৪। 'ঢোলক কী ঢোলকী' পাঞ্জাবী বানীচিত্রের গান N4714

২৫। ,, N4714

উর্দুতে অভিনয় ও গানের রেকর্ডে বিজ্ঞাপন

২৬। 'বার্মা শেল কেরোসিন্ তেল'—BX 5742 (OMC 14613)

২৭। ,, —BX 5741 (OMC 14612)

২৮। তামিল বানীচিত্র 'নবীনা সথারাম' N8365 (OMC 3602)

২৯। ,, ,, N8365 (OMC 3601)

৩০। ,, 'মিস সুন্দরী' N18006 (OMC 6168)

৩১। ,, ,, N18006 (OMC 6169)

বাংলা ছায়াচিত্রের গানের রেকর্ড

৩২। মধু যামিনী! মধু যামিনী—বানীচিত্র 'মীরাবাঈ' P11787

৩৩। মধু চন্দ্র-তলে ফুল শয্যা পাতি— ,, P11787

৩৪। ওরে ও বনের পথ ভোলা—'একলব্য' নাটক

৩৫। আজি বাদলে নাচে ময়ুরী—রচনা : বরদা গুপ্ত

পুনশ্চ

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নানা কারণে বেশ কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ এ গ্রন্থে থেকে গেছে। যেমন ১৯ পৃষ্ঠায় ৫ম লাইনে বাস্তুচ্যুত খুদিরাণীর জায়গায় পুঁটিরাণী ৩০ পৃষ্ঠায় ১৮ লাইনে ৪ঠা এপ্রিল ১৮৯৯ এর স্থলে ১৮৯৮, ৫২ পৃষ্ঠায় ৪র্থ লাইনে ১৮৯৯ এর জায়গায় ১৮৯৮ এবং ২১১ পৃষ্ঠার শিরোনামায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের জায়গায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ও ২৮৮ পৃষ্ঠায় ইন্দুবালার জন্ম ১৯৯৮ এর জায়গায় ১৮৯৮ হওয়া উচিত ছিল। এজন্যে সহৃদয় পাঠকবৃন্দের কাছে আমি অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। অন্যান্য ছোটখাট ছাপার ভুলগুলির তালিকা দীর্ঘ হয়ে যাবে ভেবে তা করা থেকে বিরত থাকা শ্রেয় মনে করছি। কেননা, পাঠকের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে তা মার্জনীয় হবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস।

—লেখক